কাশীখণ্ডম্

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস

চিত্তরঞ্জন ঘোষাল কর্তৃক অনূদিত

এবং

তারকেশ্বর মঠাধীশ দণ্ডিস্বামি হৃষীকেশাশ্রম, ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ডঃ রমা চৌধুরী কর্তৃক মুখবন্ধ, ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিকী সম্বলিত।

পূর্বাচল
৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড।
কলিকাতা-৯

মুখবন্ধ

জয়গুরু

অপি শূলধরো নিরাময়ো দৃঢ় বৈরাগ্যরতোঽপিরাগবান্‌ ।
অপি ভৈক্ষ্যচরো মহেশ্বরশ্চরিতং চিত্রমিদং হি তে প্রভো ॥

যিনি শূল-(ত্রিশূল) ধারী হইয়াও নিরাময় অর্থাৎ মঙ্গল বিধানকারী, দৃঢ়তর বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াও স্বভক্তকুলের প্রতি অনুরাগযুক্ত, যিনি ভৈক্ষচর্য্যা পরায়ণ হইয়াও মহেশ্বর, হে প্রভো ! তোমার এই বিচিত্র চরিত্র ।

প্রসিদ্ধ শিবভক্তি-পরায়ণ ঋষি উপমন্যুর এই একটি শ্লোকের মধ্যেই পরমেশ্বর মহাদেবের অদ্ভুত চরিত্র চিত্রণ করা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থটি অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত স্কন্দ মহাপুরাণের অংশবিশেষ যাহা কাশীখণ্ড নামে চিহ্নিত। এই কাশীখণ্ডে একশতটি অধ্যায় রহিয়াছে। যাহাতে মূলত অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীর মাহাত্ম্য ও কাশীপুরীর মূল আরাধ্য দেবতা মহেশ্বরের মহত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষাল মহোদয় অতি যত্ন সহকারে কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনূদিত সমগ্র গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আমার দৃষ্টিগোচর হইবার সুযোগ হয় নাই। মাত্র কিছু অংশ বিশেষের মুদ্রিত রূপ দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। যদ্রূপ প্রভুত পরিমাণ তণ্ডুল পাক করিয়া তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে কিনা এক দুইটি তণ্ডুল স্পর্শ করিলেই অনুভূত হইয়া থাকে ইহা সুসিদ্ধ অসিদ্ধ, তদ্রূপ বিচার-ধারা প্রয়োগ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষাল মহোদয় কর্তৃক অনূদিত কাশীখণ্ড মূল গ্রন্থের ভাবাভিব্যক্তি করিতে সমর্থ হইবে। অবশ্যই মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় উপনিবদ্ধ। ঐ মূল ভাষার সহিত মূলভাবের যে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে তাহা অনুবাদে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত করা সম্ভবপর হয় না। বর্তমান সময়ে সুর-সরস্বতীর স্নিগ্ধ সলিল-রাশিতে অবগাহন করিবার সুযোগ সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অথচ এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা পৌরাণিক আখ্যান ও তাহার মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানিবার আগ্রহ পোষণ করিয়া থাকেন। সেই আগ্রহসম্পন্ন অথচ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ শ্রদ্ধালু ও বিবিদিষু ব্যক্তিগণের জন্যই সম্ভবত এই বঙ্গানুবাদময় কাশীখণ্ড নামক গ্রন্থটির প্রকাশ কার্য্য হইতেছে। এই জন্য

অনুবাদকারী শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষাল মহোদয় ও প্রকাশক সংস্থা সাধুবাদার্হ। শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষাল মহোদয়ের বঙ্গানুবাদের যে ধারা অল্প হইলেও যাহা দেখিয়াছি তাহা সহজবোধ্য ভাষায় উপনিবদ্ধ হইয়াছে, যাহা সাবলীল গতিযুক্ত তথা প্রসাদগুণ যুক্ত। যেহেতু আলোচ্য গ্রন্থে কাশীমাহাত্ম্য ও কাশীশ্বর মহাদেবের মহত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে তজ্জন্য কাশীশ্বর মহাদেব অর্থাৎ পরমেশ্বর শিব সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি। কিছু কিছু ব্যক্তির ধারণা ও ভাবনা প্রকাশ পাইয়াছে যাহাতে শিব নাকি বৈদিক দেবতা নহেন তিনি অনার্য্যগণের আরাধ্য রূপেতেই প্রথমে পূজিত হইতেন, পরে দেবসমাজে স্থান করিয়া লইয়াছেন। ইহা যে নিতান্ত অসার তাহা অনুসন্ধিৎসু সুধী মাত্রেই অনুভব করিবেন। পুরাণাদি গ্রন্থে শিবের অভিধারূপে যে পদসমূহ প্রচলিত রহিয়াছে তৎ তৎ নাম কেবল পুরাণাদি শাস্ত্রের মধ্যেই নাই অপিতু মূল বেদ-মন্ত্রের মধ্যেও ঐ নাম শিবকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দিতেছি।

রুদ্র (শুক্ল যজুর্বেদ ১৬ অধ্যায় ১ম মন্ত্র), গিরিশ (শু, যজু, ১৬/২), কপর্দী (শু, যজু, ১৬/৭), পশুপতি (শু, যজু ১৬/১৭), শিতিকণ্ঠ (শু, যজু, ১৬/২৮), সর্ব্ব (শু, যজু, ১৬/২৮), ভব (শু, যজু, ১৬/২৮), উগ্র (শু, যজু, ১৬/২৮), ভীম (শু, যজু, ১৬/৪১), শংকর (শু, যজু, ১৬/৪১), নীললোহিত (শু, যজু, ১৬/৪০), মৃড় (শু, যজু ১৬/৪৯), ঈশান (শু, যজু (১৬/৫৩), ত্র্যম্বক (শু, যজু ৩/৬০), কৃত্তিবাসা (শু, যজু ৩/৬১), মহাদেব (শু, যজু ৪৯/৯)—ইহা কেবল সূত্রাকারেই দেওয়া হইল, সমস্ত বেদ ভাগেই অনুসন্ধান করিলে শিববাচক প্রচলিত পদসমূহ পাওয়া যাইবে লেখাই বাহুল্য। শাস্ত্র বলিতে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিকে বোঝায়। স্মৃতি, পুরাণাদি অপেক্ষা শ্রুতির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রমাণগত বলবত্ব শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়াছে। যদ্যপি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যের মধ্যে কোন বিরোধ বা বিরোধাভাস পরিলক্ষিত হয় তখন শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্যই অধিকতর বলবত্তর বলিয়া গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণস্বরূপ এইরূপ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত। উপরি উদ্ধৃত শিববাচক পদসমূহ যেহেতু মূল বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে রহিয়াছে অতএব শিব বৈদিক দেবতা নহেন এই উক্তি যুক্তিহীন অতএব গ্রহণযোগ্য নহে। সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়রূপ ক্রিয়া

নির্বাহ করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিদেবতার উল্লেখ নানা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। অনেকে হয়তো বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে শুক্ল যজুর্বেদের ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত কিছু কিছু পদের আক্ষরিক অর্থের বিচার করিয়া শিবকে অনার্যগণের দেবতা রূপে চিহ্নিত করিতে প্রয়াস পাইতে পারেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যিনি সর্ব্বেশ্বর তিনি কেবল যাঁহারা ভদ্রাচরণ-পরায়ণ তাঁহাদেরই ঈশ্বর অথচ যাঁহারা অভদ্রাচরণ-পরায়ণ তাঁহাদের ঈশ্বর নহেন ইহা হইতে পারে না, কারণ সেক্ষেত্রে সর্ব্বশব্দের ব্যাপকত্বের হানি হইবে। সুতরাং সেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই (সুষ্মতাম্ পতয়ে নমঃ শু, যজু, ১৭/২১, তস্করাণাং পতয়ে নমঃ শু, যজু, ১৬/২১) ঐ সব মন্ত্রের উল্লিখিত ঐ সব পদসমূহের তাৎপর্য্য মূলক অর্থ প্রাচীন ভাষ্যকারগণ লিখিয়াছেন। সেই অর্থ পরিত্যাগ করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ যিনি আরাধ্য যাঁহাকে আবাহন করা হইতেছে, আরাধনা করা হইতেছে তাঁহার প্রতি কটূক্তি করা কখনই সম্ভবপর নহে, ইহা সাধারণ বিবেচনায় অনুভূত হইয়া থাকে। বেদবাক্যসমূহ নিগূঢ়ার্থক। ঐ বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য উপক্রম উপসংহারের একবাক্যতা রক্ষাপূর্ব্বক শাস্ত্রপ্রণালী অনুসারে অনুভব করিতে হইবে। স্বকপোল-কল্পিত বিচার প্রয়োগ করিয়া নহে। শ্রুতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ, কিন্তু মন্দপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের জন্য নিরাকার ও আকার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। "চিন্ময়স্যা দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাম্ কার্য্যার্থম্ ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা ॥"—এই বহুল প্রচলিত শাস্ত্রবাক্য এই স্থলে স্মরণযোগ্য। ব্রহ্মস্বরূপ শিবও সাধকগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য সাকার-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ শিব ও বিষ্ণুর পূজাই সর্মাধক হইয়া থাকে (নিত্যপূজা)। উভয় ক্ষেত্রে শাস্ত্রপ্রোক্ত ধ্যান-অনুসারে বিষ্ণু বা শিবের বিভিন্ন আকার (পুরুষাকার) বর্ণিত হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে প্রতীক অবলম্বন করিয়া পূজা ও উপাসনা প্রচলিত আছে তাহা বিষ্ণুর ক্ষেত্রে শালগ্রাম শিলা এবং শিবের ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ। শালগ্রাম শিলারূপী বিষ্ণু অথবা লিঙ্গরূপী মহেশ্বরের আরাধনায় অভীষ্ট প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ইহা শাস্ত্রে সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। ভগবান বিষ্ণু বা ভগবান শিবের শিলারূপ পরিণামের পৌরাণিক আখ্যান রহিয়াছে। মহেশ্বর শিবের স্তম্ভাকৃতি রূপধারণ সম্পর্কে

শিবপুরাণের বিদ্যেশ্বর সংহিতায় ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম অধ্যায়ের মধ্যে যে আখ্যান রহিয়াছে তদনুসারে বিষ্ণু ও বিরিঞ্চির বিরোধ নিবারণের জন্য জ্যোতির্ময় স্তম্ভরূপে মহেশ্বরের আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যেহেতু মহেশ্বর স্তম্ভরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তৎকর্তৃক এই প্রতিকৃতি শিবস্বরূপ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল এবং ঐ স্তম্ভাকৃতি বা লিঙ্গাকৃতি শিবের পূজাতে শিব সন্তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট প্রদান করিবেন এমত-ও নির্ণয় করা হইয়াছে, অতএব শিবলিঙ্গের পূজার প্রবর্তন তদবধি হইয়া আসিতেছে। অবশ্যই পুরাণান্তরে শিবলিঙ্গ পূজার প্রবর্তন সম্পর্কে কিছু ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান রহিয়াছে। তৎ তৎ আখ্যানসমূহে কিছুটা বৈবিধ্য ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইলেও ফলগত ঐক্য রহিয়াছে অর্থাৎ শিবলিঙ্গের পূজার দ্বারা অভীষ্ট প্রাপ্তি রূপ ফল বিভিন্ন পুরাণে এক। কোন কোন ব্যক্তি ইহার মধ্যে কিছু অশ্লীলতার গন্ধ পাইয়া নাসিকা কুঞ্চন করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট নিবেদন তাঁহারা নিজের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করুন তাহালেই বুঝিতে পারিবেন তাঁহাদের কল্পিত কোন অশ্লীলতা ঐ সব আখ্যানের মধ্যে নাই। কোন কোন সম্প্রদায় বিশেষের ব্যক্তিগণ আপন নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার জন্য শিবলিঙ্গ সম্পর্কে কিছু কিছু অবাচ্য বাক্যও প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের শিবমন্দির অথবা শিবলিঙ্গ দর্শনও ইষ্ট-নিষ্ঠায় বাধা উপস্থিত করে। তাঁহাদের প্রতি শ্রীভগবান কৃপা করুন ইহাই বলিতে পারি, কারণ কোন আরাধ্য ব্যক্তিকে কেহ যদি প্রণাম করে তাঁহার প্রতিটি অঙ্গই তাঁহার নিকট শুদ্ধ ও আরাধ্য ও সম্মাননীয়। কেহ যদি বলেন কোন পূজনীয় ব্যক্তির বিশেষ অঙ্গটি পূজ্য অপর কোন অঙ্গ পূজ্য নহে তাহাতে যেমন বাতুলতাই প্রকাশিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শিবলিঙ্গ প্রণম্য নহে ইহা বাতুলতার নামান্তর। আপন ইষ্ট যদি বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হন তিনি কি শিব হইতে ভিন্ন থাকেন ? যদি কেহ তাঁহার ইষ্ট-কে আপন অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন ; তিনি তাহা রাখিতে পারেন ; আমাদের বলিবার কিছু নাই, কিন্তু তাঁহার ইষ্ট সাবচ্ছিন্ন পদার্থে পরিণত হইবেন ; এই বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য। মূলতঃ শিবলিঙ্গের বিভিন্ন বিভাগ করা হইয়াছে—ইহা পার্থিব হইতে পারে, শিলাময় হইতে পারে, ধাতুময় হইতে পারে, অথবা বিভিন্ন দ্রব্যের দ্বারা ইহা নির্মাণ করা যাইতে পারে যাহা মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। বস্তুত কৃত্রিম ও অকৃত্রিম রূপে শিবলিঙ্গ দুই প্রকারের। স্বয়ম্ভু বা অনাদিলিঙ্গ ও বাণলিঙ্গ অকৃত্রিম, তদ্‌ভিন্ন মৃত্তিকা,

শিলা, বা ধাতু বা অন্য রত্নাদি পদার্থে নির্মিত লিঙ্গ কৃত্রিম। অকৃত্রিম লিঙ্গে অর্থাৎ স্বয়ম্ভু লিঙ্গে ও বাণলিঙ্গে সর্ববর্ণের পূজার অধিকার থাকে, অবশ্যই তাহা শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে।

আলোচ্য গ্রন্থে অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীপুরীর পুণ্যবৈভব বর্ণিত হইয়াছে। যাহা শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ অধ্যয়ন করিয়া ধন্য হইবেন ও প্রেরণা পাইবেন বলিয়া আশা করিতে পারি। বর্তমান সময়ে শাস্ত্রীয় তথ্য প্রকাশ ও প্রসারের প্রয়াস ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছে কারণ পুরাণাদির প্রাচীন আখ্যানসমূহ কল্পনামাত্র বলিয়াই কিছু কিছু ব্যক্তি নির্ণয় করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের নিকট পৌরাণিক আখ্যান অধ্যয়ন সময়ের অপচয় বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। তাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রযুক্তিবিদ্যা বৈভবের ঘন-ঘটায় আকৃষ্ট হইয়া পুরাণকে পুরাতন দ্রব্য রাখিবার স্থানেই নিক্ষেপ করিতে পারিলে সম্ভবতঃ স্বস্তি অনুভব করিবেন। এইরূপ ব্যক্তিগণের জন্য নিশ্চয় এই আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করা হইতেছে না। বস্তুত যাঁহারা এখনও প্রাচীন পরম্পরার প্রতি মান্যতা প্রদান করিতে চাহেন, পৌরাণিক আখ্যানসমূহ হইতে শিক্ষার, আদর্শের অনুকরণ করিতে চাহেন এবং সেই অনুকরণ আপন অনুগামীদের মধ্যে অনুসরণ করিবার প্রবণতা সৃষ্টি করিতে চাহেন তাঁহারা নিশ্চয় এই গ্রন্থ প্রকাশকে স্বাগত জ্ঞাপন করিবেন। এই সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ মূলতঃ সংস্কৃত শ্লোক পরিহার করিয়াই লিখিত হইয়াছে, কারণ মূল গ্রন্থটি কেবল অনুবাদ-মূলক অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বোধ সৌকর্যের জন্যই ইহা প্রকাশ হইতেছে। সুতরাং সেই সব পাঠক-গণের পঠন-স্পৃহাকে পীড়াগ্রস্ত না করিতেই মূল শাস্ত্রবাক্যসমূহ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

এই নিবন্ধের আরম্ভে প্রসিদ্ধ শিবভক্তি পরায়ণ ঋষি উপমন্যু রচিত শ্লোক দিয়াই আরম্ভ করা হইয়াছিল ; সুতরাং পরিশেষে ঋষি উপমন্যুর ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারিত উক্তির উদ্ধৃতি করিতেছি—

শরণং তরুণেন্দু শেখরঃ, শরণং মে গিরিরাজ কন্যকা।
শরণং পুনরেব তাবুভৌ শরণং নান্যদুপৈমিদৈবতম্ ॥

তারকেশ্বর মঠ

দণ্ডিস্বামি হৃষীকেশাশ্রম

ভূমিকা

ভারতীয় মণীষা যখনই শাশ্বত সত্যের সন্ধান পেয়েছে এবং তাকে গ্রন্থে বিধৃত করে রাখার চেষ্টা করেছে, তখনই তাকে স্বল্পশক্তি মানুষের প্রযত্নের ফলশ্রুতি বলে স্বীকার না করে বিশ্বের পুঞ্জীভূত প্রজ্ঞার বাঙ্ময় প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছে। বেদব্যাস হচ্ছেন এই প্রজ্ঞারই বাহ্য প্রতিরূপ। তাই একদিকে তাঁকে মহাভারত রচনা করতে হয়েছে, বিভিন্ন দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিষ্ঠাপক পুরাণ লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে, আবার পুরাণের শ্রেণীবিভাগ করে উপপুরাণের সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে। এক কথায় 'ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ'—এই অনুশাসন অবলম্বন করে বৈদিক সত্যের বিস্তৃত বিবরণ দেবার জন্য যত উদ্যম এবং যত সৃষ্টি তার তিন-চতুর্থাংশই বেদব্যাসের, যিনি হচ্ছেন ভারতবর্ষের সামগ্রিক বৈদগ্ধ্য এবং পুঞ্জীভূত প্রজ্ঞার মানবিক রূপ। বেদব্যাসের সব সৃষ্টিতেই নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সগৌরবে বিরাজিত বলে সর্বসাধারণের মধ্যে এর প্রচার ও প্রসার যত হয়, ততই সমাজের ও জাতির মঙ্গল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলাভাষায় অনেক অনুবাদ হলেও বেদব্যাসের কাশীখণ্ডের মূলানুগ তথ্যনির্ভর বঙ্গানুবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নি। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের এই দুর্বল দিকটিকে সবল করার জন্য শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষাল তাঁর কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গভীর প্রবেশ, বাংলা ভাষায় বিস্ময়কর অধিকার, কাহিনী উপস্থাপনের সরস ভঙ্গি, পুরাণ ইতিহাস বর্ণিত কথা-উপকথার সহিত ব্যাপক পরিচিতি, ঐ-সবের সমন্বয় শ্রীঘোষালের সৃষ্টিধর্মী মনকে সমৃদ্ধ করেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুবাদও হয়ে উঠেছে উৎকর্ষবান। মূলসাহিত্য সৃষ্টির চেয়ে অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির কর্ম দুরূহ। কারণ মূলসাহিত্যে কবিপ্রতিভার স্বচ্ছন্দবিহারের অবকাশ আছে। অনুবাদসাহিত্যে মূলের গণ্ডীর মধ্যেই সৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয় বলে অনুবাদকের এ অবকাশ নেই। যে অনুবাদক মূলের কাব্যোৎকর্ষ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন, তিনি সার্থক স্রষ্টা ও সফল শিল্পী। শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষাল এ দিক্ দিয়ে বাংলা সাহিত্যে সার্থক সৃষ্টি উপহার দিতে পেরেছেন নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাঁর অনুবাদ রাজশেখরের রামায়ণ ও মহাভারতের সারানুবাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি শ্রীঘোষালের অনুবাদ-সৃষ্টিকে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে সানন্দে বরণ করি।

ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা
প্রাক্তন উপাচার্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

প্রাসঙ্গিকী

পরমাদরভাজন শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষাল মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্তৃক বিরচিত সুবিখ্যাত কাশীখণ্ডম্-এর সরল, সহজ, সুমধুর অনুবাদ করে সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, নিঃসন্দেহ।

কাশীখণ্ডম্ ভাষার মাধুর্যে, ভাবের সৌন্দর্যে, আঙ্গিকের ঐশ্বর্যে ভারতীয় সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীভূত স্থান অধিকার করে আছে আদ্যন্তকাল। অতি মনোরম আখ্যায়িকার মাধ্যমে উচ্চতম, নিগূঢ়তম, গভীরতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলীর এই অনুপম অপরূপ বিশ্লেষণ সত্যই অতীব বিস্ময়কর। সেজন্য ভারতীয় শাশ্বত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল উৎস সাম্য-ঐক্য-প্রীতি-মৈত্রী-সেবা-ত্যাগের মূর্ত প্রতীকরূপে এই চিত্তাকর্ষক গ্রন্থটি সর্বজনপূজ্য পরিপূর্ণভাবে।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহাশয়ের বাংলা অনুবাদও যে সকলের নিকট সমাদৃত হবে, তা নিঃসন্দেহ। তাঁর ভাষা সর্বজনবোধ্য এবং সর্বমনতৃপ্তিপ্রদায়ক। তাঁকে আমাদের সকলের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ডক্টর রমা চৌধুরী

প্রাচ্যবাণী
৩, ফেডারেশন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

॥ বিষয় সূচী ॥

নারদ কর্তৃক নবজাতকের সুলক্ষণ বর্ণনা, কাশীতে গৃহপতির সুকঠোর লিঙ্গার্চনায় তুষ্ট মহাদেব কর্তৃক গৃহপতিকে অগ্নিলোক প্রদানের পুরাকাহিনী গণদ্বয় কর্তৃক শিবশর্মা-সমীপে বর্ণন ৩৬ ; নৈঋত-লোক বর্ণনা প্রসঙ্গে শবরাধিপ পিঙ্গাক্ষের কাহিনী কথন ৪০ ; বরুণ লোকাধিপতির প্রসঙ্গে কর্দমপুত্র শুচিষ্মানের কাহিনী কথন ৪২ ; গন্ধবতী-পুরী প্রসঙ্গে কশ্যপ-তনয় পূতাত্মার সাধন কথন ৪৪ ; কুবেরের উৎপত্তি প্রসঙ্গে যজ্ঞদত্ত-পুত্র গুণনিধির কলিঙ্গাধিপতি দম-র কাহিনী ও দীপদানের মাহাত্ম্য বর্ণন, কুবেরের শিব-সখাত্ব প্রাপ্তি এবং একচক্ষু হওয়ার রহস্য কথন ৪৫ ; গণদ্বয় কর্তৃক শিবশর্মা-সমীপে ঈশানপুরী প্রসঙ্গে একাদশ রুদ্রের আধিপত্য ও ঈশানেশ্বরের মাহাত্ম্য কথন ৫১ ; চন্দ্রলোক বর্ণন, চন্দ্রের জন্মরহস্য, কাশীধামে চন্দ্রের তপস্যা এবং লোকাধিপত্য লাভ ৫২ ; নক্ষত্রলোক বর্ণনা প্রসঙ্গে বারাণসীতে দক্ষের ষাট কন্যার পতিকামনায় তপস্যা, নক্ষত্র নামরহস্য, শিব-বরে চন্দ্র-কে পতিরূপে লাভ এবং নক্ষত্রলোক প্রাপ্তি কথন ৫৪ ; বুধের জন্মপ্রসঙ্গে চন্দ্র-কর্তৃক দেবগুরু-পত্নী তারার অবৈধ গর্ভসঞ্চার, রুদ্র-সহ চন্দ্রের যুদ্ধ, বারাণসীতে বুধের তপস্যা এবং বুধলোক প্রাপ্তি কথন ৫৫ ; গণদ্বয় কর্তৃক শুক্রলোক বর্ণন, অন্ধকাসুরের মৃত সৈন্যদের ভার্গবের মৃতসঞ্জীবনী দ্বারা জীবনদান, নন্দী কর্তৃক ভার্গব অপহরণ ও মহাদেবের জঠরে অবস্থান, 'শুক্র' নামের রহস্য, তপস্যায় শুক্রলোক প্রাপ্তি কথন ৫৭ ; মঙ্গললোক বর্ণন, 'মহীসুত' ও 'অঙ্গারক' নাম-রহস্য কথন ৬০ ; বৃহস্পতি লোক বর্ণনা প্রসঙ্গে বারাণসীতে আঙ্গিরসের তপস্যা, বৃহস্পতি নাম-রহস্য ও দেবগুরু পদে অধিষ্ঠিত হয়ে লোকাধিপত্য কথন ৬১ ; শিবশর্মা সমীপে গণদ্বয়ের শনিলোক বর্ণন, শনির জন্মরহস্য কথন, বারাণসীতে শনির তপস্যা ও গ্রহাধিপত্য লাভ ৬২ ; সপ্তর্ষি লোক বর্ণনা প্রসঙ্গে সপ্ত ঋষি ও ঋষিপত্নী, বারাণসীতে লিঙ্গ স্থাপন ও তপস্যায় লোকপ্রাপ্তি কথন ৬৫ ; ধ্রুবলোক বর্ণনা প্রসঙ্গে উত্তানপাদ-তনয়ের সংসারাভিমান, প্রাসাদ হতে নিষ্ক্রমণ, সপ্তর্ষির উপদেশে বিষ্ণুর ধ্যান, ইন্দ্রের ভীতি ও বিঘ্নসঞ্চার, দেবগণের ব্রহ্ম-শরণ, বিষ্ণুর বরদান এবং তাঁরই পরামর্শে বারাণসীতে আগমন, লিঙ্গ স্থাপন, তপস্যায় লোকাধিপত্য লাভ কথন ৬৬ ; মহ-জন-তপলোক বর্ণন, শিবশর্মার সত্যলোকে আগমন, ব্রহ্মার সাক্ষাৎ এবং বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য, ইলাবৃতবর্ষ, জম্বুদ্বীপ, বর্ণন ও তীর্থমধ্যে প্রয়াগ অপেক্ষা কাশীর শ্রেষ্ঠত্ব ৭২ ; ভূর্লোক হতে লোক-লোকান্তর শেষে শিবলোকের দূরত্ব কথন

৭৪ ; গণদ্বয় কর্তৃক বিষ্ণু ও ব্রহ্মা-সহ শিবের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন ৭৫ ; গণদ্বয়-কর্তৃক মুক্তার্থী শিবশর্মার সংশয় নিরসন প্রসঙ্গে বৃদ্ধকাল রাজারূপে শিবশর্মার পুনর্জন্ম, রাজ্য-বৈরাগ্য, কাশীপ্রাপ্তি, মহাকাল স্মরণ, লিঙ্গস্থাপন ও অর্চনায় মোক্ষলাভের বিষয় কথন ৭৬।

লোপামুদ্রাসহ অগস্ত্যের শ্রীপর্বত প্রদক্ষিণ শেষে স্কন্দকানন দর্শন, ষড়াননের স্তব এবং কাশীক্ষেত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ৭৮ ; মহাদেব-কর্তৃক পার্বতী-সমীপে গীত এবং মাতৃক্রোড়াসীন ষড়ানন কর্তৃক শ্রুত অগস্ত্য সমীপে কাশী-বিষয়ক স্মৃতিচারণ ৭৯ ; পঞ্চক্রোশী কাশীর মাহাত্ম্য কথন, ৮০ ; মণিকর্ণিকার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে মহাদেব কর্তৃক অচ্যুতের সৃষ্টি, অচ্যুতের তপস্যা এবং 'কাশী' নামোৎপত্তি কথন ৮০ ; কাশীর 'বারাণসী' প্রভৃতি নামকরণ প্রসঙ্গে কলিযুগ-তীর্থে মোক্ষদা গঙ্গার মাহাত্ম্য কথন ৮৩ ; গঙ্গায় অস্থিদান প্রসঙ্গে পাপাচারী ব্রাহ্মণ বাহীকের কাহিনী ৮৫ ; গঙ্গাস্তোত্র পাঠমাহাত্ম্য, মণিকর্ণিকার উৎকর্ষতা কথন ৮৭ ; সুরক্ষিত কাশী-প্রবেশ বিশ্বেশ্বরের অনুমতি-সাপেক্ষ প্রসঙ্গে বণিক ধনঞ্জয়ের কাহিনী বর্ণন ৮৭ ; কাশীর 'রুদ্রাবাস' ও 'মহাশ্মশান' নামরহস্য ৮৮ ; অব্যয় তত্ত্ব-বিষয়ে ব্রহ্মার মোহ, ক্রতুর সঙ্গে বিবাদ, কালভৈরবের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ড উৎপাটন ৮৯ ; ব্রহ্মাহত্যা পাপে কপালহস্তে কপর্দীর ত্রিলোক-ভ্রমণ, বিষ্ণুর আর্তি, বিষ্ণুকে বরদান, কাশী প্রবেশ, ভৈরবের কপালমুক্তি এবং কপালমোচন তীর্থের উদ্ভব ও মাহাত্ম্য ৯১।

হরিকেশ প্রসঙ্গঃ যক্ষ রত্নভদ্রের যোগবলে তনুত্যাগ, পত্নী কনক কুণ্ডলা-সহ রত্নভদ্র-পুত্র পূর্ণভদ্রের-পুত্রার্থে কাশীগমন ; শিব বরে হরিকেশ-নামে পুত্র লাভ ৯৩ ; হরিকেশের শিবমনস্কতায় পূর্ণভদ্রের ক্রোধ, হরিকেশের বারাণসী গমন এবং তপস্যা ৯৪ ; পার্বতীর অনুরোধে মহাদেব-কর্তৃক হরিকেশকে কাশীপুরীর দণ্ডপানিত্ব দান ৯৫ ; জ্ঞানবাপীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য কথন ৯৬ ; জ্ঞানবাপী প্রসঙ্গে বিদ্যাধর-কর্তৃক হরিস্বামী-কন্যা সুশীলার অপহরণ, রাক্ষস বিদ্যুন্মালী-কর্তৃক বিদ্যাধর-নিধন এবং বিরহকাতরা সুশীলার প্রাণত্যাগ ; কর্ণাট-প্রদেশে মাল্যকেতু ও কলাবতী নামে বিদ্যাধর ও সুশীলার পুনর্জন্ম, বিবাহ, কলাবতী-কর্তৃক বারাণসীর চিত্রপট দর্শন এবং পূর্বস্মৃতির উদ্ভব, কাশীতে আগমন, তপস্যা ও বরলাভ ৯৭।

কাশী প্রাপ্তির সহায়ক সদাচার-প্রসঙ্গে যম-নিয়ম-প্রাণায়াম-গায়ত্রী, যজ্ঞ, ঋণ-পরিশোধ প্রভৃতি কথন ১০০ ; স্কন্দ-কর্তৃক অগস্ত্যকে মহাযোগ, মহাদান,

মহতী তপস্যা বিষয় কথন ১০৩।

অনাবৃষ্টির কারণে সৃষ্টিলোপ আশঙ্কায় ব্রহ্মা-কর্তৃক রাজর্ষি রিপুঞ্জয়কে পৃথিবীনাথ হওয়ার অনুরোধ এবং শর্ত-সাপেক্ষে রিপুঞ্জয়ের সম্মতি, ব্রহ্মা-কর্তৃক রিপুঞ্জয়ের দিবোদাস নামকরণ ১০৪ ; অলক্ষিতে কাশীতে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করে পার্বতী-সহ বিশ্বেশ্বরের মন্দরে গমন ১০৫ ; অবিমুক্তক্ষেত্র ও অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে ষড়ানন-কর্তৃক অগস্ত্যকে বেদবিহিত ধর্মানুশীলন উপদেশ দান, ষড়ঙ্গ যোগের ফলশ্রুতি কথন এবং বারাণসীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ১০৬ ; দেবেশের প্রস্থানে দেবগণের কাশীত্যাগ, দিবোদাসের ধর্মনিষ্ঠ রাজ্যশাসন ১১১ ; কাশী-বিরহাতুর দেবেশের কাশীপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেবতাদের সঙ্গে দেবগুরুর মন্ত্রণা এবং দেবরাজের আদেশে অগ্নির কাশীত্যাগ, দিবোদাসের ক্ষোভ, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, বরুণকে বিতাড়ন, দিবোদাসের সর্বমুখীতা ১১২ ; পার্বতী-সহ কাশীবিরহ-কাতর মহাদেব কর্তৃক যোগিনী-গণের আহ্বান এবং দিবোদাসের ছিদ্রান্বেষণের জন্য আদেশ দান ১১৪। উৎসুক অগস্ত্যকে ষড়ানন-কর্তৃক চৌষট্টি যোগিনীর নাম কথন ১১৬ ; যোগিনীরা প্রত্যাবৃত্ত না হওয়ায় বিশ্বেশ্বর কর্তৃক সূর্যকে আবাহন ও কাশী প্রেরণ, বিফল মনোরথ সূর্যেরও কাশীতে অবস্থান এবং লোলার্ক নামে বারাণসীতে অবস্থান ১১৭।

কাশীর ক্ষেত্র-রক্ষক দ্বাদশ আদিত্য প্রসঙ্গে লোলার্কের পর উত্তরার্কের উদ্ভব. প্রিয়ব্রত ও শুভব্রতার অবিবাহিতা কন্যার ব্রহ্মচর্য, উত্তরার্ক সূর্য-সন্নিকটে তপস্যা, বরদাতা বিশ্বেশ্বরকে সঙ্গী ছাগসুতার পশুযোনিত্ব মুক্তির অনুরোধ, পরহিতৈষণায় বিমুগ্ধা পার্বতী-কর্তৃক কন্যাকে স্বীয় সখীত্ব দান ১১৮ ; সাম্বাদিত্যের কাহিনী—নারদের প্ররোচনায় কৃষ্ণ-কর্তৃক পুত্র সাম্বকে অভিশাপ, কাশী গমন, তপস্যা, রোগ-আরোগ্য এবং সাম্বাদিত্য-রূপে কাশীতে অবস্থান ১২০ ; দ্রৌপদাদিত্য প্রসঙ্গ ঃ পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র-রূপে মহাদেবের অবতরণ, পতি-বিচ্ছেদ-কাতরা সতীরও দ্রুপদ-যজ্ঞকুণ্ড হতে সমুদ্ভূতা, পঞ্চ-পাণ্ডবের পত্নীত্ব লাভ, বারাণসীতে দ্রৌপদীর তপস্যা, দ্রৌপদী-আরাধিত আদিত্য-কর্তৃক দ্রৌপদীকে অক্ষয় স্থালী দান ১২২ ; পঞ্চনদতীর্থে সহস্রমালি কর্তৃক লিঙ্গ এবং মঙ্গলগৌরী, প্রতিষ্ঠা, তপস্যা, এবং ময়ূখাদিত্য নামে ক্ষেত্র-রক্ষকত্ব লাভ ১২২ ; খখোল্কাদিত্য প্রসঙ্গে বিনতা ও কদ্রুর উপাখ্যান, আদিত্যের 'খখোল্ক' নামকরণ রহস্য, কদ্রুর আদেশে নাগগণের উচ্চৈঃশ্রবাকে কৃষ্ণবর্ণ-করণ, বিনতার

দাসীত্ব, বিনতার মুক্তির শর্তপালনে গরুড়ের অমৃত-আহরণে গমন, দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ, গরুর-কর্তৃক বিষ্ণুকে বরপ্রদান, বিনতার দাসীত্ব-মোচন, মহাদেব-কর্তৃক গরুড়কে বিনতাদিত্য তথা খখোল্কাদিত্য নামে ক্ষেত্র-রক্ষার্থে স্থাপন ১২৩ ; গরুড় জননী বিনতার দাসীত্ব গ্রহণের রহস্য স্কন্দদেব-কর্তৃক অগস্ত্যকে কথন ১২৭ ; অরুণাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য, গঙ্গাদিত্য ও যমাদিত্যের আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য কথন ১২৯ ।

মহাদেবের নির্দেশে ব্রহ্মার কাশী আগমন, দিবোদাসের ছিদ্রান্বেষণে ব্যর্থ ব্রহ্মার রাজর্ষি-সমীপে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার অভিলাষ জ্ঞাপন, দিবোদাসের সাহায্য, দশাশ্বমেধের উৎপত্তি রহস্য ১৩১ ; শম্ভুকর্ণ, মহাকাল, ঘণ্টাকর্ণ প্রভৃতি গণদের মহাদেব-কর্তৃক কাশীতে প্রেরণ, গণকর্তৃক লিঙ্গ-স্থাপন ও কাশীতে অবস্থান ১৩৪ ; কপর্দীশ লিঙ্গ-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে পুরাণ-মুনি বাল্মীকী ও পিশাচযোনি-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ এবং বিমলোদক কুণ্ড ও পিশাচ-মোচন তীর্থ কথা বর্ণন ১৩৭ ; মহাদেব-কর্তৃক পুত্র গণেশকে আহ্বান ও কাশী-প্রেরণ ১৩৯ ; গণক-ছদ্মবেশে গণেশের কাশী প্রবেশ, স্বপ্ন-বিবরণ ও কাশীবাসীর মনে ত্রাস-সঞ্চার, উদ্বিগ্ন দিবোদাসের গণেশ-শরণ ও শুভ ইঙ্গিত শ্রবণ ১৪০ ; গণনায়ক বিনায়ক কি কি নামে কাশীক্ষেত্র রক্ষা করছেন তার পরিচয় জ্ঞাপন ১৪৩ ; গণেশের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দর্শনে বিরহাতুর মহাদেবের কাশীতে বিষ্ণুকে প্রেরণ ১৪৫ ; লক্ষ্মী ও গরুড়সহ বিষ্ণুর কাশী আগমন, পাদোদক তীর্থোদ্ভব, আদিকেশবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও অর্চনা ১৪৫ ; অল্পাংশে বিষ্ণুর সৌগত পুণ্যকীর্তি, লক্ষ্মীর পরিব্রাজিকা, গরুড়ের বিনয়কীর্তি ছদ্মবেশ গ্রহণ, বেদ-বিরোধী ধর্ম প্রচার, অন্তঃপুরচারিণীসহ পুরবাসীদের উন্মার্গগামীতার কাহিনী কথন ১৪৬ ; দিবোদাস-সমীপে বিষ্ণুর ব্রাহ্মণ-বেশে আগমন এবং রাজ্য-বিরক্ত দিবোদাসকে উপদেশ প্রদান ১৪৯ ; দিবোদাস-এর রাজকার্য ত্যাগ, দিবোদাসেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা এবং মোক্ষলাভ কথন ১৫০ ; মন্দর পর্বত থেকে মহাদেবের দেবগণ-সহ বিশ্বকর্মা-কৃত কাশীতে প্রবেশ, গণেশ-স্তুতি এবং বিশ্বকর্মাকৃত নবনির্মিত প্রাসদে আগমন উদ্যোগ ১৫১ ;

পঞ্চনদতীর্থে কেশবের অবস্থান, পঞ্চনদতীর্থ প্রসঙ্গে ঋষি বেদশিরা ও অপ্সরা শুচি, ধূতপাপার জন্ম, সৎ পতি কামনায় কাশী গমন, তপস্যা ও চতুরাননের বরলাভ ১৫২ ; ধূতপাপার প্রতি ধর্মের আসক্তি, ধূতপাপার প্রত্যাখ্যান এবং অভিশাপে ধর্মের নদরূপ গ্রহণ, ধর্মের অভিশাপে ধূতপাপার

কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির

দশাশ্বমেধ ঘাট

মণিকর্ণিকা ঘাট

কালভৈরবের মূর্তি

ঢুণ্ডিরাজ
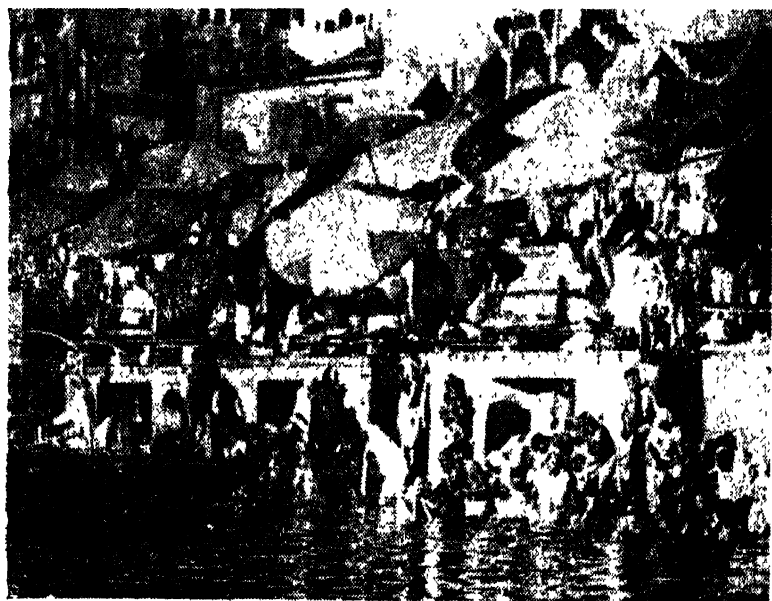
কাশীর গঙ্গাঘাটে পরিচিত স্নানদৃশ্য

পঞ্চগঙ্গা ঘাট

[অধ্যায় ১]

নরোত্তম নর নারায়ণকে নমস্কার। বন্দনা করি দেবী সরস্বতীর।।

ত্রিতাপ-বিরহিত, সর্ববিঘ্নবিনাশক মহেশ-নন্দন গজেন্দ্রবদন দেব গণপতি বিনায়ককে নমস্কার।

ভূলোকে অবস্থিতা হয়েও, যিনি ভূলোক অন্তর্গত নন; অধঃ-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিতা হয়েও যিনি স্বর্গাদপি গরীয়সী, সংসারাবদ্ধ জীবগণের যিনি মুক্তি-প্রদয়িনী; জীবদেহ-পরিত্যাগকারী প্রাণ যেখানে পায় মোক্ষের সন্ধান; ত্রিভুবন-পাবনী জাহ্নবীর তরল-তরঙ্গ যাঁর লীলায় সদা-চঞ্চল; সুরগণ তার তীরে বসে নিত্য যাঁর গান বন্দনা; দেবাদিদেব ত্রিপুরারিমহেশ্বর-এর রাজনিকেতন সেই ত্রিভুবন-বিদিত কাশীধাম, বিশ্বের যাবতীয় বিঘ্ন বিনাশ করুক। ত্রিজগতের অধীশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্বয়ং ভর্গদেবের (সূর্যের) উদ্দেশ্যে ত্রিসন্ধ্যার নিমিত্ত যে স্থানে নিত্য যাতায়াত করেন, সেই স্থানাধিপ দেবদেব মহেশকে নমস্কার।

অষ্টাদশ পুরাণ রচয়িতা সত্যবতীতনয় বেদব্যাস কাশী-বন্দনা শেষে স্বীয় শিষ্য সূতের নিকট সর্বপাপহারিণী কাশীখণ্ডের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন এইভাবে:

একদিন ত্রিভুবন-পর্যটনকারী মহর্ষি নারদ নর্মদার স্বচ্ছ-সলিলে অবগাহন সেরে ওঁকারেশ্বর মহাদেবের অর্চনার পর সামনেই বিন্ধ্য-পর্বত দেখে, এলেন পর্বত-দর্শনে। স্থাবর-জঙ্গম নিয়ে সুবিস্তৃত, সুউন্নত বিন্ধ্যের পাদদেশ বিধৌত করে চলেছে নর্মদার নির্মল সলিল। ধরাধর এই ভূধরের প্রান্ত হতে প্রান্তে, সানুদেশ হতে শিখর পর্যন্ত বৃক্ষ, পুষ্প, লতা, গুল্ম, যেন থরে-থরে সজ্জিত; ফলভারে আনত বৃক্ষরাজি যেন নিরন্তর আহ্বান করে চলেছে ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর পথিককে।

কোথাও তাল-তমাল হিন্তালের সমারোহ। কোথাও বা বিস্তৃত পরিসরে উদুম্বর যজ্ঞডুমুর বৃক্ষনিকর। কোথাও বা প্রস্ফুটিত নীপ, কদম্ব। কোথাও বা রুদ্রাক্ষ, প্রিয়াল, ধুস্তুর। কোথাও বা শীতল স্নেহ-ছায়াদানে রত বিশালকায় বটবৃক্ষ-সমূহ। কোথাও বা বনলক্ষ্মীর নৃত্যালয়-সদৃশ শোভমান রক্তবর্ণ নাগরঞ্জ কুঞ্জসমূহ, অনন্ত কঙ্কাল লতিকা, লবলী পল্লব ; বানীর, বিজপুর, জম্বীর। কোথাও বা বায়ু-বিকম্পিত কর্পূর শাখা, উজ্জ্বলকান্তি রাজচম্পক-কলিকা নিত্য যেন করে চলেছে বিন্ধ্যের আরতি। কোথাও বা বদরী, বন্ধুজীব, জীবপত্র, তিন্দুক, ইঙ্গুঁদি, সাল, অর্জুন, অঞ্জন, খর্জুর, নারিকেল, নিম, বকুল, তিলক, দেবদারু, হরি। কোথাও বা এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ, কুদ্দাল, জম্বু, আম্রাতক, ভল্লাত। কোথাও বা অগণিত শ্বেত ও রক্তচন্দন, হরীতকীর মেলা। ঘুরে-ঘুরে দেখেন মহর্ষি নারদ অশেষ সম্পদশালী অনুপম বিন্ধ্য, সর্বৈশ্বর্যের আকর, স্বর্গ অপেক্ষাও যেন ভাস্বর। ভাবেন মনে-মনে দেব-ঋষিগণের কাছে তাই বুঝি বিন্ধ্য এত আকর্ষণীয়। উদার ভূধর বিন্ধ্য অভ্যাগতের কাছে প্রকৃতই অকৃপণ।

ব্রহ্মা-তনয় মহর্ষি নারদ। তেজঃপুঞ্জ কান্তি। যেখান দিয়েই তিনি পরিভ্রমণ করেন, সেখানকারই গুহার অন্ধকার যায় বিদূরিত হয়ে। বিচলিত হয় বিন্ধ্যের বিশ্রাম। সচকিত উল্লাসে এগিয়ে আসে দেবর্ষির কাছে সসম্ভ্রম আহ্বান নিয়ে। পাষাণ-হৃদয় তার দ্রবীভূত হয়ে উঠল দেবর্ষির সন্দর্শনে নিজেকে সে মনে করল সৌভাগ্যশালী। উন্নত শির আনত করে আভূমি প্রণাম জানাল সে মুনিবরকে। অষ্টোপকরণে করল তাঁর অর্চনা।

অর্ঘ-গ্রহণের পর বিশ্রামশেষে মুনিবর অপগত-শ্রম হয়েছেন দেখে কৃতকৃতার্থ বিন্ধ্য জানাল মুনিবরের এই প্রসাদ লাভ তার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল—'ধরাধর' নাম আজ তার সার্থক হল।

কোন প্রত্যুত্তর না করে বিন্ধ্যের কথায় দেবর্ষি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলেন মাত্র।

প্রশ্ন জাগে বিন্ধ্যের মনে—দেবর্ষি কী তাকে 'ধরাধর' হিসেবে

স্বীকৃতি দিতে অসম্মত? কেন? পৃথিবীতে ভূধর অনেক আছে ঠিকই কিন্তু সর্বৈশ্বর্য দিয়ে কে তার মত পৃথিবীকে ধারণ করে আছে? সুমেরু পর্বতকে সকলেই দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান, কিন্তু, সুমেরু ত' তার মত একক নয়। অধিক সুবর্ণ-পূর্ণতা কিংবা রত্নময় সানুদেশ অথবা দেবগণের আবাসস্থল হতে পারে সুমেরু, তবুও বিন্ধ্যের বিশালত্ব আর সর্বময়তার সঙ্গে তার তুলনা অনুচিত। হিমালয়কে 'গিরিরাজ' বলে সম্মান দেয় সকলে। কিছু-কিছু পর্বতের আধিপত্য তাতে আছে ঠিকই, কিন্তু সত্যিই কি পর্বত-রাজ হবার যোগ্যতা তার আছে? পার্বতী-মহাদেবের সম্বন্ধ-সূত্রেই তার সম্মান; এছাড়া আর কোন গুণে সে গুণান্বিত? এছাড়া অনেক ভূধর রয়েছে বটে, যারা অনেক মাননীয়েরই মান্য। কিন্তু স্বদেশ ছাড়া বহির্বিশ্বে তাদের পরিচিতি কতটুকু? উদয়গিরির স্বকীয়তা কোথায়? সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় উদয়গিরি জীবন্মৃত। ওষধিলতা-বিহীন নিষধ পর্বত অতি নগণ্য, কান্তিবিহীন। নীলপর্বত ত' নিজেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। শ্রীহীন মন্দরগিরি। মলয়-পর্বত একমাত্র সর্পকুলেরই আবাসস্থল। ধনৈশ্বর্য কাকে বলে রৈবতপর্বত তার কিছুই জানে না। হেমকূট হল কূটীলাগ্রগণ্য। এছাড়া, কিষ্কিন্ধ, ক্রৌঞ্চ, সহ্য ইত্যাদি যেসব পর্বত রয়েছে তাদের সামর্থ্য কোথায় এইভাবে পৃথিবী ধারণের?

আত্মশ্লাঘায় স্ফীত বিন্ধ্য। সর্বৈশ্বর্যের আকর হলেও বিন্ধ্য জানে না—আত্মশ্লাঘা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়; তাছাড়া শ্রীশৈল প্রমুখ এমন অনেক পর্বত আছে, যাদের শিখর দর্শনেই মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। সর্বজ্ঞ দেবর্ষি নারদ মনস্থ করলেন, বিন্ধ্যের সামর্থ্য কতখানি, একবার তা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

বিদায়কালে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে দেবর্ষি নারদ তাই বললেন বিন্ধ্যগিরিকে—ছাখ বিন্ধ্য, একমাত্র শৈলশ্রেষ্ঠ সুমেরুই তোমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এই বলে নারদ তাঁর বাহনে আকাশপথে প্রস্থান করলেন।

নারদের কথা শুনে, বিন্ধ্যের মনে সুমেরুর প্রতি জেগে উঠল তীব্র

বৈরীভাব। সুমেরুর গর্ব চূর্ণ করার স্পৃহায় উত্তেজিত হয়ে উঠল বিন্ধ্য। চিন্তাক্লিষ্ট হল সে। একবার ভাবল, পক্ষ বিস্তার করে সে উড়ে গিয়ে পড়বে সুমেরুর ঘাড়ে; দেখিয়ে দেবে তার গুরুভার। কিন্তু সে উদ্যমও হল বৃথা। বিস্মৃত হয়েছিল, দেবরাজ ইন্দ্র তাদেরই কোন পূর্বপুরুষের প্রতি কোপবশে পর্বত-সমূহের পক্ষ ছেদন করে তাদের স্থানু করে দিয়েছেন। তাহলে কি উপায়ে নিজ পরাক্রম প্রকাশ করে সুমেরুর দম্ভ চূর্ণ করা যায়? ক্রমবর্ধমান ব্যাধি, শত্রুতা যেমন উপেক্ষা করা উচিত নয় তেমনি কালক্ষেপ করাও সমীচীন নয়।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর অনন্যোপায় বিন্ধ্য শেষে শরণ নিল বিশ্বস্রষ্টা ভগবান বিশ্বেশ্বরের। শরণাগত ভক্ত, মনোবাঞ্ছা পূরণের ইঙ্গিতও পেল। ঠিক করল, গ্রহ-নক্ষত্রগণ-সহ সুমেরু পরিভ্রমণকারী সূর্যের পথ সে অবরুদ্ধ করে দাঁড়াবে; দেখাবে তার অনমনীয় শক্তি-সামর্থ্য। পথের সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই স্ফীতকায় হয়ে উঠতে লাগল বিন্ধ্য। শিখরশ্রেণী তার গগনপথ অতিক্রম করে প্রায় নভোমার্গের শেষ সীমা স্পর্শ করল। দূরীভূত হল বিন্ধ্যের চিন্তা; সুমেরুর প্রতি সার্থক বৈরিতায়, উৎফুল্লিত তার হৃদয়। মনে-মনে এই ভেবে সন্তুষ্ট হল, শক্তির পরিচয় না পেলে সকলেরই স্পর্ধা জাগে উপেক্ষা করার। স্বীকৃতি লাভের একমাত্র পথই হল শক্তির প্রকাশ। একখণ্ড কাঠকে উপেক্ষা করে যাওয়া সোজা কিন্তু, সেই কাঠ যখন জ্বলন্ত হয়ে উঠে, তখন!

এইভাবে বিমুক্ত চিন্তায় বিন্ধ্য স্ফীতকায় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সূর্যোদয়ের।

[অধ্যায় ২]

পূর্বদিকে কিরণজাল বিস্তার করে সমুদিত হলেন সূর্য। তমিস্রা-রজনী শেষে আবার প্রাণস্পন্দনে মুখর হয়ে উঠল বিশ্বচরাচর। মুদিতাননা পদ্মিনী মেলল আঁখি। স্ব-স্ব কর্মে রত হল জীবকুল। গমনপথে প্রিয় পৃথিবীর যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমের উপর অনুরাগের করস্পর্শ আর জীবনের আশ্বাস দিতে-দিতে দিকপতি সূর্য অগ্রসর হলেন দক্ষিণ দিকে। কিন্তু অনায়াসে শূন্যমার্গ বিজয়ী সূর্যের অশ্বগণ বাধা পেল স্ফীতকায় বিন্ধ্যের কাছে এসে। থেমে গেল সূর্যের রথ। সূর্য-সারথি অনূরু দেব তপনকে জানাল—বিন্ধ্যগিরি সদর্পে গগন-মার্গ অবরোধ করেছে। অভিলাস তার, প্রত্যহ সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করে আপনি যেমন অস্তাচলে যান, বিন্ধ্যকেও তেমনি প্রদক্ষিণ করতে হবে। শুনে স্তম্ভিত হলেন তপনদেব—শূণ্যমার্গও অবরুদ্ধ হয়!

অমিত শক্তির আকর তেজোদীপ্ত তপনদেব, আধ-পলকে যিনি অতিক্রম করেন তুহাজার তুশো যোজন পথ (১ যোজন=৪ ক্রোশ), বিধিব বিধানে তাঁকেও কিছুকাল একজায়গায় নিশ্চল হয়ে থাকতে হল! এই নিশ্চল অবস্থানের ফলে তাঁর প্রখর কিরণ-তাপ রোষবহ্নির মত প্রজ্বলিত হতে থাকল পূর্ব ও উত্তর দিকে। আবার পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক, চন্দ্র অস্তমিত এবং নিশাবসান হওয়ার পরেও সূর্যের অনুদয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে শুরু করল—এল কী প্রলয়কাল! একদিকে নৈশ-তিমির, অপর দিকে আতপ-তাপে দগ্ধ জীবকুল আর স্থির থাকতে না পেরে ভয়বিহ্বল-চিত্তে ইতস্ততঃ ধাবমান হল্। যাগ-যজ্ঞ, দেবার্চনা প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম পরিত্যাগ করে প্রজাবৃন্দ উন্মত্ত হয়ে উঠল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

ভীত হয়ে উঠলেন দেবগণও। নিরুপায় হয়ে সকলে মিলে

ছুটলেন তাঁরা সত্যলোকে জগৎপিতা ব্রহ্মার কাছে। বিপর্যস্ত পৃথিবীকে রক্ষার আবেদন নিয়ে শরণাগত দেবগণ ব্রহ্মার হৃদয়গ্রাহী স্তব করলেন: "কালাৎ পরায় কালায় স্বেচ্ছয়া পুরুষায় চ। গুণত্রয় স্বরূপায় নমঃ প্রকৃতিরূপিণে॥ বৈষ্ণবে সত্ত্বরূপায় রজোরূপায় বেধসে। তমসে রুদ্ররূপায় স্থিতিস্বর্গান্তকারিণে।" —তুমি কালাতীত হয়েও কালস্বরূপ, তুমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছ পুরুষরূপ। আবার তুমিই সেই ত্রিগুণা প্রকৃতি। সত্ত্বগুণে তুমি বিষ্ণু—কর জগতের পালন, রজোগুণে তুমি ব্রহ্মা—কর সৃষ্টি, আবার তমোগুণে তুমিই রুদ্র—কর সংহার। তোমারই নিঃশ্বাস-প্রসূত চতুর্বেদ, তোমারই স্বেদ হতে উৎপন্ন সমস্ত জগৎ, তোমার পদতল-সমুদ্ভূত সমস্ত প্রাণী, স্বর্গ তোমার মস্তক-প্রসূত, তোমার নাভি হতে আকাশ, লোমরাজি হতে বনস্পতি, মন হতে চন্দ্রমা, চক্ষু হতে সূর্য। তুমিই সব, তোমাতেই সমস্ত। "ত্বমেব সর্বং ত্বয়ি দেব সর্বং স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেব। ঈশ ত্বয়াবাস্যমিদং হি সর্ব্বং নমোঽস্তু ভূয়োঽপিনমো নমস্তে॥"—তুমিই স্তুতি, তুমিই স্তোতা, তুমিই স্তব্য। এই বিশ্বচরাচর তোমাতেই ব্যাপ্ত। হে ঈশ, তোমাকে নমস্কার, বারংবার নমস্কার।

সর্বজ্ঞ ব্রহ্মা স্তবে তুষ্ট হয়ে প্রণত দেবগণকে অভিলষিত বরদানে উদ্যত হয়ে বললেন—এখানে ব্যাকুলতার কোন অবকাশ নেই। মূর্তিমান চারি বেদ, সমস্ত বিদ্যা, যজ্ঞ, সত্য, ধর্ম, তপ, দম, ব্রহ্মচর্য, করুণা, শ্রুতি, স্মৃতি—সমস্ত লোকগণ বিরাজ করছেন। ষড়রিপুজয়ী ব্রহ্মনিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ, সদ্‌ব্রতাচারী, ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ এখানে স-সম্মানে অধিষ্ঠিত। দান গ্রহণ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, যারা প্রতিগ্রহ-বিমুখ, গায়ত্রী জপ-নিরত, অগ্নিহোত্র-পরায়ণ ব্রাহ্মণ; মাঘ মাসের মকর-সংক্রান্তিতে যাঁরা হয়েছেন প্রয়াগ তীর্থস্নাত, কার্তিক মাসে বারাণসীর পঞ্চনদে তিনদিন স্নান করে যাঁরা হয়েছেন নির্মল, তাঁরা আমার সকাশে বিরাজ করছেন সূর্যতেজ নিয়ে। মণিকর্ণিকায় স্নান সেরে যাঁরা ব্রাহ্মণদের ধনাদি দানে তৃপ্ত করেছেন,

তাঁরা আমার সকাশে এক কল্প (ব্রহ্মার একদিনরাত অর্থাৎ ৮৬৪ কোটি বৎসর) অবস্থানের পর, পুনরায় কাশীধামে প্রত্যাগমন করে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে মুক্তি লাভ করবেন। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যদি অল্প সৎকর্মও কেউ করে, তবে মুক্তিলাভ তার সুনিশ্চিত। দেবগণ, স্নান, দান, জপ কিংবা পূজায় স্বনিষ্ঠ হলেও, যদি কেউ ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করতে না পারেন, তিনি কখনই আমার এ লোকে আসতে পারবেন না। বিষ্ণুর, আমার এবং মহাদেবের অতি প্রিয়জন হল ব্রাহ্মণ। আমরাই ধরাধামে ব্রাহ্মণ মূর্তিতে পরিভ্রমণ করে থাকি। যেমন ব্রাহ্মণ, তেমনই হল গো-জাতি। গোদেহে আমি, বিষ্ণু, মহাদেব ও মহর্ষিগণের সঙ্গে চতুর্দশ ভুবন অবস্থান করি। গো-সেবা, গো-দান এব তুল্য পুণ্যকর্ম নেই। ব্রাহ্মণগণকে গোদানের তুল্য দান আর নেই। সবদেহে গো-লাঙ্গুলের স্পর্শ, অলক্ষ্মী, কলহ, অশান্তি দূর করে থাকে। এই পৃথিবী ধারণ করে আছে সাতটি শক্তি: গো, বিপ্র, বেদ, সতী, সত্যবাদী, অলোভী আর দানশীল। আমার এই লোকের ঊর্ধ্বে বৈকুণ্ঠ লোক, তার ওপরে উমালোক, তার ওপরে শিবলোক, তার ওপরে গোলোক; মহাদেবের প্রিয় সুশীলা প্রভৃতি গোমাতৃগণের এখানেই আবাস। যাঁরা গো-সেবা অথবা গো-দান করেন তাঁরা এর কোন-না-কোন একটি লোকে সুখে অবস্থান করেন।

তবে দান যথার্থ ব্রাহ্মণকেই করা বিধেয়, তবেই ফললাভ হয়ে থাকে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির তত্ত্ব যাঁরা সম্যক অবগত হয়েছেন, অনুশীলন করছেন অথবা শ্রুতি, স্মৃতিকে যাঁরা দুটি চক্ষু এবং পুরাণকে হৃদয়তুল্য জ্ঞান করে থাকেন, তারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ, অপর সকলে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ নামধারী। সুতরাং গো-দান সেই যথার্থ ব্রাহ্মণে হলেই সুখ-শান্তি লাভ হয়ে থাকে।

যাই হোক, আমি জানি, তোমাদের আমার কাছে আসার কারণ কি? সুমেরুর প্রতি বিদ্বেষবশে বিন্ধ্যপর্বত স্ফীতকায় এবং উন্নত শির নিয়ে গগন পথে সূর্যের গতিরোধ করেছে। শোন, মিত্রাবরুণ-

তনয় মহাতপস্বী অগস্ত্য অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীধামে কঠোর তপস্যায় রত রয়েছেন। তোমরা তাঁর কাছে যাও। তিনি তোমাদের অভীষ্ট পূরণে অবশ্যই সাহায্য করবেন। সূর্য অপেক্ষাও অধিক তেজশালী অগস্ত্য একসময় বাতাপি এবং ইল্বল নামে দুই রাক্ষসকে ভক্ষণ করে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন। সেই থেকে সকলেই তাঁকে বেশ সমীহ করে। এই বলে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন।

ব্রহ্মার পরামর্শে তৎক্ষণাৎ কাশীগমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়ে নিলেন দেবগণ। অন্তঃকরণ তাঁদের পুলকিত হয়ে উঠল অগস্ত্যকে উপলক্ষ্য করে কাশীধাম এবং কাশীপতির দর্শন লাভের সুযোগ সমাগত দেখে। মনে-মনে ভাবলেন সুকৃতি না থাকলে সেই মোক্ষধাম দর্শনের কী সুযোগ মেলে ?

[অধ্যায় ৩]

দেবগণ অতঃপর কী করলেন, অগস্ত্য সমীপে তাঁরা কী প্রার্থনা রাখলেন, বিন্ধ্যপর্বতের উন্নত শির কিভাবেই বা আনত হল, মহামতি সুত তা জানতে ইচ্ছুক হলে ব্যাসদেব বললেন ঃ

দেবগণ ব্রহ্মার পরামর্শে আর কালবিলম্ব না করে সঙ্গী মহর্ষিদের নিয়ে এলেন বারাণসী ধামে। সবস্ত্রে যথাবিধি মণিকর্ণিকায় স্নান সেরে সন্ধ্যা-বন্দনা, পিতৃ-তর্পণাদি শেষে ব্রাহ্মণদের উৎকৃষ্ট দান, বিদ্যার্থীদের অন্ন, অতিথি সেবার জন্য ধনাদি, লেখকদের বৃত্তি, দেবালয়ের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান এবং জপ, হোম, স্তোত্রপাঠ, শিব-কীর্তন করতে করতে চতুর্দিক পরিভ্রমণ, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম, বিশ্বনাথ দর্শন, ইত্যাদি নিয়ে পাঁচটি রাত অতিবাহিত করে, এলেন মহামুনি অগস্ত্যের আশ্রমে। দেখলেন দেবগণ, স্বীয় নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে শতরুদ্রী জপে সমাহিত মুনিবর— দ্বিতীয় সূর্য যেন, অথচ সেই তেজ কী অপরূপ স্নিগ্ধ এবং শান্তিময়।

সূর্যও ম্লান যেন তেজের কাছে, সুশীতল চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণও যেন তার স্নিগ্ধতায় বিস্মিত। সেই সঙ্গে দেবগণ দেখলেন, শ্বাপদ-সঙ্কুল আশ্রম, অথচ কী অপরূপ হিংসা-দ্বেষহীন। দেখলেন, সিংহ-শাবকদের সরিয়ে দিয়ে সিংহীর স্তন পান করছে মৃগশিশু, নিদ্রিত ভল্লুকের লোমসমূহের ভিতর থেকে কীট বেছে ভক্ষণ করছে বানর। ময়ূরের কণ্ঠে স্বীয় কণ্ঠ ঘর্ষণ করছে সর্প, আসন্নপ্রসবা মৃগীর দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে রয়েছে ব্যাঘ্র আর ব্যাঘ্রীর সঙ্গে সখীত্বের বন্ধনে আবদ্ধা মৃগী চলেছে নিরালা স্থানে। স্বভাব-বৈরিতা ভুলে মনের আনন্দে খেলা করছে নকুল সর্পের সঙ্গে। মাংসাশী শ্বাপদ, অথচ মাংসভক্ষণে অনীহা নিয়ে প্রাণধারণ করে চলেছে তৃণগুল্মাদি ভক্ষণ করে। এমনকি অগস্ত্যের তপঃপ্রভাবে বকও মৎস্য ভক্ষণে পরাঙ্মুখ, মধুপেরা মধুপানে বিরত। শিবক্ষেত্র বারাণসীর কী অপরূপ মহিমা! দেবাদিদেব শঙ্করের অধিষ্ঠানক্ষেত্র কাশীধাম বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে তারকব্রহ্ম নাম নিয়ে তারই মাহাত্ম্যে জেনেছে যেন সেই সারতত্ত্ব—হিংসা পাপ, প্রাণ-নাশ এবং প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণধারণ এক কল্প পরিমিত নরকভোগের সমান, মদ্য-মাংস হতে শঙ্করের অবস্থান বহুদূরে—মহাদেবের প্রসাদ, মহাদেবের কৃপাই মুক্তিলাভের অনন্য পথ। এখানকার প্রাণীমাত্রেই যেন জেনেছে সেই সারমর্ম—অবিমুক্ত এই ক্ষেত্রে শিবপরায়ণ হয়ে বসবাস করলে মনুষ্য জন্ম ত' বটেই এমনকি তির্যক জাতিরও মুক্তি সুনিশ্চিত।

বিস্মিত দেবগণ এইসব দেখতে-দেখতে প্রবেশ করলেন মুনিবরের আশ্রমে। পক্ষীকুলকে দর্শন করে পুনরায় পুলকিত হয়ে উঠলেন তাঁরা। দেখলেন সারসীর কণ্ঠোপরি কণ্ঠলগ্ন সারস নিশ্চল—যেন শিবধ্যানে রত। রমণেচ্ছু হংসকে হংসী, চক্রবাককে চক্রবাকী যেন নীরবে অনুনয় করছে এই পবিত্র-আশ্রমে কামভাব পরিত্যাগ করতে, শালিক পক্ষীর স্ত্রী মৃদু-মধুর ভাষে শালিককে শোনাচ্ছে "মহাদেব অপার এই সংসারের পারদাতা।" কেকারবহীন নিস্তব্ধ ময়ূর। ধ্যানমগ্ন অগস্ত্যের যেন ধ্যানভঙ্গ না হয়ে যায়। বিহগকুল যেন

সে বিষয়ে সদাজাগ্রত।

স্বর্গবাসী, স্বর্গসুখে সুখী দেবগণ কাশীধামকে দেখে স্বর্গকেও ধিক্কার দিয়ে উঠলেন। বললেন, আমরা স্বর্গবাসী হয়েও কাশীবাসী পতিত ব্যক্তির তুল্যও নই। স্বর্গ থেকে পতনের ভয় আছে কিন্তু মহাদেবের শরণাগত কাশীবাসীর পতনের কোন আশঙ্কা নেই। কাশীতে শশক, মশকেরাও অনায়াসে যে পদ লাভ করে থাকে, অন্যত্র যোগবলে যোগীরাও পায়না তা। অন্যত্র নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ থেকে কাশীতে যদি মাসাবধি উপবাস করে থাকতে হয়, দারিদ্র্যের সঙ্গে কাল কাটাতে হয়, তবুও তা অনেক পরিমাণে সুখপ্রদ। আমরা দেবতা, অমিত-শক্তি নিয়ে স্বর্গরাজ্যের এক-একজন অধীশ্বর, অথচ এক বিন্ধ্যগিরির ভয়ে আজ আমরা ভীত। ব্রহ্মার দিবসের অষ্টম ভাগে লোকপাল, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-তারা সবাই বিলুপ্ত হয়ে যায়, বিলুপ্ত হয় ইন্দ্রত্বের পদও কিন্তু পরার্ধদ্বয় (এক পরার্ধ=১০ কোটি-কোটি বছর) পরিমিতকাল কাশীতে অবস্থান করলেও তার বিনাশ নেই। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সুখের আধার এই কাশীধাম। উত্তর-বাহিনী গঙ্গায় স্নান করে এখানে যে জন যায় বিশ্বেশ্বর দর্শনে, সে লাভ করে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল। জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যই এনে দেয় কাশীবাসের সুযোগ। বিশ্বেশ্বরের শরণাগত জন যারা আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে গঙ্গার দর্শন, স্পর্শন, স্নান, আচমন, সন্ধ্যা, উপাসনা, জপ, তর্পণ, আর নীলকণ্ঠ দেবদেব মহাদেবের ভজনা করে, শুক্লপক্ষে বর্ধিত-কলা চন্দ্রের মতই অন্তরে তার ধর্ম কাণ্ডে-পুষ্পে-ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। বিপ্রগণের পাদোদক দ্বারা সিক্ত শ্রদ্ধা হল সেই ধর্মবৃক্ষের বীজ, চতুর্দশ বিদ্যা তার শাখা, অর্থশাস্ত্র তার পুষ্প। কাম আর মোক্ষ—এ দুটি হল তার স্থূল এবং সূক্ষ্ম ফল। স্বয়ং ভবানী অন্নপূর্ণা এখানে করেন অর্থপ্রদান, ঢুণ্ডিরাজ গণপতি পূরণ করেন জীবের যাবতীয় কামনা আর অন্তকালে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মুমূর্ষুর কর্ণে তারকব্রহ্ম উপদেশ দিয়ে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গ নিয়ে ধর্ম কাশীক্ষেত্র ছাড়া আর

কোথাও বিরাজ করেন না। ত্রিলোকীও স্বরূপরূপ বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র কাশীক্ষেত্রের তুল্য নয়।

নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করতে-করতে মহর্ষিগণসহ দেবগণ হোমধূমের সুগন্ধে পরিপূর্ণ, পতিব্রতা-সাধ্বী লোপামুদ্রার চরণচিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত ধ্যানমগ্ন অগস্ত্য মুনির কুটীর-প্রাঙ্গণে দাঁড়ালেন প্রণাম করে। সদ্য সমাধি হতে উত্থিত, কর্ণে অক্ষমালা বিভূষিত, কুশাসনে উপবিষ্ট পরমেষ্ঠির ন্যায় শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য মুনির উদ্দেশ্যে ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ জয়ধ্বনি দিলে, মুনিবর দাঁড়িয়ে তাঁদের আপ্যায়ণ জানালেন, আশীর্বাদ করলেন এবং জানতে চাইলেন তাঁদের আগমনের কারণ।

[অধ্যায় ৪]

জিজ্ঞাসু মুনিবর অগস্ত্যের সামনে দেবগণের মুখপাত্র হয়ে এগিয়ে এলেন দেবগুরু বৃহস্পতি। তিনি অগস্ত্যের তপস্যা এবং পরোপকারী মানসিকতার বহুতর প্রশংসা করলেন। তারপর পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন যেন, অগস্ত্য-সহধর্মিণী লোপামুদ্রার পাতিব্রত্যের প্রশংসার।

প্রত্যেক অরণ্যে, প্রত্যেক পর্বতে, প্রত্যেক আশ্রমেই আছেন অনেক-অনেক তপোধন; কিন্তু অগস্ত্যের মত এমন ঔদার্য-গুণ-সমন্বিত, পুণ্যশ্রী-মণ্ডিত, ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন তাপস বিরল। কেনই বা তা হবে না—পতিব্রতা লোপামুদ্রার মত সহধর্মিণী যাঁর সতত অনুগামিণী!

সতীত্ব এবং পাতিব্রত্যে চিরস্মরণীয়া হলেন অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনসূয়া, শাণ্ডিল্য, সতী, লক্ষ্মী, শতরূপা, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা, স্বাহা। তবুও পাতিব্রত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে এঁরাও নির্দ্বিধায় লোপামুদ্রার প্রশংসায় অসূয়াহীন হয়ে ওঠেন।

স্বামী আহার্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত যে স্ত্রী আহার্য গ্রহণ করেন না; স্বামী নিদ্রা গেলে, যে স্ত্রী শয্যাগ্রহণ করেন আবার স্বামীর শয্যাত্যাগের পূর্বেই যিনি শয্যাত্যাগ করেন; অনলঙ্কৃতা হয়ে যিনি স্বামী সন্দর্শন করেন না, অথচ অলঙ্কৃতা এবং বেশভূষায় সজ্জিতা হয়ে যিনি গৃহান্তর গমন করেন না আবার স্বামীর আয়ু-বৃদ্ধির কামনায় যে স্ত্রী কখনও স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করেন না,—সেই স্ত্রীই প্রকৃত পতিব্রতা। কোন কারণে স্বামী রাগান্বিত হয়ে তিরস্কার করলেও, যিনি প্রসন্ন-বদনে তা গ্রহণ করে থাকেন; স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিতে যিনি কালবিলম্ব করেন না; স্বামীর বিনা অনুমতিতে যিনি কাউকে কিছু দেন না; অথচ পূজাদির নিমিত্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করে দিতে যিনি স্বামীর অপেক্ষা করেন না; দ্বারদেশে বহুকাল অবস্থান বা শয়ন করেন না; পতির উচ্ছিষ্ট যিনি মহাপ্রসাদরূপে গ্রহণ করেন আবার দেবতা, পিতা, অতিথি, পরিচারকবর্গ, গোরু এবং ভিক্ষুকগণকে যিনি সর্বদাই অন্ন-ভাগ দিয়ে থাকেন—তিনিই যথার্থ সাধ্বী।

ঋতুকালে যিনি থাকেন স্বামীর অন্তরালে এবং তিনদিন পর ঋতুস্নানান্তে যিনি সর্বাগ্রে স্বামী সন্দর্শন করেন, স্বামীর অবর্তমানে স্বামী ধ্যানরতা হয়ে যিনি সূর্য দর্শন করেন; প্রগলভা নারীসঙ্গ-বিবর্জিতা হয়ে যিনি স্বামীর তৃপ্তি-সাধনে ব্রতচারিণী; যিনি স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীর দুঃখে দুখী; পতির সেবাই যার একমাত্র ব্রত, ধর্ম এবং দেবারাধনা—তিনিই যথার্থ পতিব্রতা-পত্নী।

লোপামুদ্রা এই সবকটি গুণে গুণান্বিতা। শুধু তাই নয়, লোপামুদ্রার হৃদয়ে স্বামী অগস্ত্যের স্থান সব দেবতারও ঊর্ধ্বে। পতির পাদোদক পানই একমাত্র পূরণ করে থাকে পত্নীর তীর্থ স্নানের অভিলাষ। কেননা, "ভর্ত্তা দেবো গুরুর্ভর্ত্তা ধর্ম্মতীর্থ ব্রতানি চ। তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পতিমেকং সমর্চ্চয়েৎ ॥" (৪।৪৮)—পতিব্রতা পত্নীর কাছে পতিই হল একমাত্র দেবতা, গুরু, ভর্তা, তীর্থ, ব্রত—অপরিমেয় সুখদাতা, যা পিতা, ভ্রাতা পুত্রও দিতে অপারগ। মহাদেব

এবং বিষ্ণু অবশ্যই পূজ্য কিন্তু স্ত্রীর কাছে অধিকতর পূজ্য হলেন স্বামী। অনন্যচিত্তে যে স্ত্রী স্বামী সেবায় রতা তিনিই সাধ্বী। তাঁর তেজের কাছে তপনের তেজও হীনপ্রভ; তাঁর শক্তির কাছে অগ্নির দাহিকা শক্তিও ম্লান। যমদূতের কিঙ্করেরাও ভীত হন সেই সাধ্বী পতিব্রতার কাছে আসতে। বিবাহকালে ব্রাহ্মণেরা কন্যাকে এই বলে আশীর্বাদ করে থাকেন যে—ছায়া যেমন দেহের, জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের, বিদ্যুৎ যেমন মেঘের অনুগামিনী, তুমিও তেমনিভাবে হবে পতির অনুগামিনী। ফলে যে সুকৃতি পত্নী অর্জন করবেন তার দ্বারা দৈববশে অধোগতি প্রাপ্ত-স্বামীকেও তিনি উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবেন স্বর্গলোকে। মনুষ্য দেহে যতগুলি লোম আছে; তাবৎ কোটি পরিমিত কাল পতিব্রতার সঙ্গে তাঁর স্বামী স্বর্গভোগ করে থাকেন।

পতিব্রতার পুণ্যবলে পিতৃবংশ, মাতৃবংশ এবং পতিবংশের তিন পুরুষ স্বর্গসুখ ভোগ করে আর স্ত্রীলোক ব্যাভিচারিণী হলে নিজের ইহকাল এবং পরকাল বিনষ্ট ত' করেন-ই সেই সঙ্গে পিতৃ, মাতৃ এবং পতিবংশেরও তিনটি করে পুরুষের অধঃপতন ঘটায়। যে স্ত্রী স্বামীর উক্তির ক্রোধতৎপর প্রত্যুত্তর করে সে মৃত্যুর পর গ্রামের কুক্কুরী অথবা বনের শৃগালী হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। যে স্ত্রী স্বামী পরিত্যাগ করে পরপুরুষগামিনী হয়, সে জন্মান্তরে বৃক্ষকোটর বাসী পেচকী হয়ে থাকে। যে স্ত্রী স্বামীর তাড়নার প্রতিশোধ নিতে প্রবৃত্তা হয়, সে জন্মান্তরে ব্যাঘ্রী বা মার্জারী হয়ে থাকে। যে পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করে, সে হয় কেকরাক্ষী (টেরা)। স্বামীকে বঞ্চনা করে যে স্ত্রী হয় মিষ্টান্নভোজী, জন্মান্তরে সে হয়ে থাকে গ্রামের বিষ্ঠাভোজী শূকরী কিংবা বাদুড়। যে স্বামীকে তাচ্ছিল্য-সহকারে কটু সম্ভাষণ করে, সেহয় বোবা। আর সপত্নী-বিদ্বেষী স্ত্রী হয়ে থাকে জন্ম-জন্ম হতভাগিনী। তাই পতি যেমনই হোন না কেন ক্লীব বা দুরবস্থ, ব্যাধিযুক্ত বা বৃদ্ধ, সুস্থিত বা দুস্থিত পতিব্রতা সর্বদাই হবেন তার অনুগামিনী।

একমাত্র বিধবা জননী ছাড়া, আর সব বিধবাই অমঙ্গলদায়িনী—তা তিনি যতই শুচিস্নাতা হন না কেন। কিন্তু ধর্মশীলা পতিব্রতা বিধবা পতিব্রতা স্ত্রীর মতই সর্বার্থ-সাধিকা। সহমৃতা হবার সুযোগ যদি না আসে এবং যথার্থ বৈধব্য-ব্রত অবলম্বন করে সেই নারী যদি নিজেকে নিষ্কলঙ্কা রাখেন, তবে তিনিও কল্যাণদায়িনী। মৃত স্বামীর হিতার্থে বিধবা কেশবন্ধন না করে, হবেন মুণ্ডিত-মস্তক একাহারী—যবান্ন, ফল বা শাক কিংবা আজীবন জলমাত্র পান, ভূমিশয্যা গ্রহণ, সুগন্ধি-দ্রব্য বর্জন করবেন। ব্রতাদি পালন করে, যে যে দ্রব্য ছিল পতির অতি প্রিয়, সেই সেই দ্রব্য সদ্ ব্রাহ্মণকে দান করবেন। বৈশাখে জলকুম্ভ দান, কার্তিক মাসে দেবস্থানে ঘৃত-প্রদীপ দান এবং মাঘ মাসে ধান এবং তিল উৎসর্গ করলে দেহান্তে স্বর্গলাভ করে থাকেন। বিষ্ণু, হরিকে সর্বদাই পতিবোধে ধ্যান এবং পূজা করবেন বিধবারা। সর্বদা পতিচিন্তায় নিরতা থেকে পুত্রের অগোচরে যে বিধবা কোন কাজ করবেন না, তিনি শুধু মঙ্গলদায়িনী হবেন না, মৃত্যুর পর পতিলোকে গমন করবেন। গঙ্গাস্নানে যে পবিত্রতা অর্জন করা যায়, পতিব্রতা নারী দর্শনে সেই ফলই লাভ হয়ে থাকে।

দেবগুরু বৃহস্পতি পতিব্রতা রাজপুত্রী লোপামুদ্রাকে উদ্দেশ্য করে তাই বললেন—আজ তাঁর দর্শনে তাঁদের গঙ্গাস্নানের ফললাভ হল। তারপর লোপামুদ্রাকে প্রণাম করে অগস্ত্য মুনিকে বললেন—তুমি প্রণবস্বরূপ আর এই লোপামুদ্রা শ্রুতিরূপিণী, ইনি সাক্ষাৎ ক্ষমা আর তুমি তপঃস্বরূপ, ইনি সৎক্রিয়া আর তুমি তার ফল, অতএব হে মহামুনে ধন্য তুমি। ইনি সাক্ষাৎ পাতিব্রত্য তেজ; তুমি স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রহ্মতেজ, তার ওপর তুমি আপন তপস্যার তেজে প্রদীপ্ত। তোমার অসাধ্য যেমন কিছু নেই, তেমনি তোমার অবিদিতিও কিছু নেই।

তবুও দেবগণ আজ তোমার দ্বারে কি কারণে সমাগত তা শোন। ইনি হলেন শতযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, অষ্টসিদ্ধিতে সিদ্ধ, বজ্রপাণি, বৃত্রহন্তা দেবরাজ ইন্দ্র, যাঁর পুরে সর্বদা বিচরণ করে কামধেনু, পুরবাসিগণ

বিশ্রাম করে কল্পবৃক্ষের ছায়ায়। ইনি, জগদ্‌যোনি অগ্নি,ইনি স্বয়ং ধর্মরাজ; এই নৈঋ তি, এই বরুণ, এই বায়ু, এই কুবের, এঁরা রুদ্রাদি দেবগণ —লোকে কামনা-পূরণের অভিলাষে এঁদেরই স্তব-আরাধনা করে থাকে। আজ এঁরাই এসেছেন তোমার কাছে ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে বিশ্বের হিতার্থে। বিন্ধ্য নামে এক পর্বত সুমেরুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বেড়ে চলেছে গগনমার্গে সূর্যের পরিক্রমণ পথ রোধ করে। তুমি তার এই বৃদ্ধি নিবারণ কর।

মুনিবর বৃহস্পতির কথা শুনে কিছুক্ষণের জন্য সমাধিস্থ হলেন তারপর দেবগণকে নিশ্চিন্ত করে বিদায় দিয়ে আবার ধ্যানমগ্ন হলেন।

[অধ্যায় ৫]

ধ্যানযোগে অগস্ত্য কাশীপতি ভগবান বিশ্বনাথকে দর্শন করে ডাকলেন লোপামুদ্রাকে। আক্ষেপ-সহকারে বললেন তাঁকে, কাশীধামে তাঁদের কেন এল এই বিপর্যয়! তত্ত্বদর্শী মুনিদের কথাই বুঝি সত্য হল। তাঁরা বলেছেন, কাশীবাসে মহাত্মাগণের প্রায়ই বিঘ্ন ঘটে থাকে। সেই বিঘ্নই বুঝি এখন দেবতাদের মাধ্যমে এসে উপস্থিত হল। কারণ স্বয়ং বিশ্বনাথই নিশ্চয় বিমুখ হয়েছেন আমার কাশীবাসে।

পর্বত সকলের পরাক্রমশালী শক্র ইন্দ্র যিনি একসময় তাদের ঔদ্ধত্য দমন করতে অবহেলায় পক্ষ ছেদন করে দিয়েছিলেন, বজ্র যাঁর অস্ত্র, যাঁর প্রাঙ্গণে কল্পদ্রুম বিদ্যমান, অষ্টপ্রকার সিদ্ধি যাঁর দ্বারা, সেই দেবরাজ ইন্দ্র আজ কেন অসহায় হয়ে আমার মত ব্রাহ্মণের সাহায্যপ্রার্থী হলেন? যে দাবানলের ভয়ে পর্বতসমূহও ভীত হয়ে থাকে, সেই দাবানল অধিপতি অগ্নিই বা কেন অসহায়? স্বয়ং ধর্ম দণ্ডধর যমরাজ যিনি সর্বভূতের নিয়ন্তা তিনিই বা বিন্ধ্যের ভয়ে কেন

বিহ্বল ? দ্বাদশ-আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, তেষট্টি তুষিত, ঊনপঞ্চাশ বায়ু, ত্রয়োদশ বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ছাড়াও অন্যান্য দেবগণ বিক্ষুব্ধ হলে যেখানে ত্রিভুবন বিলয় হয়ে যায়, সেখানে সামান্য এক বিন্ধ্যপর্বতের দম্ভ চূর্ণ করার জন্য কেন আমার মত একজন ব্রাহ্মণের শরণাগত এবং সাহাপ্রার্থী হলেন সকলে ?

দুর্ভাগ্য আমাদের। অনন্ত পুণ্যের আকর এই কাশীক্ষেত্র মুমুক্ষু জনের কাছে চিরকাঙ্ক্ষিত। যেখানে সদাচার পালন এবং পুণ্যকর্ম করলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে আর ভবযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়না, পরমাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ যেখানে নিয়তই ঘটে থাকে, সর্বপাপ-বিরহিতা, দেবদুর্লভ, গঙ্গাবারিবিধৌত, মুক্তাফলের শুক্তিরূপ স্বয়ং মোক্ষ শিব যেখানে অধিষ্ঠিত, ভব-বন্ধন-বিনাশক সেই কাশীধাম কেউ কি পরিত্যাগ করতে পারে, একমাত্র কদাচারী হতভাগ্য ছাড়া ? যে কাশীকে যাগ-যজ্ঞ-তপস্যায় পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় একমাত্র বিশ্বেশ্বরের অনুপম কৃপায়, আজ আমরা বুঝিবা সেই কৃপাবঞ্চিত হলাম।

অবিমুক্ত বারাণসীর মত পবিত্র জগত যে আর কোথাও নেই কেবলমাত্র পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র নয়, বেদেও প্রতিপাদিত। মহর্ষি জাবালি তাঁর অন্যতম শিষ্য আরুণিকে বলেছিলেন, অসি নদীকে ঋষিগণ বলেছেন ইড়া নাড়ী, বরুণা নদীকে পিঙ্গলা নাড়ী। এই দুই নাড়ীর মধ্যভাগে যে অবিমুক্ত পুরী রয়েছে সেটি হল সুষুম্না নাড়ী। এই তিন নাড়ী-ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্নাকেই বলা হয়ে থাকে বারাণসী। আর এখানে দেহান্তকালে জীবগণের দক্ষিণ কর্ণে মহেশ্বর স্বয়ং তারকব্রহ্ম উপদেশ দিয়ে মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ত করে দিয়ে থাকেন।

এইরকম যে কাশী-সদৃশ পুরী এবং স্বয়ং মোক্ষদাতা বিশ্বনাথ-সদৃশ শিবলিঙ্গ পরিত্যাগ করে যেতে হচ্ছে দেখে হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল মুনিবর অগস্ত্যের। তিনি প্রথমে গেলেন ভগবান কালভৈরবের কাছে। সানুনয় অনুরোধ রাখলেন তাঁর কাছে—

আমি ত' আপনার কাছে কোন অপরাধ করিনি। আপনার যথাবিহিত অর্চনার কোন ত্রুটি ত' আমার দ্বারা হয়নি। তবে কেন আমাদের কাশী ত্যাগ করতে হচ্ছে? অতঃপর গেলেন যক্ষরাজের কাছে, রাখলেন একই সানুনয় আবেদন—হে দণ্ডপাণে। তপস্যার কোন ক্লেশেই ত' আমি কখনও কাতরতা প্রকাশ করি নি, তবে কেন আমাকে কাশী ত্যাগে বাধ্য করছেন। হে প্রভো, ঢুণ্ডিবিনায়ক, সবাই আমার আবেদনে বধির। শুনেছি, আপনি সর্ববিঘ্নহর। দুশ্চরিত্র-জনের মত কেন কাশীবাসে আমার এই বিঘ্ন উপস্থিত হল? চিন্তামণি, কপর্দি, আশাগজনামক বিনায়কদ্বয়, সিদ্ধিবিনায়ক,—আপনারা শুনুন, আমি কখনো পরনিন্দা, পরচর্চা, পরস্বাপহরণ করিনি, ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করেছি, বিশ্বনাথ দর্শন করেছি, তবে আমার অদৃষ্টে কেন এই বিপাক? হে মাতঃ বিশালাক্ষি! ভবানি, জ্যেষ্ঠেশি, সর্বসৌভাগ্যদায়িনী, সুন্দরী, বিধে, বিশ্বভুজে, চিত্রঘণ্টে, বিকটে, দুর্গিকে, আপনাদের নমস্কার। আপনারা, কাশীর যাবতীয় দেব-দেবী, আপনারা সকলেই সাক্ষ্য থাকুন, জ্ঞানত এমন কোন স্খলনে আমি স্খলিত নই, যার ফলে কাশীত্যাগরূপ বিপাকের আমি শিকার হতে পারি। শুধু দেবগণের অনুরোধে পরোপকারের নিমিত্ত বিশ্বের কল্যাণে আমাকে কাশী ত্যাগ করতে হচ্ছে।

অতঃপর মুনিবর অগস্ত্য পাপাচার-বিরহিত কাশীর তৃণ, গুল্ম, লতা, বালক, বৃদ্ধ, কাশীবাসী মুনিগণ, প্রাসাদশ্রেণীকে শেষবারের মত বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে, বারংবার অসি নদীর জল স্পর্শ করে সর্ববিঘ্নবিনাশক কাশীপতি বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করে গমনোদ্যত হতেই শোকবিহ্বল-চিত্তে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ক্ষণকাল পরে মূর্ছাভঙ্গ হলে, দেবগণের অনুরোধ রক্ষার জন্য পুনরায় কাশী দর্শনের প্রার্থনা জানিয়ে লোপামুদ্রা-সহ তপোযানে আরোহণ করে উপস্থিত হলেন গগন-পথ-রোধকারী বিন্ধ্যের কাছে।

একদিকে ইল্বল এবং বাতাপি নামক দুই দুর্ধর্ষ অসুরের বিনাশ-কারক, অপরদিকে তপস্যা, ক্রোধ আর কাশীবিয়োগ-জনিত খেদে

জাজ্বল্যমান প্রলয়কালীন অনল-সদৃশ মুনিবরকে দেখে ভীত-ত্রস্ত বিন্ধ্যগিরি তৎক্ষণাৎ মস্তক অবনত করে অগস্ত্যকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে বলল—সে দাসানুদাস কিঙ্কর মাত্র, মুনিবর আদেশ করবেন, এই কিঙ্কর তা নির্দ্বিধায় পালন করবে।

অগস্ত্য বললেন, তুমি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান। তুমি তাহ'লে আমার প্রভাব জানতে পেরেছ। বেশ, তাহলে শোন আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এই ভাবে অবনত মস্তকেই থাকবে।—এই বলে মুনিবর সস্ত্রীক দক্ষিণাভিমুখে গমন করলেন। গগন-পথও অবরোধ-মুক্ত হল। বাধাহত সূর্যাশ্ব আপন গতিবেগে বিন্ধ্যকে অতিক্রম করে সূর্যকিরণ বিন্যাসে জগতের ভীতি দূর করল।

অবনত মস্তকেই ঘাড় ফিরিয়ে মুনিবরকে প্রস্থান করতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বিন্ধ্য। ধন্যবাদ দিল তার ভাগ্যকে এই ভেবে যে তাকে মুনির কোপে পড়ে অভিশাপগ্রস্ত হতে হল না। দু-তিন দিনের মধ্যেই মুনিবর ফিরে এলে আবার সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে এই উৎকণ্ঠা নিয়েই বিন্ধ্য মাথা নিচু রেখে মুনিবরের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু আজও অগস্ত্যের প্রত্যাগমন ঘটেনি, তাই বিন্ধ্যের পক্ষেও সম্ভব হয়নি অবনত মস্তক উন্নত করে তোলা। খলগণের মনোভিলাষ কখনই সিদ্ধিলাভ করতে পারেনা। নদী যেমন প্রবাহ পথে দুই কুলই ভেঙ্গে যায়, খলগণের কুলও তেমনি অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এদিকে দক্ষিণাপথে অগস্ত্য এসে উপস্থিত হলেন গোদাবরী তীরে। কাশীর বিয়োগব্যথা-জনিত অসহ্য বিরহ-বেদনা—মুনিবর প্রায় উন্মাদের মত তটপ্রান্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। উত্তরাগত বাতাসকে আলিঙ্গন করে জানতে চান কাশীর কুশলবার্তা। কখনো লোপামুদ্রাকে সম্বোধন করে কাতরকণ্ঠে বলেন—লোপামুদ্রা! কাশীর পবিত্রতা, কাশীর সৌন্দর্য, কাশীর মত ক্ষেত্র, আর কোথাও দেখি না কেন ? বারাণসী-বিরহে কাতর মুনি কখনও কাশীর চিন্তায় স্থাণুর মত নিশ্চল হয়ে থাকেন, কখনও হয়ে যান বাহ্যজ্ঞানরহিত,

কখনো পাগলের প্রায় তটপ্রান্ত ধরে দৌড়োতে থাকেন ভাবদৃষ্টিতে দৃষ্ট কাশীকে উদ্দেশ্য করে।

এইভাবে পরিভ্রমণ করতে-করতে একদিন অগস্ত্য মুনি দর্শন পেলেন মহালক্ষ্মীর। সূর্যের কিরণে তখনো উজ্জ্বল আকাশ তবু শতচন্দ্রমার স্নিগ্ধ কান্তি নিয়ে অপরূপা মহালক্ষ্মী যেন অগস্ত্যের সন্তাপ দূর করার জন্যই আবির্ভূতা হয়েছেন তাঁর সামনে। নারায়ণ যেদিন হৃদয়ে দেবী সরস্বতীকে বরণ করে নিয়েছিলেন, সেইদিন থেকেই লক্ষ্মী নিয়েছিলেন অন্তরাল-বাস। বরাহরূপে কোন অসুর যখন ত্রিলোককে ত্রস্ত করে তুলেছিল, তখন সেই কোলাসুরকে বিনাশ করে দেবী কোলাপুরেই অবস্থান করছিলেন।

মহালক্ষ্মীকে দর্শন করে অগস্ত্য লোপামুদ্রার সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে অত্যুৎকৃষ্ট এমন এক ইষ্টপ্রদ স্তব করলেন যে মহালক্ষ্মী তাতে অতীব তৃপ্তা হয়ে লোপামুদ্রাকে আলিঙ্গন দিয়ে তাকে সৌভাগ্যশালিনী করলেন এবং মুনির হৃদয়-বেদনার কারণ অবগত হয়ে তাঁকে বর দিলেন। বললেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, ভবিষ্যতে ঊনত্রিশ-সংখ্যক দ্বাপর যুগে তুমি বারাণসীতে ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করে বেদ, পুরাণ ইত্যাদির বিভাগ করে, সর্বপ্রকার ধর্মোপদেশের দ্বারা তোমার কাশীপ্রাপ্তির মনোভিলাষ পূর্ণ করবে। আর এখন তোমার অস্থির চিত্তকে সংযত করার জন্যে তুমি স্কন্দদেবের কাছে যাও। কিছুদূর গেলেই তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। বারাণসীর রহস্য যা পূর্বে মহাদেব বলেছিলেন, দেব কার্তিকেয়র কাছে সেই গুহ্য এবং রমণীয় কথা শুনে তুমি অপার তৃপ্তি লাভ করবে।

এই বর লাভ করে মহালক্ষ্মীকে প্রণাম করে অগস্ত্য শিখিবাহন দেব স্কন্দের উদ্দেশ্যে গমন করলেন।

[অধ্যায় ৬]

ব্যাসদেব অতঃপর সূতকে বলতে লাগলেন—যার হৃদয় সর্বদাই পরোপকার ব্রতে সচেতন, পরোপকার ব্রতকেই যারা একমাত্র কর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে, তারা কখনো বিপদগ্রস্ত হয় না বরং সম্পদ লাভ করে থাকে। তীর্থস্নান, দান, তপস্যায় যে ফল পাওয়া যায়, তার চেয়েও অনেক বেশি ফল পাওয়া যায় পরোপকার ব্রত উদযাপনে। বিধাতা একবার মেপে দেখতে গিয়েছিলেন দানধর্ম আর পরোপকার ধর্ম—এই দুটোর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? দেখেছিলেন, পরোপকার ধর্মের পাল্লাই বেশি ভারী। শাস্ত্রেও বলে, পরের উপকার করার মত ধর্ম নেই। আবার পরের অপকার করার মত অধর্মও আর নেই। মুনিবর অগস্ত্যই তার দৃষ্টান্ত। পরোপকার করতে গিয়ে কাশীবিরহ-জনিত সন্তাপের পরিবর্তে লাভ করলেন লক্ষ্মী দর্শন। এই জীবন এই বৈভব সবই হাতির কানের মতই চঞ্চল; যাঁরা সৎ, তাঁরা পরোপকারের মধ্য দিয়েই ইষ্ট লাভ করে থাকেন।

মুনিবর দেব কার্তিকেয়র উদ্দেশে পথগামী হয়ে দূরে দেখতে পেলেন শ্রীপর্বতকে, যেখানে ত্রিপুরারির অবস্থান। উৎফুল্ল হৃদয়ে পত্নী লোপামুদ্রাকে বললেন—ঐ সেই লিঙ্গাদি-সমন্বিত শ্রীপর্বত, যার সন্দর্শনে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। এই পর্বতের বিস্তার হল চুরাশি যোজন। দেবস্থান এই পর্বত; তাই দর্শনের আগে একে আমাদের প্রদক্ষিণ করতে হবে।

শুনে লোপামুদ্রা মুনিবরকে বললেন, যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমার এক কৌতূহল আপনার কাছে নিবেদন করি। তৎক্ষণাৎ সানন্দে সম্মতি জানালেন মুনিবর। লোপামুদ্রা জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রী শৈলের শিখর দর্শনেই যদি মোক্ষ লাভ হয়, আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে না হয়, তবে লোকে কাশীর প্রতি এত আগ্রহী কেন?

প্রশ্ন শুনে খুবই খুশি হলেন মুনিবর। বললেন, তোমার এই প্রশ্নের উপর পূর্বাপর মুনিরা বহু আলোচনা করে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তা শুনলে তোমার সংশয় আর থাকবে না। এই পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে গেলে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি অনিবার্য। প্রথমে সেই সব স্থান আর স্থান মাহাত্ম্যের কথা শোন। প্রথমেই নাম করতে হয় প্রয়াগের। এখানে মেলে চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তাই প্রয়াগ ক্ষেত্রকে বলা হয় তীর্থরাজ। তারপর নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার, অবন্তী, অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারকা, অমরাবতী, সরস্বতী, সিন্ধুসঙ্গম, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, কাঞ্চি (কান্তিপুরী), ত্র্যম্বক, সপ্তগোদাবরীতট, কালঞ্জর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, মহালয়, ওঙ্কারক্ষেত্র, গোকর্ণ, ভৃগুকচ্ছ, ভৃগুতুঙ্গ, পুষ্কর, শ্রীপর্বত প্রভৃতি পার্থিব তীর্থক্ষেত্র ছাড়াও আছে মানস এবং সত্যাদি তীর্থক্ষেত্র। সব ক্ষেত্রই মুক্তিপ্রদ। গয়া তীর্থ শুধু পিতৃপুরুষদেরই মুক্তি দেয় না, পিতৃঋণ থেকেও পুত্রদের মুক্তি দেয়।

লোপামুদ্রার কৌতূহল জাগে মানসতীর্থ সম্বন্ধে।

অগস্ত্য বললেন, অতি উত্তম তীর্থ হল এই মানসতীর্থ। এতে স্নান করলে প্রকৃত তীর্থস্নানের ফল পাওয়া যায়। মানসতীর্থ একটি নয়, অনেকগুলির সমাহার।

> সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
> সর্বভূতদয়া তীর্থং তীর্থমার্জ্জবমেব চ॥
> দানতীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
> ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
> জ্ঞানতীর্থং ধৃতিস্তীর্থং তপস্তীর্থমুদাহৃতম্।
> তীর্থানামপিমত্তীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা॥
> ন জলাপ্লুতদেহস্য স্নাতমিত্যভিধীয়তে।
> স স্নাতো যো দমস্নাতঃ শুচিঃশুদ্ধমনোমলঃ॥ (৬/৩০-৩৩)

—সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়-সংযম, সমস্ত প্রাণীতে দয়া, সরলতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য, আর তপস্যা। এরা

সকলেই এক-একটা মানসতীর্থ। এইগুলির অনুশীলন মনকে করে বিশুদ্ধ। আর বিশুদ্ধ মনই হল শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে তীর্থজলে অবগাহন করলেই তীর্থ-স্নানের ফল পাওয়া যায় না। যদি ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা বিশুদ্ধ-মন না হওয়া যায় ; লোভ, হিংসা, দ্বেষ, দম্ভ, বিষয়াসক্তি-রূপ মল, যতক্ষণ পর্যন্ত মন থেকে বিদূরিত না হয়ে মানুষ নির্মলমনা হচ্ছে, ততক্ষণ কোন তীর্থস্নানই তাকে পাপমুক্ত করতে পারবে না। আর এই সব অবিশুদ্ধ-চিত্ত মানুষদের বারবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই ভবযন্ত্রনা ভোগ করতে হবে। যেমনভাবে জল-জন্তুরা জলেই মৃত্যুর পর আবার জলেই জন্মগ্রহণ করে থাকে। প্রবল বিষয়াসক্তিই হল মনের মল ; বিতৃষ্ণাই হল নির্মল। সুরাপাত্র জলে ভালভাবে ধুলেও যেমন তা পবিত্র হয় না, দূষিত-চিত্ত-ও তেমনি তীর্থস্নানে নির্মল হয় না। শুধু তাই নয়, দান, যজ্ঞ, তপস্যা, শৌচ, সৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ প্রভৃতিতে যে পুণ্য অর্জিত হয়, অবিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি তা থেকেও বঞ্চিত হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় সংযম করে মানুষ যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, সেই স্থানই তার নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ। বিশুদ্ধ জ্ঞান, যা রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক মল বিদূরিত করে, সেই জ্ঞানজলই হল মানসতীর্থ। আর সেই তীর্থে স্নানই হল উৎকৃষ্ট গতিপ্রদ স্নান।

এই হল মানসতীর্থ। এছাড়া আছে কতগুলি পার্থিব তীর্থস্থান।

শরীরের কতগুলি অবয়ব যেমন পবিত্র বলে গণ্য, পৃথিবীতেও তেমনি কতকগুলি দেশ আছে, যা পবিত্র। পার্থিব প্রভাব, জল-গুণ আর মুনিগণের স্বীকৃত পবিত্র ক্ষেত্র বলেই পৃথিবীর সেই সব স্থান হল ভৌমতীর্থ। এই দুই তীর্থই পুণ্যদ, ঊর্ধ্বগতিপ্রদ। যতই যজ্ঞানুষ্ঠান আর দক্ষিণা দান করা যাক না কেন, তীর্থযাত্রার মত সুফল আর কিছুতেই নেই। যারা সংযতবাক্, সংযতমন, সংযতেন্দ্রিয়, তীর্থযাত্রার সুফল তারাই লাভ করে থাকে। যারা ক্রোধহীন, যাদের অন্তঃকরণ নির্মল, যারা সত্যবাদী এবং অবিচল-

চিত্ত, তীর্থফল তারাই ভোগ করে থাকে। এমন কি পাপীরাও যদি ইন্দ্রিয়-সংযত রেখে, স্থিরতা, ধীরতা নিয়ে তীর্থ পর্যটন করে তারাও তীর্থফলের ভাগী হয়ে থাকে। যার শ্রদ্ধা নেই, যার মন অপবিত্র, কোন কিছুতেই যার বিশ্বাস নেই অর্থাৎ নাস্তিক, যার চিত্ত সব সময়ই সংশয়াচ্ছন্ন, যে নিরর্থক তর্ক করে, সে কোনকালেই তীর্থফল ভোগ করতে পারে না।

তীর্থযাত্রায় অভিলাষী জনকে শীত-গরম সম্বন্ধে সমান বোধ-সম্পন্ন হয়ে, যাত্রার আগে প্রথমে উপবাস, তারপর সামর্থ্যানুসারে গণেশ, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ এবং সাধুজনের পূজা, তারপরে পারণ করে নিয়ম অবলম্বন করে সানন্দে তীর্থগমন করতে হবে। প্রত্যাবর্তনের পর আবার পিতৃগণের অর্চনা করতে হয়, তবেই তীর্থফলভোগী হওয়া যায়। তীর্থক্ষেত্রে কখনও ব্রাহ্মণের যেমন পরীক্ষা করতে নেই। তেমনি, যাওয়া মাত্রই শ্রাদ্ধ-তর্পণ অবশ্য করণীয়। সেই সঙ্গে তীর্থে উপবাস এবং মস্তক মুণ্ডনও অবশ্য করণীয়।

প্রসঙ্গক্রমে, তীর্থগমন করে স্নান করলে, সেই স্নানে ফল আছে কিন্তু তীর্থযাত্রার নিমিত্ত তীর্থগমন করে স্নান করলে সে স্নানে কোন ফল নেই। যে অন্যের জন্য তীর্থ গমন করে সে ষোলভাগ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ফলভোগী হয়, কিন্তু যে প্রসঙ্গক্রমে তীর্থগমন করে তার অর্ধেক ফল লাভ হয়। যার উদ্দেশ্যে কুশের প্রতিকৃতি করে তীর্থে স্নান করান যায় তার অষ্টমাংশ তীর্থ-ফল লাভ হয়ে থাকে।

কাশী, কাঞ্চী, মায়া, অযোধ্যা, দ্বারাবতী, মথুরা আর অবন্তী—এই সাতটি হল মোক্ষপ্রদ পুরী। শ্রীশৈল মোক্ষপ্রদ, তার চেয়েও মোক্ষপ্রদ কেদার। আবার শ্রীশৈল এবং কেদার হতেও মুক্তিপ্রদ তীর্থরাজ প্রয়াগ। কিন্তু একমাত্র নির্বিশেষ মুক্তি অর্থাৎ নির্বাণ লাভের ক্ষেত্র কাশী। কেননা, কাশীই হল একমাত্র অবিমুক্ত ক্ষেত্র।

এই বিষয়ে পুরাকালে শিবশর্মা নামক ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুর পারিষদেরা যা বলেছিলেন, তা বলছি, শোন।

[অধ্যায় ৭]

অগস্ত্য বলতে শুরু করলেন, পুরাকালে মথুরায় অতি সজ্জন এক ব্রাহ্মণের শিবশর্মা নামে এক পুত্র ছিল। বেদশাস্ত্র থেকে শুরু করে বিবিধ বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করে, ন্যায়পথে সুপ্রচুর অর্থ উপার্জন করে সংসারীও হয়েছিল। বেশ কিছুকাল সংসারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কাল কাটাবার পর, হঠাৎ একদিন তার মনে উদয় হল বার্ধক্যের জরাগ্রস্থ জীবনের অসহায়তার কথা। অফুরন্ত চিন্তারাশি—তার মাথায় ভাবনা, কীভাবে এই ভবযন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি পাবে। যথাবিহিত সংসার সে করেছে ঠিকই, কিন্তু দান, ধ্যান, পূজা-অর্চনা, মন্দির বা দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, নিত্যশ্রাদ্ধ, অতিথি-সেবা, যে সমস্ত কাজ পুণ্যসঞ্চয় করায় এবং জন্মান্তরকেও অর্থগৃধ্নু করে তোলে না, এতাবৎকাল সে-রকম কোন কাজই তো সে করেনি। পাণ্ডিত্য সে অর্জন করেছে ঠিকই, ঘর-বাড়ী, ক্ষেত-খামার এমনকি এই আত্মবৎ স্ত্রী-পুত্রও তো মৃত্যুকালে তার সঙ্গে যাবে না, যাবে কেবল···সঞ্চিত পুণ্য। সংসার-মোহাচ্ছন্ন থেকে সেই পুণ্যকর্মই এখনও তার করা হয়নি। সুতরাং আর কালক্ষেপ না করে, ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে পড়ার আগেই শরীর সুস্থ এবং সবল থাকতে-থাকতেই অন্ততঃপক্ষে তীর্থভ্রমণ করেও পুণ্য সঞ্চয় করতে হবে।

এই ভাবনায় শিবশর্মা একদিন মনস্থির করে ফেলল। ছেলেদের মধ্যে বিষয়-আশয় ভাগ করে দিল। এর পর পাঁচ-ছ' দিন বাড়িতে থেকে শুভ তিথি, শুভ বার, শুভ লগ্ন দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। পরে পথে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ভাবতে লাগলে, প্রথমে কোথায় যাওয়া যায়? পৃথিবীতে তীর্থস্থান আছে অনেক কিন্তু সীমিত আয়ু নিয়ে তো আর সবতীর্থ পর্যটন করা যাবে না,

সম্ভবও নয়। তাই ঠিক করল, যে সাতটি তীর্থক্ষেত্রে পৃথিবীর তাবৎ তীর্থক্ষেত্রের ফল পাওয়া যায়, সেই সাতটি তীর্থক্ষেত্রই সে পর্যটন করবে।

মনস্থ করে শিবশর্মা প্রথমে এল অযোধ্যাপুরীতে। সরযুতে স্নান, পিতৃগণের তর্পণ, ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি সম্পন্ন করে সেখানে পাঁচ রাত কাটিয়ে, এল তীর্থরাজ প্রয়াগধামে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলনে ত্রিবেণী-তীর্থ এই স্থান যাবতীয় যাগ-যজ্ঞ-অপেক্ষা-উৎকৃষ্টতর, তাই এর নামই হয়েছে প্রয়াগ। মহাদেব এখানে শূলটঙ্ক মূর্তিতে বিরাজিত, নিত্য পুণ্য-প্রদায়ী অক্ষয় বট, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুষ্পদে ধর্ম যেখানে অবিচল, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেখানকার ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানান্তে মোক্ষলাভে সদা-উদ্‌গ্রীব, সেই সর্বতীর্থের সেরা-তীর্থ প্রয়াগে এসে শিবশর্মা মাঘমাস অতিবাহিত করে, গেল বারাণসীতে। কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ পথেই সর্ববিঘ্ন-বিনাশক দেহলী বিনায়ক। যথাবিহিত তার অর্চনা সেরে শিবশর্মা এল মণিকর্ণিকার ঘাটে। উত্তরবাহিনী স্বর্গতরঙ্গিনী গঙ্গাকে দর্শন করে, অবিলম্বে সমাপন করল অবগাহন। তারপর পারলৌকিক ক্রিয়া সেরে বিত্তশাঠ্য না রেখে অকার্পণ্য হৃদয়ে পঞ্চতীর্থ যাত্রা, বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করে বারবার মহাদেবের সেই পুরী দর্শন করতে লাগল। যত দেখে, ততই বিস্ময়ে হতবাক হয়, ভাব-প্রাবল্যে ভাসতে থাকে তার মন। নিঃসংশয় হতে থাকে, কাশীপুরীর কাছে অমরাবতীও ম্লান, স্বর্গলোকবাসী দেবতাদেরও কাঙ্ক্ষিত নন্দী এবং প্রমথগণ-বেষ্টিত মহাদেবের এই অধিষ্ঠানক্ষেত্র কাশী। এখানকার জলও যেন অমৃত স্তনদুগ্ধ। এই সেই মণিকর্ণিকা—যেখানে রয়েছে মুক্তিলক্ষ্মীর মহাপীঠের মণি আর তাঁর চরণ কমলের কর্ণিকা বৃন্ত। জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যবলেই একমাত্র কাশীক্ষেত্রে জন্মলাভ সম্ভব। যতই দেখে, ততই বাড়তে থাকে দেখার বাসনা, বাড়তে থাকে কাশীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শিবশর্মার যখন মানসিক অবস্থা এমনিভাবে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন

হয়ে আসছিল, তখন ভাবল, সাতটি পুরী দর্শনের সঙ্কল্প এখনও তার পূরণ হয়নি। যদিও কাশীই শ্রেষ্ঠ, তবুও এটি নিয়ে মাত্র তিনটি পুরী দর্শন হয়েছে, এখনও চারটি বাকি। সুতরাং স্থির করল, সেই চারটি ঘুরে আবার সে ফিরে আসবে কাশীতে। সব জেনে এবং সব বুঝেও শিবশর্মা তাই একদিন কাশী থেকে আবার বেরিয়ে পড়ল।

শিবশর্মা অতঃপর নানা দেশ অতিক্রম করে এল মহাকালপুরী অবন্তীতে, কলিকালে যার নাম উজ্জয়িনী। যে কাল প্রলয়ের কালে সমস্ত বিশ্বকে সংহার করে, সেই কালকেও সংহার করে মহাদেব এখানে মহাকাল-নামে অবস্থিত। ত্রিভুবনে বিরাজ করছেন হাটকেশ, মহাকাল এবং তারকেশ নামে তিন মূর্তিতে, একই লিঙ্গ। এখানে সিদ্ধবট নামক স্থানে আছে জ্যোতির্লিঙ্গ। একমাত্র মহাকালের প্রসাদেই মেলে তার দর্শন। এখানে যাঁরা "মহাকাল মহাকাল মহাকালেতি সন্ততম্। স্মরতঃ স্মরতো নিত্যং স্মরকর্ত্তৃস্মরান্তকৌ॥" (৭।৯৯)—নিরন্তর মহাকাল, মহাকাল, মহাকাল এই বাক্য স্মরণ করে, শ্রীকৃষ্ণ এবং মহেশ্বর তাঁদের স্মরণ করেন। মহাকালের আরাধনা করে এরপর শিরশর্মা এল কান্তিনগরীতে। কান্তিময়ী লক্ষ্মীকান্তের পুরী কান্তিনগরীতে সাত-রাত বসবাস করে সু-কান্ত হয়ে শিবশর্মা এবার এল দ্বারবতী-পুরীতে (দ্বারকা)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিবর্ণের সমান উন্নতির দ্বার এই পুরী, তাই নাম, দ্বারবতী। এখানকার গোপীচন্দন গন্ধে, বর্ণে এবং পবিত্রতায় অতুলনীয়। রত্নসমৃদ্ধ দ্বারকার রত্ন যুগ-যুগ ধরে অপহরণ করেই সমুদ্র হয়েছে 'রত্নাকর'। এখানে যারা মৃত্যু বরণ করে, তাদেব স্থান বৈকুণ্ঠে। এখানকার তীর্থসমূহে স্নান এবং পারলৌকিক ক্রিয়াদি সেরে শিবশর্মা এরপর গেল মায়াপুরীতে। এই পুরীর এমনি মাহাত্ম্য, যে বৈষ্ণবী-মায়া জীবমাত্রকেই মায়াপাশে আবদ্ধ করে, এখানে সেই অনন্ত-শক্তিশালিনী মায়াও পরাজিতা, কেউ কেউ এই মায়াপুরীকে বলে মোক্ষদ্বার, কেউবা গঙ্গাদ্বার। আবার কেউবা বলে হরিদ্বার। এই

সেই স্থান, যেখান থেকে গঙ্গা নির্গতা হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েছেন মোক্ষদায়িনী ভাগীরথী নামে ; এই সেই স্থান যাকে বলা হয়ে থাকে স্বর্গের সোপান। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে এসে সুপণ্ডিত শিবশর্মা স্নান, তীর্থোপবাস, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কাজকর্ম সেরে যেমন পারণ (ব্রত-উপবাস শেষে আহার্য গ্রহণ) করতে ইচ্ছা করলে, অমনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হল।

উত্তরোত্তর শিবশর্মার জ্বর যত বাড়তে লাগল, ততই চিন্তান্বিত এবং বিহ্বল হয়ে উঠতে লাগল সে। কোথায় স্ত্রী-পুত্র, ঘর-বাড়ি, আর কোথায় এই নিরালম্ব জীবন—সেবা-শুশ্রূষাহীন। জীবনের আয়ু তো এখনো শেষ হয়ে যায় নি, বার্ধক্যের জরাও এখনও স্থবির করে দেয়নি তাকে, অথচ মৃত্যুরূপ এই পীড়া এল কেন? তবে কি মৃত্যু সুনিশ্চিত! তাই যদি হয়, তাহলে, আর ধন-জনের চিন্তা কেন? কেন ঘর-বাড়ির চিন্তা! শাস্ত্রেই আছে, যুদ্ধে অথবা তীর্থে মৃত্যু মঙ্গলদায়ক। ভাগীরথীর তীরে মৃত্যু তো পরম শ্রেয়। সুতরাং এই সময় হৃষিকেশ এবং মহাদেবের স্মরণ-মনন করাই ঠিক। এই ভেবে নিজের উদ্‌ভ্রান্ত মনকে সংযত করল ব্রাহ্মণ। তেরদিন পীড়ার বৃশ্চিক দংশন ভোগ করে চতুর্দশ দিনে দেহত্যাগ করল শিবশর্মা। কাশী প্রত্যাবর্তন আর হল না, যদিও সঙ্কল্পমত সাতটি পুরী দর্শন তার শেষ হয়েছিল।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গরুড়ধ্বজ রথ এল শিবশর্মাকে বৈকুণ্ঠ-ধামে নিয়ে যাবার জন্যে। সুবিশাল সেই রথের চতুর্দিকে ছোট ছোট ঘণ্টার সুমধুর নিনাদ ; রথোপরি বিষ্ণুর দুই অনুচর—পুণ্যশীল আর সুশীল, প্রসন্নবদনে চতুর্ভুজ মূর্তিতে বিরাজিত ; স্বর্ণবর্ণ কৌশেয় বস্ত্রে শোভিতা সহস্র দিব্যকন্যা চামর হস্তে বিরাজিতা। শিবশর্মা পীতবসনে চতুর্ভুজমূর্তি ধারণ করে সেই রথে সমাদৃত হয়ে চলল আকাশপথে।

[অধ্যায় ৮]

শাস্ত্রজ্ঞ তদুপরি তীর্থভ্রমণের ফলে শুদ্ধদেহ এবং পুণ্যাত্মা শিবশর্মা দিব্যদৃষ্টি এবং দিব্যানুভূতির বলে বিষ্ণুর গণদ্বয়কে চিনতে পেরে, তাদের যথাবিহিত মর্যাদা দিয়ে চলেছে গগনমার্গে। যেতে-যেতে দেখল এক স্থান। একেবারে হতশ্রী না হলেও, তেমন সৌন্দর্য-মণ্ডিত নয় স্থানটি। অধিবাসীরাও বিকটাকার। কৌতূহলী শিবশর্মাকে স্থানটির পরিচয় দিলেন পুণ্যশীল আর সুশীল—"অয়ং পিশাচলোকেঽত্র বসন্তি পিশিতাশনাঃ। দত্ত্বানুতাপভাজো যে নো নো কৃত্বা দদত্যপি।"—এটি পিশাচলোক, এখানে যারা মাংসাশী তাদের বাস। যারা দান করে অনুতাপ করে, প্রথমে বিমুখ করে পরে দান করে, যারা অশুদ্ধচিত্তে, অভক্তিসহকারে, না করলে নয় এই ভেবে, মহাদেবের পূজা করে, তারাই (মৃত্যুর পর) এই স্থানে স্বল্প পুণ্য এবং স্বল্প বিত্ত নিয়ে বসবাস করে। এই লোক অতিক্রম করে শিবশর্মা আর একটি লোক দেখে কৌতূহলী হলে বিষ্ণুর গণেরা বললেন—"গুহ্যকানাময়ং লোকস্ত্বেতে বৈ গুহ্যকাঃ স্মৃতাঃ। ন্যায়েনোপার্জ্জ্য বিত্তানি গূহয়ন্তি চ যে ভুবি।"—এটি গুহ্যক (যক্ষ) লোক। ন্যায়পথে অর্থ উপার্জন করে যারা সর্বদাই সেই অর্থ গোপন করে রাখে, এখানে তাদেরই বসবাস। ক্রোধ এবং অসূয়া-রহিত এরা নিজ কুলের ব্রাহ্মণের কথাই একমাত্র মেনে চলে, তাকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করে এবং কুটুম্ব-পরিবৃত হয়ে সুখে দিনাতিপাত করে, তারাই এই হৃষ্টপুষ্ট শরীর নিয়ে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে অকুতোভয়ে এই লোকে বাস করে। গুহ্যকলোক অতিক্রম করতেই আর একটি নয়ন-মনোহর লোক দর্শন করল শিবশর্মা। গণদ্বয় তাকে দিতে লাগলেন তার পরিচয়—এটি হল গন্ধর্বলোক। সঙ্গীতাদি কলায় যারা নিপুণ, বিদগ্ধ স্তুতিপাঠক যারা,

তারাই পুণ্যবলে হয় এই লোকের অধিবাসী। "দেবানাং গায়না হ্যেতে চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।"—এখানকার অধিবাসীরাই দেবতাদের গায়ক, চারণ ও স্তুতিপাঠক। গীত-বিদ্যায় সম্যক পারদর্শী জনই হরিহরের পরমাত্মীয় হয়ে মুক্তিলাভ করে। তুম্বুরু আর নারদ এই বিদ্যাবলেই তাই দেবদুর্লভ। "গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমং পদম্। রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে॥" (৮/২৯)—এই লোকে সর্বদাই এই কথাই গীত হয়ে চলেছে যে, গীতজ্ঞ ব্যক্তি যদি গানের দ্বারা পরমাগতি লাভ না করে সে রুদ্রের অনুচর হয়ে তাদের সঙ্গে থাকে।

গন্ধর্বলোকের মনোহর কাহিনী শুনতে-শুনতে শিবশর্মা এল বিদ্যাধর (কিন্নর) লোকে। পুণ্যশীল আর সুশীল এই লোকের পরিচয় দিয়ে শিবশর্মাকে বললেন—যারা নানা বিদ্যায় বিশারদ, অথচ অনভিমানী ; বিদ্যার্থীগণকে যাঁরা অকাতরে বিদ্যা দান করে থাকে ; ধর্মকে অবলম্বন করে যারা সকামী হয়ে অভীষ্ট দেবতার পূজা এবং শিষ্যকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করে, দেহান্তে তারাই হয় এই প্রিয় লোকের অধিবাসী।

বিষ্ণুগণদ্বয় যখন শিবশর্মাকে বিদ্যাধর লোকের ইতিবৃত্ত বলছেন, দুন্দুভি-নিনাদে অন্য এক বিমানে, সপার্ষদ যমরাজ এলেন, অভ্যর্থনা জানালেন শিবশর্মাকে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশর্মার মর্তজীবনের ধর্মানুসারী যথাবিহিত কার্যাবলীর প্রশংসা এবং মুক্তক্ষেত্র মোক্ষদ্বারে স্নান এবং বিনশ্বর দেহত্যাগের কারণে বিষ্ণুগণদ্বয়ের প্রাপ্তির জন্য শিবশর্মাকে সাধুবাদ জানিয়ে গণদ্বয়ের দর্শনে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে ফিরে গেলেন যমরাজ নিজের সংযমনী পুরীতে।

বিস্মিত হল শিবশর্মা সপার্ষদ যমরাজের অতীব সৌম্যমূর্তি এবং সুমধুর সম্ভাষণে। যমরাজের যে রূপের বর্ণনার সঙ্গে মর্তজীবনে তার পরিচয়, তার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখে, কৌতূহলী হল শিবশর্মা। মনে জাগে অনেক প্রশ্ন—যমরাজের এই রূপ ছাড়া কি অন্য কোন রূপ আছে? যমলোক কাদের দর্শন করতে হয় না। যমরাজের

সংযমনী পুরীতে কারা বাস করতে পারে।

শিবশর্মার পুণ্যবলের সঙ্গী পুণ্যশীল এবং সুশীল তৎক্ষণাৎ তার সংশয়মোচন করে বললেন—"ধর্ম্মমূর্ত্তীঃ প্রকৃত্যৈব নিঃশঙ্কে পুণ্যরাশিভিঃ॥ অয়মেব হি পিঙ্গাক্ষঃ ক্রোধরক্তাক্তলোচনঃ। দংষ্ট্রাকরালবদনো বিদ্যুজ্জ্বলনভীষণঃ॥ ঊর্দ্ধকেশোঽতিকৃষ্ণাঙ্গঃ প্রলয়াম্বুদনিঃস্বনঃ। কালদণ্ডোদ্যতকরো ভ্রূকুটিকুটিলাননাঃ॥" (৮/৫৪-৫৬)—পুণ্যাত্মাদের কাছে ইনি সৌমরূপী ধর্মমূর্তি আর দুরাত্মা অর্থাৎ পাপীদের কাছে ইনি পিঙ্গাক্ষ, ক্রোধারক্তলোচন, দংষ্ট্রাকরালবদনে বিদ্যুৎ লকলক রসনা। ঊর্ধ্বকেশ, প্রলয়গম্ভীর স্বর, হস্তে কালদণ্ড। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে পাপীজনের পাপকর্মের গুরুত্ব অনুসারে দেহান্তে এঁর দূত তাকে এনে এঁরই আদেশে এক-এক নরকে নিক্ষেপ করে। কাউকে কুম্ভীপাক নরক, কাউকে বা রৌরব, মহারৌরব, অবীচি নরক। কারো কারো জন্য নির্দিষ্ট করেন জ্বালাকীল, কালকূট, লালাপিব, আমপাক, শূলপাক, অন্ধকূপ নরক। কাউকে বা পাঠান অধোমুখ, তপ্তকর্দম, ভ্রমর-দংশক নরকে। কালদণ্ড হাতে ইনি এইভাবে যেমন করে থাকেন পাপীদের শাস্তিবিধান অপরদিকে তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নির্বিশেষে যাঁরা সংযমের সঙ্গে স্বধর্মে নিরত থাকেন, দেহান্তে তাদের এনে বাস করান সংযমনী পুরীতে। নীতিমার্গানুসারী উশীর, সুধন্বা, বৃষপর্বা, জয়দ্রথ, রজি, সহস্রজিৎ, কুক্ষি, যুবনাশ্ব, দন্তবক্র, নাভাগা, রিপুমঙ্গল, করন্ধম, ধর্মসেন, পরমর্দ, পরান্তক ছাড়াও ধর্মাধর্ম বিচারনিপুণ রাজাদের জন্যে নির্দিষ্ট সুধর্মা নামে ধর্মরাজের সভা। তবে, যমরাজের নির্দেশে তাঁর কিঙ্করেরা সর্বদা সেইসব ব্যক্তি থেকে দূরে থাকে যারা তুলসী, রুদ্রাক্ষ ধারণ করে সদা-সর্বদা সর্বসন্তাপহারী, সদ্যমোক্ষদায়ী বিষ্ণু ও শিব অর্থাৎ হরিহরের—গোবিন্দ, মাধব, মুকুন্দ, হরে, মুরারে, শম্ভো, শিবেশ, শশিশেখর, শূলপাণি প্রভৃতি অষ্টোত্তর শতাধিক পুণ্য নাম কীর্তন করে।

[অধ্যায় ৯]

বৈকুণ্ঠ পথগামী শিবশর্মা গগনমার্গে এরপর এল দিব্যালঙ্কার ভূষিতা, দিব্যাভরণভূষিতা, রূপ-লাবণ্যময়ী অপ্সরালোকে। এই লোকের সঙ্গে শিবশর্মাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন গণদ্বয়—নারী অধ্যুষিতা এই লোকের অধিবাসীরা দেবগণের মনোরঞ্জনকারিণী বারবিলাসিনী অপ্সরা ; এরা নৃত্য-গীত-বাদ্য-বিদ্যায় অতি নিপুণা। চিরযৌবনা এবং স্বেচ্ছাধীন শরীরধারণক্ষমা উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, চন্দ্রলেখা, তিলোত্তমা, বপুষ্মতী, কান্তিমতী, লীলাবতী, উৎপলাবতী, অলম্বুষা, স্থূলকেশী, কলাবতী, কলানিধি, গুণনিধি, অনঙ্গলতিকা প্রভৃতি ষাটহাজার অপ্সরার বাস। যে নারী সাঙ্গকাম্যব্রতসমূহ ইহকালে যথাবিধি অনুষ্ঠান করে, অনূঢ়া বা সীমন্তিনী নারী স্খলিতা হয়েও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে, দেহান্তে তারাই হয় অপ্সরা লোকের বাসিন্দা।

অতঃপর শিবশর্মা দেখলে, কদম্বপুষ্পের কেশরের ন্যায় সূর্য-কিরণছটায় দেদীপ্যমান সূর্যলোক। দেখলে, ন'হাজার যোজন বিস্তৃত বিচিত্র একচক্ররথে দুটি লীলাপদ্ম-হস্তে অবস্থান করছেন সূর্যদেব। সপ্ত অশ্বযোজিত সেই রথের রশ্মি ধরে দাঁড়িয়ে অরুণ পুরোভাগে। অপ্সরা, মুনি, গন্ধর্ব, যক্ষ আর রাক্ষসেরা তাঁকে প্রণাম করছে কৃতাঞ্জলিপুটে। দেব সূর্যও ভ্রূভঙ্গি-সহকারে তাদের প্রণাম গ্রহণ করে নিমেষমধ্যে অতিদূর নভোমার্গ অতিক্রম করে গেলেন। শিবশর্মাও সূর্যদেবকে প্রণাম জানিয়ে গণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলে, কীভাবে এই সূর্যলোক লাভ করা যায়।

বিষ্ণুর গণেরা বললেন,—যিনি নাম-গোত্রহীন, রূপাদি-বিবর্জিত সর্বভূতের নিয়ন্তা এবং একমাত্র কারণ, যাঁর কটাক্ষে ঘটে সৃষ্টি প্রলয় সেই সর্বান্তর্যামী, সর্বতোগামী পরম পুরুষ অবস্থান করেন আদিত্যের

মধ্যে। তাঁর যথাবিহিত উপাসনাই প্রশস্ত করে ঐ লোকপ্রাপ্তির পথ। বললেন—"কিং কিং ন সবিতা সূতে কালে সম্যগুপাসিতঃ। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং বসূনি সপশূনি চ॥ মিত্রপুত্রকলত্রাণি ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ। ভোগানষ্টবিধাংশ্চাপি স্বর্গঞ্চাপ্যপবর্গকম॥" (৯/৪৭-৪৮) —সূর্যেব উপাসনা করলে জগতে এমন কি বস্তু আছে, যা তিনি দান করেন না! আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য, ধন, পশু, মিত্র, পুত্র, কলত্র, বিবিধ ক্ষেত্র, অষ্টবিধ ভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গ সমস্তই তিনি দান করে থাকেন। অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে প্রণব গায়ত্রী হল এই পরম পুরুষের উপাসনার একমাত্র মাধ্যম। তেজোরাশি সমন্বিত ভগবান সূর্য কাল এবং কালপ্রবর্তক। এই লোক-নিবাসীরা সূর্যকে উদ্দেশ্য করে এই শ্রুতিবাক্য কীর্তন করেন—"এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভ অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্‌জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥" (৯/৬১)—এই দেব সমস্ত দিকে ব্যাপ্ত, এঁর জন্ম নেই, ইনিই গর্ভে অবস্থান করেন, ইনিই জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই জন্মগ্রহণ করবেন, ইনিই সমস্তের মধ্যে অবস্থান করেন, এবং ইনিই সর্বতোমুখ।

ভিন্ন-ভিন্ন মাসে, ভিন্ন-ভিন্ন রাশিতে যারা সূর্যের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবিহিত দান,হোম, জপ, পূজা আদি করে এমনকি বারাণসীতেও রবিবারে লোলার্কাদির যারা সেবা পূজা করে, এবং দেব সূর্যের হংস, ভানু, সহস্রাংশু, কশ্যপাত্মজ প্রভৃতি সত্তরটি নাম আদিতে 'প্রণব' শেষে 'নমঃ' যোগে কীর্তন করে, তারাই সূর্যলোক লাভ করে।

এই কথা বলে গণদ্বয় শিবশর্মাকে বললেন—"ইত্যেকদেশঃ কথিতো ভানুলোকস্য সত্তম্। মহাতেজোনিধেরস্য কো বিশেষমবৈত্যহো।" (৯/৯৪)—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। মহাতেজের আলয় ভানুলোকের একাংশ মাত্র কথিত হল। এই লোকের বিশেষ বিবরণ কে-ই বা জানে?

[অধ্যায় ১০]

এরপর শিবশর্মা দেখলে অপূর্ব দুটি নগরী। গণদ্বয়ের কাছ থেকে পরিচয় পেয়ে জানল—প্রথমটির নাম, অমরাবতী, দেবরাজ ইন্দ্রের নগরী। সংযমনী, অর্চিষ্মতী, পুণ্যবতী, অমরাবতী, গন্ধবতী, অলকেশী নামে অনেক পুরীই এখানে আছে, কিন্তু অমরাবতী তুলনারহিত। স্বচ্ছ-স্ফটিকের উপর নানা মণি-মাণিক্য-রত্নাদি-খচিত এই অতুলনীয় প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি বিশ্বকর্মা। অন্ধকার কখনও এই পুরীতে প্রবেশ করতে পারে না; সূর্যের প্রখর উত্তাপও এই পুরীতে কখনও অনুভূত হয় না। কল্পবৃক্ষ এই পুরীর অধিবাসীদের যাবতীয় প্রয়োজন যাচ্ঞামাত্রেই মিটিয়ে দেয়, কামধেনু যোগায় যাবতীয় রসদ, আর পুরীর অধিষ্ঠাত্রী স্বয়ং চিন্তামণি ইন্দ্র অধিবাসীদের সব চিন্তা হতে মুক্ত রাখেন। অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, করিশ্রেষ্ঠ ঐরাবত দেবরাজের বাহন। রত্নভূতা মন্দাকিনী, অপ্সরী-শ্রেষ্ঠা উর্বশী, বৃক্ষরত্ন পারিজাত পুষ্পের সঙ্গে তেত্রিশ কোটি দেবতা, নিত্য দেবরাজের আরাধনা করে। ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য যেমন অতুলনীয়, তেমনি স্বর্গলোকমধ্যে ইন্দ্রত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পদও অতীব লোভনীয়। নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে যিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে পারেন, সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই একমাত্র পেতে পারেন ইন্দ্রত্বের পদ, লাভ করতে পারেন ইন্দ্রাণীকে। শত-অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করতে না পারলেও প্রকৃত যাজ্ঞিক, নির্মল স্বভাব, সত্যবাদী, ধৈর্যশালী, রণক্ষেত্রে অবিচল, পরাক্রমীরাই মাত্র আসতে পারেন অমরাবতীতে। কত দনুজ, দানব, যক্ষ-রক্ষ-মানব যে এই লোভনীয় এবং সম্মানার্হ পদ পাবার জন্যে নিয়ত কঠোর তপস্যা করে চলেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

শিবশর্মা এর পর বর্তমান ইন্দ্র, সপ্তলোকপাল-সেবিত দেবরাজ

শতমন্যুকে, লোকে যাঁকে দিবস্পতি বলে থাকেন, তাঁকে দেখে ব্যোমপথে এগোতেই দক্ষিণে দেখতে পেলে আর এক পুরী। গণদ্বয়ের কাছ থেকে জানলে শিবশর্মা তার পরিচয়—এটি হল দেব অগ্নির পুরী অর্চিষ্মতী। এই পুরীর অধীশ্বর হলেন স্বয়ং অগ্নি—যাঁর অপর নাম, পাবক। যেহেতু অগ্নির সংসর্গেই সমুদায় পদার্থ পবিত্রতা লাভ করে তাই তার নাম পাবক। গণদ্বয় বললেন ঃ "অগ্নিরেকো দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ। গুরুর্দেবো ব্রতং তীর্থং সর্ব্বমগ্নির্ব্বিনিশ্চিতম্॥"—দ্বিজগণের কাছে মুক্তির একমাত্র সাধক হল অগ্নি। অগ্নিই গুরু, দেব, ব্রত, তীর্থ। অগ্নিই সব কিছু, এ-বিষয়ে কোন সংশয় নেই। ত্রিভুবনেশ্বরের নেত্রস্বরূপ এই চিত্রভানু হলেন অনলরূপা শাম্ভবী অর্থাৎ মহাদেবের অন্যতম তেজোময়ী মূর্তি। অগ্নির যারা উপাসক, একমাত্র তারাই এই লোকের বাসিন্দা।

কৌতূহলী হয়ে উঠল শিবশর্মা।—কে এই অগ্নি? কি এর পরিচয়। আর এমন অর্চিষ্মতী নগরীর অধীশ্বরই বা তিনি হলেন কিভাবে?

পুণ্যশীল আর সুশীল শোনালেন শিবশর্মাকে সেই অভূতপূর্ব পুরাকাহিনী। নর্মদাতীরে নর্মপুর নামে এক পুরীতে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ব্রহ্মচর্য-ব্রতে স্বনিষ্ঠ, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রহ্মতেজোময় বিশ্বানর নামে এক শিবভক্ত মুনি বাস করতেন। একদিন তাঁর মাথায় এই চিন্তার উদয় হল, ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ আর ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী, এই চারটি আশ্রমের মধ্যে কোন আশ্রম শ্রেয়স্কর বা কোন আশ্রম অবলম্বন করলে পতিত বা ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। অনেক ধীর-স্থির বিচার-বিশ্লেষণের শেষে এই সিদ্ধান্তে এলেন, যে, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ ইত্যাদি ষড়-রিপুকে আয়ত্তাধীন রেখে সাগ্নিক এবং সদার গার্হস্থ্যাশ্রমই সব কটি আশ্রম থেকে নিরাপদ এবং শ্রেয়। এর অল্প কিছুদিন পরেই, নিজের যোগ্যা, এবং সৎ-কুলোদ্ভবা একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন যথাবিহিতভাবেই। গার্হস্থ্যাশ্রমের বেদোক্ত কর্মগুলি করে চললেন অত্যন্ত সংযম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে।

সহধর্মিণী শুচিষ্মতির সাহচর্যে বেশ কয়েকটা বছর অতিক্রান্ত হল বিশ্বানরের। গার্হস্থ্যাশ্রমে এসে একমাত্র ধর্মকর্মের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই ছিল না তাঁর মাথায়। হঠাৎ একদিন, শুদ্ধবেশা শুচিষ্মতী স্বামী সন্নিধানে এসে তাঁর যথাবিহিত পূজা সেরে সসম্ভ্রমে জানালেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সুপ্ত বাসনা—তিনি যেন মহেশ্বর-সদৃশ এক পুত্রের জননী হতে পারেন। চমকে উঠলেন বিশ্বানর। ব্রহ্মচর্যে স্বনিষ্ঠ তিনি কখনো ত এমন চিন্তা করেন নি। তবে তাঁর সহধর্মিণীর মনে এ-বাসনা কেন জাগল? যদিও বা জাগল, বাক্য হয়ে স্ফুরিত হল কেন? তবে কি বাক্যরূপ তাঁর আরাধ্য দেবতা শম্ভুই অন্তরাল থেকে জানালেন তাঁর বাসনা। তা ছাড়া আর কী হতে পারে? এই ভেবে তিনি শুচিষ্মতীকে অভিলষিত পুত্র-প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তপস্যার নিমিত্ত গমন করলেন কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্র বারাণসীতে। মণিকর্ণিকা দর্শন, পুণ্যকুণ্ডে স্নান, পারত্রিক ক্রিয়াকলাপ সেরে লিঙ্গ-সমাকীর্ণ বারাণসীর প্রতিটি লিঙ্গক্ষেত্র দর্শন করে চিন্তাকুল হলেন কাশীধামের একশো আট শিবলিঙ্গের মধ্যে, কোন্ লিঙ্গের অর্চনা হবে আশু ফলপ্রদ। লিঙ্গ-বিভ্রান্ত বিশ্বানরের স্মরণ পথে হঠাৎ উদিত হলেন বীরেশ্বর লিঙ্গ। পঞ্চমুদ্রাময় মহাপীঠ অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীধামের এক গুহ্যতম স্থানে তাঁর অবস্থান। ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষপ্রদায়ী এই লিঙ্গের তুল্য আর কেউ নেই। পঞ্চস্বর নামে গন্ধর্ব, স্বচ্ছবিদ্যা নামে বিদ্যাধর, বসুপূর্ণ নামে যক্ষরাজ, শঙ্খচূড় নামে সর্পরাজ, এই বীরেশ্বর-এর অর্চনা করেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আবার বেদশিরা নামে ঋষি, কোকিলালাপা নামে অপ্সরী, চন্দ্রমৌলি এবং ভরদ্বাজ নামে দুই পাশুপাত-শ্রেষ্ঠ, পেয়েছিলেন নির্বাণ। এমনি আরো অনেক সিদ্ধই বীরেশ্বরের প্রসাদ লাভ করেছিলেন। বিশ্বানরও তাই স্থির করলেন, সর্বসিদ্ধিদাতা এই বীরেশ্বর লিঙ্গেরই ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করে পত্নী শুচিষ্মতীর অভিলাষ পূর্ণ করবেন।

অতঃপর বিশ্বানর চন্দ্রকূপ জলে স্নান করে বীরেশ্বর লিঙ্গের

প্রসাদ কামনায় কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন শুরু করলেন। কঠোর থেকে কঠোরতর তপস্যায় যখন প্রায় তেরো মাস অতিক্রান্ত তখন হঠাৎ একদিন মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্রই দেখতে পেলেন লিঙ্গের মধ্যভাগে শৈশবোচিত-বেশধারী নয়নমুগ্ধকর উলঙ্গ এক বালক আপন লীলায় বিভোর হয়ে বেদের সূক্তসমূহ পাঠ করছেন। বালকাকৃতি বিভূতিভূষিত, আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন, লোহিতবর্ণ সুন্দর ওষ্ঠ ও অধর, পিঙ্গলবর্ণ জটাকলাপে বিভূষিত মনোহর মস্তক। সদাহাস্যময় লীলাবিভোর অষ্টমবর্ষীয় সেই বালককে দেখে রোমাঞ্চিত তনু বিশ্বানর আবেশে আপ্লুত হয়ে বারবার তাঁকে ইষ্টদেবজ্ঞানে প্রণাম করে গদগদ কণ্ঠে তাঁর স্তুতি বন্দনা করলেন। অভিলাষাষ্টক সেই স্তোত্রে প্রীত দেবদেব শম্ভু বিশ্বানরকে এই বলে বর দিলেন ঃ "ত্বয়া শুচে শুচিষ্মত্যাং যোঽভিলাষঃ কৃতো হৃদি। অচিরেণৈব কালেন স ভবিষ্যত্যসংশয়ঃ॥ তব পুত্রত্বমেষ্যামি শুচিষ্মত্যাং মহামতে। খ্যাতো গৃহপতির্নাম্না শুচিঃ সর্ব্বামরপ্রিয়ঃ॥"—হে মহামতে! তুমি এবং তোমার স্ত্রী শুচিষ্মতি যে অভিলাষ করেছ, তা নিশ্চয়ই সত্বর পূর্ণ হবে। শুচিষ্মতীর গর্ভে আমিই সকল দেবের প্রিয় 'গৃহপতি' নামে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব।

এই বলে বালক অন্তর্হিত হলেন। বিশ্বানরও গৃহে প্রত্যাগমন করলেন।

[অধ্যায় ১১]

অনন্তর এক শুভদিনে, শুভলগ্নে, বিশ্বানরের ঘর আলো করে অপরূপ কান্তিযুক্ত, চন্দ্রতুল্য সুবদন, দেবদুর্লভ এক শিশু শুচিষ্মতীর গর্ভ হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। মাতা-পিতার তৃপ্তির সীমা নেই, আনন্দের সীমা নেই প্রতিবেশীদেরও। শিশু জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় মেঘরাশি থেকে হল পুষ্পবৃষ্টি, সুগন্ধি বাতাস বইতে লাগল চতুর্দিক থেকে, দুন্দুভিধ্বনি করলেন দেবতারা, প্রাণীগণ ভুলে গেল

অসূয়া। তিলোত্তমা, উর্বশী, রম্ভা, প্রভা, শুভা, সুমঙ্গলা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অপ্সরাগণ অগুরু, কস্তুরী, শঙ্খ, শুক্তি, কুঙ্কুম, গোমেদ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য আর রত্নসমূহ নিয়ে; অনেক বিদ্যাধরী, কিন্নরী, সহস্র সহস্র সুরবালা নানাবিধ মাঙ্গলদ্রব্য নিয়ে; গন্ধর্ব, উরগ ও যক্ষগণের পত্নীরা সুললিত স্বরে শুভগান করতে করতে বারবার আসতে লাগল বিশ্বানরের ভবনে। বিশ্বানরের আশ্রমে শান্তিকর্মের জন্য এলেন মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, ভরদ্বাজ, গৌতম, ব্যাস, কাত্যায়ন, বামদেব, চ্যবন, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তাবৎ মুনি আর মুনিকন্যারা। ব্রহ্মা এবং বৃহস্পতির সঙ্গে দেব গরুড়-বাহন বিষ্ণু; নন্দী-ভৃঙ্গী আর গৌরীকে সঙ্গে নিয়ে বৃষধ্বজ; মহেন্দ্রাদি দেবগণ; পাতালবাসী নাগসমূহ, বহুবিধ রত্ন নিয়ে সরিতের সঙ্গে মহাসমুদ্রের অধিষ্ঠাতাগণ এবং নানাপ্রকার স্থাবর জঙ্গম রূপ ধারণ করে এলেন সেখানে।

ব্রহ্মা স্বয়ং এই বালকের জাতকর্ম করে এগারো দিনের দিন তার নামকরণ করলেন—গৃহপতি। বালকের নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন এবং চূড়াকর্মাদি প্রভৃতি যাবতীয় কাজ যথাবিধি করলেন বিশ্বানর। শ্রবণানক্ষত্রে বালকের কর্ণবেধ এবং পঞ্চম বর্ষেই দিলেন পুত্রের উপনয়ন। অপূর্ব ধীশক্তিসম্পন্ন বালক তিন বছরের মধ্যেই সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন শেষ করলেন; পারদর্শী হয়ে উঠলেন সর্ববিদ্যায়।

বালক গৃহপতির তখন ন'বছর বয়স। পিতা-মাতার সেবা করছেন তিনি, এমন এক সময় তাঁকে দর্শন করার বাসনা নিয়ে বিশ্বানরের কুটীরে এলেন দেবর্ষি নারদ। পাদ্য-অর্ঘ গ্রহণের পর পিতা-মাতার সেবারূপ পরম তপস্যা, পরম ব্রত, এবং পরম ধর্মে রত বালক গৃহপতিকে দেখে হৃষ্টান্তঃকরণে নিজের কোলে বসিয়ে বললেন—দেখি, তোমার হাতখানা! গৃহপতিও নির্দ্বিধায় এগিয়ে দিলেন হাত। জ্যোতির্বিদ্যাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কেবলমাত্র হস্তরেখা নয়, বালকের প্রতিটি অবয়ব—তালু, জিহ্বা, দন্ত, নেত্র, হনু, জানু, ললাট, কটি, বক্ষস্থল—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ এবং বিচার করে পিতা

বিশ্বানরকে বললেন, সর্বগুণোপেত, সর্ব-সুলক্ষণযুক্ত এই বালক হবে রাজরাজেশ্বর। কিন্তু বিধাতার বিধানে নির্মল চন্দ্রকেও কলঙ্কের মালিন্য গ্রহণ করে নিষ্প্রভ হতে হয়। আমার আশঙ্কা, বারো বৎসর বয়সে এই বালকের বজ্রাগ্নিতে জীবনহানির যোগ অত্যন্ত প্রবল। এই কথা বলে ধীমান নারদ চলে গেলেন।

নারদের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী শোনামাত্রই সস্ত্রীক বিশ্বানরের মাথায় যেন তখনি নিদারুণ বজ্রপাত ঘটল। অনেক ক্লেশস্বীকার, অনেক তপস্যার পর দেবদুর্লভ এমন এক পুত্ররত্ন লাভ করেও তাকে হারাতে হবে ভেবে শোকাকুল-চিত্ত হয়ে উঠলেন তাঁরা। বিলাপ ছাড়া আর কোন উপায়ান্তর খুঁজে পেলেন না। তখন বিলাপরত পিতা-মাতাকে গৃহপতি ঈষৎ হাস্যে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'ন মাং কৃতবপুস্ত্রানাং ভবচ্চরণরেণুভিঃ। কালঃ কলয়িতুং শক্তো বরাকী চঞ্চলাল্পিকা॥ প্রতিজ্ঞাং শৃণুতং তাতৌ যদি বাং তনয়ো হ্যহম্। করিষ্যেঽহং তথা তেন বিদ্যুন্মত্তস্ত্রসিষ্যতি॥' (১১।৯৭-৯৮)—আপনাদের চরণধূলির প্রসাদে স্বয়ং কালও আমাকে বিনষ্ট করতে পারবে না; চপল-স্বভাব সামান্য বিদ্যুৎ আমার কি করবে। হে মাতঃ! হে পিতঃ! আমার প্রতিজ্ঞা শুনুন, আমি যদি আপনাদের তনয় হই, তাহলে আমি এমন কাজ করব, যাতে বিদ্যুৎ-ও আমাকে ভয় করবে। যিনি কালেরও কাল, আমি সেই মহাকাল মৃত্যুঞ্জয়ের আরাধনা করব।

পুত্রের এই সঙ্কল্প-বাক্যে সস্ত্রীক বিশ্বানর অনেকখানি বিগত-ক্লেশ হয়ে সেই মৃত্যুঞ্জয়ের আরাধনার অনুমতি দিলেন পুত্রকে।

পিতা-মাতাকে প্রদক্ষিণ করে গৃহপতি এলেন কৈবল্য-লাভের একমাত্র ক্ষেত্র কাশীধামে, যেখানে "বিশ্বেষাং বিশ্ববীজানাং কর্ম্মাখ্যানাং লয়ো যতঃ।"—বিশ্বেশ্বররূপ বিশ্বলিঙ্গে বিশ্বের কর্মরূপ যাবতীয় বীজ বিলয় প্রাপ্ত হয়।

অবিমুক্তক্ষেত্র নির্বাণপ্রদ এই ক্ষেত্রে এসে শুভদিন দেখে তিনি নিজে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করলেন। আঠারোশো গঙ্গাজলপূর্ণ ঘটে মহাদেবকে স্নান করিয়ে, একহাজার আট নীলবর্ণ পদ্মের মালায়

তাঁকে শোভিত করে, যম-নিয়ম অবলম্বন করে দুশ্চর তপস্যায় ব্রতী হলেন গৃহপতি।

এইভাবে দু'বছর শুচিসিদ্ধ তপস্যার শেষে গৃহপতির যখন বারো বৎসর বয়স পূর্ণ হল, নারদের ভবিষ্যদ্‌বাণীকে সত্যরূপ দিতে দেবরাজ বজ্রপাণি ইন্দ্র আবির্ভূত হলেন গৃহপতির সামনে। বললেন, তোমার তপস্যায় আমি প্রসন্ন হয়েছি। অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। গৃহপতি বিনম্র কণ্ঠে বললেন, মহাদেব ছাড়া আমি অন্য কারও কাছে বরপ্রার্থী নই। তখন ইন্দ্র বললেন,—'ন মত্তঃ শঙ্করোঽস্ত্যন্যো দেবদেবোঽস্মাহং শিশো।'—আমিই দেবগণের দেবতা, আমি ছাড়া অন্য কোন মহাদেব নেই। বালসুলভ চপলতা পরিত্যাগ করে তোমার প্রার্থনা তুমি আমার কাছেই রাখ। তবুও গৃহপতি প্রত্যাখ্যান করলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্র তখন ক্রোধারক্তলোচনে গৃহপতির উদ্দেশ্যে উদ্যত করলেন শতবিদ্যুৎতেজোপূর্ণ তাঁর আয়ুধ—বজ্র। একদিকে শতাগ্নির তীব্র তেজ, অপরদিকে নারদের বাক্য স্মরণে আসতেই গৃহপতি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গ হল মহাদেবের কোমল স্পর্শে। সুপ্তোত্থিতের মত গৃহপতি দেখলেন, কণ্ঠে কালকূট, বৃষধ্বজ, ভালে চন্দ্র, মস্তকে জটাভরা, ত্রিশূলধারী, কর্পূরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পরিধানে গজচর্ম, বামে হিমাদ্রি-তনয়াকে নিয়ে সামনে দণ্ডায়মান ত্রিনেত্রী মহাদেব। বাষ্পাকুলিত-কণ্ঠ এই রোমাঞ্চিত-তনু নিয়ে গৃহপতি মহাদেবের উদ্দেশ্যে স্তব এবং প্রণাম সারলেন। সুমধুর বচনে দেব শঙ্কর বললেন গৃহপতিকে—হে বালক, আমার ভক্তের অনিষ্ঠ সাধন করার ক্ষমতা কারও নেই। ইন্দ্রের বেশে আমিই তোমায় ভয় দেখিয়েছিলাম মাত্র। প্রসন্ন আমি তোমার প্রতি। নাও, আমার বর—"সর্ব্বেষামের দেবানাং বদনং ত্বং ভবিষ্যসি।"—তুমি হবে সমস্ত দেবগণের মুখস্বরূপ অগ্নি। "সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ত্বমগ্নেঽন্তশ্চরো ভব। ধর্ম্মরাজেন্দ্রয়োর্মধ্যে দিগীশো রাজ্যমাপ্নুহি।"—তুমি হবে সমস্ত ভূতগণের অন্তশ্চর আর দুই ধর্মরাজ যম এবং ইন্দ্রলোকের মধ্যস্থলে

তুমি রাজ্য পালন করবে দিকপতিরূপে। বীরেশ্বর-লিঙ্গের পূর্বে, গঙ্গার পশ্চিম-তটে তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গমৃত্যুভয়হারী 'অগ্নীশ্বর' লিঙ্গরূপে পূজিত হবে।

এই বর প্রদান করে দেবাদিদেব মহাদেব গৃহপতিকে একটি রথ দিয়ে বললেন, তোমার জনক-জননী আত্মীয়-পরিজন সকলকে এই রথে নিয়ে তোমার রাজ্যে গিয়ে তুমি অভিষিক্ত হও।—এই বলে লিঙ্গমধ্যে অন্তর্হিত হলেন মহাদেব।

এই হল সেই অগ্নিলোক আর অগ্নির পুরী অর্চিষ্মতী।

[অধ্যায় ১২]

যমরাজের সংযমনী পুরীর পশ্চিমে দিকপতি নির্ঋতের লোক। যারা ইহজীবনে সৎকর্ম অনুষ্ঠান, নির্লোভ অসূয়াহীন জীবন যাপন করে এসেছে; দম, দান, দয়া, ক্ষমা, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, আস্তেয়, সত্য এবং অহিংসা—এই দশবিধ ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা পুণ্য অর্জন করেছে, তারাই এই লোকের অধিবাসী হতে পারে। সে যে কোন জাতি-ই হক না কেন।

বহুকাল আগে বিন্ধ্যপর্বতে নির্বিন্ধ্যা নদীতটে বনমধ্যে বাস করত শবর-অধিপতি পিঙ্গাক্ষ। ব্যাধবৃত্তি তার জীবিকা হলেও, ছিল বড় কোমল-প্রাণ। সুপ্ত, মৈথুনরত, জলপানে নিরত. শিশু বা সন্তান-সম্ভবা কোন পশু-পক্ষী সে কখনই হত্যা করত না, যত প্রয়োজনই আসুক। শুধু তাই নয়, শ্রমাতুর পথিকদের দিত বিশ্রামের স্থান, ক্ষুধাতুরকে আহার, বস্ত্রহীনকে দিত কোমল মৃগচর্ম। অভয় দিত দূর-দূরান্তের তীর্থপথগামী পথিকদের। সেই দুর্গম প্রান্তর পথিকেরাও অতিক্রম করে যেত নির্ভয়ে শবরাধিপতি পিঙ্গাক্ষের নামে।

পিঙ্গাক্ষের পিতৃব্য তারাক্ষ থাকত সন্নিকটস্থ গ্রামেই। সে ছিল দারুণ খলস্বভাব। পশু-পক্ষী শিকার ছাড়াও পথচারীদের আক্রমণ

এবং হত্যা করে, তাদের সর্বস্ব অপহরণ করতে, তার বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ জাগত না। জাতিতে শবর হয়েও পিঙ্গাক্ষ তাদের সমর্থন করত না বলে, তার ওপর নিদারুণ ক্রোধ পোষণ করত তারাক্ষ।

একদিন, ধন-অপহরণ অভিলাষে তারাক্ষ পথ অবরোধ করল কিছু তীর্থপথযাত্রীর। তারা যাচ্ছিল বিশ্বনাথ-পরায়ণ মন নিয়ে বিশ্বনাথ দর্শনে। যাচ্ছিল, পিঙ্গাক্ষের ভরসায়, বিশ্বনাথের কৃপায় নির্ভীকচিত্তে; তাই হঠাৎ এই অবরোধে খুবই ভয়বিহ্বল হয়ে পড়ল তারা। রাত্রিকাল—কোথায় পিঙ্গাক্ষ! বিশ্বনাথধাম-ও এখনও বহুদূর। অনেক কাকুতি-মিনতি জানাল তারা তারাক্ষকে— যা আছে তাদের সঙ্গে, সব কিছু সে নিক্, কিন্তু প্রাণে যেন না মারে। কিন্তু, এসব আবেদন শোনার পাত্রই নয় তারাক্ষ। আর সে জানত-ও না, শিয়রে শমন তার দাঁড়িয়ে আছে অলক্ষিতে।

শিকার করতে বেরিয়ে পিঙ্গাক্ষও ঘুরতে-ঘুরতে সেদিন এসে পড়েছিল সেই ঘটনাস্থলে। পিতৃব্যের নিষ্ঠুরতায় ক্রোধারুণ হয়ে সে আত্মগোপন করে ছিল বৃক্ষান্তরালে রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায়। সকাল হতেই গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এল পিঙ্গাক্ষ ধনুর্বাণ হাতে। ব্যাঘ্রহুঙ্কারে বলল, "কোঽয়ং কোঽয়ং দুরাচারঃ পিঙ্গাক্ষে ময়ি জীবতি। উল্লুণ্ঠয়িষুঃ পান্থান্ প্রাণলিঙ্গসমান মম॥" (১২।৩৮) —কে, কে সেই দুরাচার! পিঙ্গাক্ষ বেঁচে থাকতে তার প্রাণলিঙ্গ-তুল্য (কণ্ঠে যারা শিবলিঙ্গ ধারণ করে থাকে) পথিকদের প্রাণে মেরে লুঠ করতে চায়?

তারাক্ষও বহুদিন ধরে ছিল এমনি এক সুযোগের অপেক্ষায়। স্বীয় কুলধর্মত্যাগী পিঙ্গাক্ষকে বধ করার কোন একটা উপায় সে চিন্তা করছিল অনেকদিন থেকেই। দেখল, এই অপূর্ব সুযোগ —পিঙ্গাক্ষ একা আর তারাক্ষ অনুচর-সমাবৃত। রণহুঙ্কার ছাড়ল তারাক্ষ। আদেশ দিল তার অনুচরদের—আগে পিঙ্গাক্ষকে বধ কর, তারপর এই পথিকদের। আদেশ পাবামাত্রই অনুচরেরা একযোগে

আক্রমণ করল পিঙ্গাক্ষকে। একাকী পিঙ্গাক্ষ, সমবেত আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে তীর্থযাত্রীদের নিরাপদে নিয়ে এল নিজের পল্লীতে। পথচারীরা রক্ষা পেল বটে, কিন্তু দুরাত্মাদের বাণে-বাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রুধিরাক্ত কলেবরে নিজের আবাসেই একসময় প্রাণত্যাগ করল। অন্তিমকালে একটা মাত্র চিন্তাই তাকে আচ্ছন্ন করেছিল—'অস্যূদয়িষ্যমেতাংস্তদভমিষ্যং যদীশ্বরঃ'—আমি যদি ঈশ্বর হতাম, তাহলে এই দস্যুদের বিনাশ করতে পারতাম।

অন্তিম মুহূর্তে প্রাণীর মনে যে ভাবনার উদয় হয়, দেহান্তে তার ভাবনাই সিদ্ধ হয়ে থাকে। পরোপকার ব্রতে ব্রতী, ধর্মপ্রাণ শবরাধিপতি পিঙ্গাক্ষের সেই অন্তিম অভিলাষ পূর্ণ হয়েছিল দিকপতি নৈঋর্তেশ্বর রূপে।

এই নৈঋর্তলোকের উত্তরে বরুণলোক। জিজ্ঞাসু শিবশর্মাকে একের পর এক লোকের পরিচয় দিয়ে চললেন বিষ্ণুগণদ্বয় পুণ্যশীল এবং সুশীল।

সমস্ত জলরাশির একমাত্র অধিপতি এবং সমস্ত কর্মের সাক্ষী, বারুণীদিগের নিয়ন্তা দেব বরুণ এই লোকের অধীশ্বর। যারা শীতল জল দ্বারা তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা দূর করে, পথপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ, পান্থশালা নির্মাণ, ভীত ব্যক্তিকে অভয়মুদ্রা দেখিয়ে যারা, নির্ভয় করে, যাত্রীদের যারা নৌকাযোগে নদী পারাপার করায়, তারাই দেহান্তে এই লোকে আশ্রয় পেয়ে থাকে।

এখন শুনুন এই মহাত্মা বরুণের উৎপত্তির বিবরণ।

প্রজাপতি কর্দমের সর্বগুণে গুণান্বিত এক পুত্র ছিল। নাম তার শুচিষ্মান। প্রজাপতি কর্দম ছিলেন দেবাদিদেব মহাদেবের একনিষ্ঠ অনুরক্ত ভক্ত। পুত্র শুচিষ্মান একদিন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করতে গিয়ে জলক্রীড়ায় রত হল। সেই সুযোগে এক শিশুমার (শুশুক) বালককে অপহরণ করে নিয়ে গেল। মুনি-বালকেরা বিষণ্ণ বদনে ফিরে এসে প্রজাপতি কর্দমকে জানাল সব ঘটনা। সব শুনে পুত্রবিহনে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না

ঋষি। মনে মনে আরাধ্য দেবতা মহাদেবকে স্মরণ করে যোগাসনে বসে ধ্যানস্থ হলেন তিনি।

প্রজাপতির ধ্যাননেত্রে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মহাদেবের চতুর্দশ ভুবন ; আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল ব্রহ্মাণ্ড ; ফুটে উঠতে লাগল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূতগণ, চন্দ্র, সূর্য, তারা, পর্বত, নদ-নদী, সরোবর—একে-একে সুস্পষ্ট ছবির মত। সমাধিস্থ কর্দম দেখলেন এক সরোবরে জলক্রীড়ারত তাঁর পুত্র শুচিষ্মানকে অকস্মাৎ এক শিশুমার আক্রমণ করল। ভয়বিহ্বল হয়ে উঠল তাঁর পুত্র। হঠাৎ এক জলদেবী এসে তাঁর পুত্রকে শিশুমারের কবল থেকে উদ্ধার করে সমর্পণ করল সমুদ্রের কাছে। ঠিক এমনি সময়ে ত্রিশূল হস্তে রুদ্ররূপী কোন দেবতা ক্রোধারুণলোচনে এসে দাঁড়ালেন সমুদ্রের কাছে। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"কুতো জলানামধিপ শিবভক্তস্য বালকঃ। প্রজাপতেঃ কর্দ্দমস্য মহাভাগস্য ধীমতঃ॥" —হে জলাধিপ শিবভক্ত মহাভাগ প্রজাপতি কর্দমের পুত্র কোথায় ? শিবশক্তি কী তোমার অজানা? কোন্ সাহসে তুমি তাকে এতক্ষণ আবদ্ধ রেখেছ। ভীত-ত্রস্ত হয়ে উঠল সমুদ্র। তৎক্ষণাৎ বালককে রত্নভূষণে ভূষিত করে, শিশুমারকে বেঁধে শম্ভুর চরণে সমর্পন করে জানাল সমুদ্র—এই শিশুমারই বালককে অপহরণ করে এনেছে দেব। সে আনে নি। রুদ্ররূপী দেব তখন পাশবদ্ধ শিশুমারকে শুচিষ্মানের হাতে দিয়ে বললেন—"হে বৎস! এটিকে নিয়ে শিব আজ্ঞায় তুমি সত্বর নিজের গৃহে গমন কর।"

সমাধিমগ্ন প্রজাপতি কর্দম যোগনেত্রে সব দেখলেন এবং পুত্রের প্রতি শিব-পার্ষদের এই আদেশ বাক্য শুনে সমাধিভঙ্গ করে নেত্র উন্মীলন করতেই দেখলেন, নানা রত্নে বিভূষিত পুত্র তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান, পাশে পাশবদ্ধ শিশুমার। শুচিষ্মানের শিখা তখনো জলে আর্দ্র, কষায়বর্ণ নয়ন, রুক্ষ ত্বক। পিতাকে প্রণাম জানালেন শুচিষ্মান। পুত্রকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে মুনিবর বারবার তার মস্তকে আঘ্রাণ নিলেন। ইতিমধ্যে এই সমাধিস্থ অবস্থায় যে পাঁচশ' বছর

অতিক্রান্ত হয়ে গেছে সেদিকে কোন খেয়ালই নেই প্রজাপতি কর্দমের।

এরপর কর্দমপুত্র শুচিষ্মান পিতাকে প্রণাম করে তাঁর অনুমতি নিয়ে তপস্যার জন্য গেলেন বারাণসীতে। সেখানে তিনি একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করে পাঁচ হাজার বছর ধরে নিশ্ছিদ্র দুশ্চর তপস্যা করলেন। তুষ্ট হলেন মহাদেব। শুচিষ্মানের সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন—বর নাও। বিনীতকণ্ঠে শুচিষ্মান প্রার্থনা জানালেন—"যদি নাথ প্রসন্নোঽসি ভক্তানামনুকম্পক। সর্ব্বাসামাধিপত্যং মে দেহ্যপাং যাদসামপি।"—হে নাথ! ভক্তের প্রতি যদি অনুকম্পাই হয়ে থাকে, যদি আপনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে এই বর দিন, আমি যেন সমস্ত জল এবং জলজন্তুগণের উপর আধিপত্য করতে পারি।

কর্দমপুত্রের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন বাঞ্ছা-কল্পতরু মহাদেব। তাঁকে অভিষিক্ত করলেন দেব বরুণের পদে। বললেন—"জলাশয়ানাং সর্ব্বেষাং প্রতীচ্যাশ্চাপি বৈ দিশঃ। অধীশ্বরঃ পাশপাণির্ভব সর্ব্বামরপ্রিয়ঃ।"—নদী, সরোবর, পল্বল এবং দীর্ঘিকার জলসমূহের ও মেঘসমূহের তুমি অধীশ্বর হও এবং প্রতীচীদিকেরও তুমি অধীশ্বর এবং সমস্ত দেবগণের তুমি প্রিয়পাত্র হও? আরও বললেন, মণিকর্ণিকেশ্বর মহাদেবের নৈঋর্তদিকে অবস্থিত তোমার প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বরুণেশ্বররূপে সর্বজীবের জড়তা-নাশক রূপে প্রখ্যাত হবে।

[অধ্যায় ১৩]

এই বরুণপুরীর উত্তরে গন্ধবতী নামে পবিত্র বায়ুপুরী। প্রভঞ্জন নামে জগৎপ্রাণ বায়ু মহাদেবের আরাধনায় এই স্থানের দিকপালত্ব লাভ করেছেন।

বহুকাল আগে কশ্যপের এক পুত্র, নাম পূতাত্মা, বিশ্বেশ্বরের রাজধানী বারাণসী ধামে পবনেশ্বর নামে পবিত্র এক মহালিঙ্গ স্থাপন

করে দশলক্ষ বছর ধরে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। উগ্র তপস্যায়, তপস্যার ফলদাতা জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান মহেশ্বর একদিন লিঙ্গ থেকে আবির্ভূত হয়ে প্রসন্নবদনে পূতাত্মাকে বললেন—হে সুব্রত পূতাত্মন্। ওঠ, ওঠ, বর প্রার্থনা কর। দেবাদিদেব মহেশ্বরকে পুলকিত-তনু পূতাত্মা সর্বভূতের নিয়ন্তাকে সুললিত বাক্যবিন্যাসে স্তব-স্তুতি করে বললেন—দেবদেব! আপনার প্রতি আমার যেন মতি থাকে,—এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। ভগবান ভূত-ভবেশ অত্যন্ত প্রীত হয়ে স্বীয় স্বরূপ তাঁর উপর আরোপ করে বললেন—"সর্ব্বগো মম রূপেন সর্ব্বতত্ত্বাববোধকঃ। সর্ব্বেষামায়ুষো রূপং ভবানেব ভবিষ্যতি॥"—মৎস্বরূপে তুমি সর্বতোভাবে অবস্থান কর; তোমার দ্বারাই জীবগণের তত্ত্বজ্ঞান হবে। তুমি সকল জীবের প্রাণরূপে বিরাজ করবে।

জ্যেষ্ঠেশ্বরের পশ্চিমে এবং বায়ুকুণ্ডের উত্তরে কশ্যপ-তনয় পূতাত্মার প্রতিষ্ঠিত পবমানেশ্বর শিবলিঙ্গ মহাদেবের প্রসাদে শিবলোক প্রাপ্তির যথার্থ সোপান।

সেই থেকে পূতাত্মা হলেন দিকপাল—গন্ধবতী পুরীর অধীশ্বর।

গন্ধবতী পুরীর পূর্বে অলকানাম্নী পুরী। এই পুরীর অধিপতি হলেন মহাদেব-সখা কুবের।

গণদ্বয়ের মুখে এই কথা শুনে যার-পর-নাই কুতূহলী হয়ে উঠল শিবশর্মা। কে এই কুবের? কীভাবেই বা তিনি দেবদেব মহাদেবের সঙ্গে সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হলেন?

পুণ্যশীল আর সুশীল বললেন, সে এক অপূর্ব কাহিনী। অবিচল ভক্তি যে কী অসাধ্য সাধন করতে পারে মহাদেবের সঙ্গে কুবেরের সখ্যতাই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

পুরাকালে কাম্পিল্য নগরে সোমযাজী বেদবিদ্যাবিশারদ দীক্ষিত যজ্ঞদত্ত নামে সুপণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। পাণ্ডিত্য এবং সাত্ত্বিকতার গুণে তিনি যেমন ছিলেন রাজানুগৃহীত তেমনি নগরের প্রতিজনই তাঁকে দেখত অসীম শ্রদ্ধার চোখে। গুণনিধি নামে ছিল

তাঁর চন্দ্রকান্তিতুল্য পুত্র। যথাসময়ে পুত্রের উপনয়ন দিয়ে তাঁকে পাঠালেন গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণের জন্য। বিদ্যা যথেষ্টই আয়ত্ত করল গুণনিধি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পিতার অজ্ঞাতসারে দ্যূতকর্মে (জুয়া) আসক্ত হয়ে পড়ল। দিনে দিনে আসক্তি এমন প্রবল হয়ে উঠল, যে ভুলেই গেল সে বংশমর্যাদা, পিতার সম্মান। এমন কি অধীত বিদ্যাও বিস্মৃত হয়ে ক্রমশঃই বেদনিন্দুক হয়ে উঠল। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠতে লাগল দ্যূতকার, আর দুরাচারীর দল। মায়ের কাছ থেকে প্রায় জোর করেই অর্থ-সামগ্রী নিয়ে যেত বন্ধুত্বের মাশুল দিতে। পিতার ত্রিসীমানায় কখনই যেত না। দীক্ষিত যজ্ঞদত্ত ব্যস্ত নানা কাজে। পুত্রের সঙ্গে বিশ্রান্তালাপের সময় তাঁর মোটেই নেই। তবুও মাঝে-মাঝেই ব্রাহ্মণীর কাছে খোঁজ নেন। ব্রাহ্মণীও স্নেহবশতঃ প্রকৃত ঘটনা গোপন রেখে এমন সব কথা বলতেন যাতে যাজ্ঞিক খুশীই হতেন বা আত্মতৃপ্তি পেতেন এই ভেবে যে পুত্র গুণনিধি কালে প্রকৃতই গুণনিধি হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে। ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দিলেও ব্রাহ্মণীর কিন্তু মনস্তাপের শেষ ছিল না। গুণনিধির যখন ষোল বছর বয়স পিতা তার বিবাহ দিয়ে তাকে গৃহস্থও করলেন। জননী অনেক করে তাকে বোঝালেন, মৃদু শাসনও করলেন। কিন্তু প্রবল দ্যূতাসক্ত গুণনিধিকে কোনমতেই আয়ত্তে আনতে পারলেন না। দেখতে-দেখতে উনত্রিশ বছর বয়স হল গুণনিধির। ঘরে রূপে-গুণে বংশমর্যাদায় অতুলনীয়া ষোড়শী স্ত্রী তার। তবুও, মানসিকতা, তার আকৃষ্ট হল না স্ত্রীর প্রতি। ঘরের যাবতীয় দুর্লভ সামগ্রী সে প্রায় জোর করেই নিয়ে যেত দ্যূতক্রীড়ায় আর ফিরে আসত নিঃস্ব হয়ে। নীরবে ব্রাহ্মণী পুত্রের এই অত্যাচার এবং অবিমিশ্র-কারীতা সহ্য করে যেতেন কোপন-স্বভাব দীক্ষিতের ভয়ে আর ধিক্কার জানাতেন ভাগ্যকে।

দীক্ষিত একদিন প্রত্যাগমণ করছেন রাজভবন থেকে। পথিমধ্যে দেখলেন এক সর্বপরিচিত দ্যূতকারের আঙ্গুলে নবরত্নময়ী এক অপূর্ব

আংটি। বিস্মিত হলেন দীক্ষিত—এই আংটি যে তিনিই ব্রাহ্মণীকে দিয়েছিলেন উদ্বন্ধনের (বিবাহের) পর। সেই আংটি এর হাতে এল কীভাবে? জিজ্ঞাসা করলেন দ্যূতকারকে—কোথা থেকে পেলে তুমি এই আংটি? দ্যূতকার বলল—কেন, আপনার ছেলেই ত আজ জুয়া-খেলায় হেরেগিয়ে আমায় এটা দিয়ে গেছে। গতকাল দিয়ে গিয়েছিল তার মায়ের একটা ভাল শাড়ী। আপনার ছেলের মত জুয়াখোর আর দ্বিতীয় নেই। হেরে গিয়ে কত সামগ্রী যে কতজনকে দিয়েছে, তার সীমা নেই। কেন, আপনি এসবের কিছু জানেন না? লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল যাজ্ঞিকের। বস্ত্রাঞ্চলে মুখ-মাথা ঢেকে কোন-রকমে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেই ডাকলেন ব্রাহ্মণীকে। জিজ্ঞেস করলেন—গুণনিধি কোথায়? আর উদ্বন্ধনকালে যে নবরত্নময়ী আংটি তোমায় দিয়েছিলাম, সেটা কোথায়? কোথায় সেই উৎকৃষ্ট রঙীন শাড়ী, দক্ষিণদেশীয় কাংস্যপাত্র, গৌড়দেশীয় তাম্রঘটী, হস্তিদন্ত নির্মিত পালঙ্ক? বহুবিধ অলঙ্কারভূষিত সেই শালভঞ্জিকা পুতুলই বা কোথায় গেল?

পতিসেবার জন্য মধ্যাহ্নকালীন পক্কান্ন সেবনে ব্যস্ত ছিলেন তখন ব্রাহ্মণী। এখনি বুঝি কোন অঘটন ঘটে যায় এই আশঙ্কায় বক্ষস্পন্দন তার দ্রুততর হয়ে উঠল। আহারপর্ব সমাধা হবার পর তিনি এর উত্তর দেবেন; স্বামীকে অনুরোধ জানালেন এই মুহূর্তে শান্ত হতে। কিন্তু স্থির-প্রতিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ! কুল-দূষক কদাচারী পুত্র অপুত্রকেরই সমান। জীবিত হলেও পিতা দীক্ষিতের কাছে সে মৃত। স্বামীর সমীপে সব কিছু গোপন করে রাখার অপরাধে তিনি ব্রাহ্মণীকে ভর্ৎসনা করে বললেন—যাও, তিল, জল আর কুশ নিয়ে এস। যদিও সে আমার একমাত্র পুত্র, তবুও আমার কাছে সে মৃত। তার উদ্দেশ্যে তিলাঞ্জলি দিয়ে নিঃসন্তান হব এবং কুলরক্ষার জন্য আবার দার-পরিগ্রহ করব। এই বলে যাজ্ঞিক সেই দিনই এক শ্রোত্রিয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন। সব শুনে, নিঃস্ব, নিঃসম্বল গুণনিধিও দেশ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল দিক্‌ভ্রান্ত এবং উদ্‌ভ্রান্ত

পথিকের মত। বারবার ধিক্কার দিতে থাকল নিজের অদৃষ্টকে। দেশ-দেশান্তরে ঘোরে গুণনিধি; ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্রমশঃই কাতর হয়ে পড়ে। এমন কোন বিদ্যা তার আয়ত্তে নেই, যা দিয়ে সে উপার্জন করতে পারে। ভিক্ষা করতেও শেখেনি। নির্বান্ধব দেশান্তরে এমনি যখন ক্ষুধার জ্বালায় কাতর গুণনিধি, হঠাৎ দেখল শিবরাত্রি-ব্রতোপবাসী একজন শিবভক্ত শিবপূজা করার জন্য পক্কান্নের উপচার নিয়ে বের হল নগর থেকে। তাই দেখে এবং পক্কান্নের আঘ্রাণে উৎফুল্লিত হয়ে ভাবল—শিবপূজা হয়ে যাবার পর রাত্রে এই অন্ন আমি গ্রহণ করব। এই মনস্থ করে গুণনিধি তার পশ্চাদনুসরণ করল। মন্দিরে উপবেশন করে সে দেখল ভক্তের পূজা। নৃত্য-গীত শেষে যখন ক্ষণকালের জন্য ভক্ত নিদ্রাগত হল, সেই অবসরে উপচার নেবার জন্যে গুণনিধি প্রবেশ করল গর্ভমন্দিরে। প্রায় নিষ্প্রভ দীপের আলোয় ভালভাবে কিছু দেখা যাচ্ছে না দেখে, নিজের বস্ত্রাঞ্চল ছিঁড়ে সলিতা করে দীপশিখাকে উজ্জ্বল করে তুলল। তারপর পক্কান্ন গ্রহণ করে ত্বড়িৎ পদে যেই মন্দির থেকে বের হতে যাবে, পদতলাঘাতে তার জেগে উঠল একজন এবং চীৎকার করে উঠল 'চোর' 'চোর' বলে। সঙ্গে সঙ্গে পুররক্ষকেরা ধরে ফেলে তাকে এমন প্রহার করল, যে সেই আঘাতেই সে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হল। পক্কান্ন গ্রহণে উদরপূর্তীর অবকাশও পেল না।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যমকিঙ্করেরা এসে তাকে পাশবদ্ধ করল কুলাঙ্গার, ইন্দ্রিয়াসক্ত গুণনিধিকে যমপুরীতে নিয়ে যাবার জন্যে। ঠিক সেই সময়েই কিঙ্কিণীজাল শোভিত দিব্য-বিমান নিয়ে গুণনিধিকে নিয়ে যাবার জন্যে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন শিবদূতেরা। তাদের দেখে সম্ভ্রমে নতশির হল যমকিঙ্করেরা। বিস্মিত হল এই ভেবে, কী এমন ধর্মকর্ম, পুণ্য গুণনিধি করেছে যে সে যাবে শিবলোকে। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকাণ্ডহীন, দ্যূতাসক্ত, মদ্যপায়ী, দুঃশ্চরিত্র, তদুপরি শিব-নির্মাল্য যারা দান করে, তাদের যে স্পর্শ করে, লঙ্ঘন করে বা শিব-নির্মাল্য

যে ভোজন করে, তাদের উপযুক্ত স্থানই হল যমপুরী। কিন্তু ধর্মের গূঢ়তত্ত্বের দ্বারা শিবদূতেরা যমকিঙ্করদের ভ্রান্তি অপনোদন করে বললেন,—তোমরা শুধু ঐগুলিই দেখেছ। দেখনি কী, নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে গর্ভগৃহের দীপ-বর্তিকা উজ্জ্বল করে দিয়েছিল; ভক্তেরা বিধিসহকারে যে পূজা করেছিল, অনন্যচিত্ত হয়ে সে তা নিরীক্ষণ করেছিল, ক্ষুধার জ্বালা সত্ত্বেও; শোননি কী তার মুখে শিবনাম। এই সব শুনে যমকিঙ্করেরা শূণ্যহাতে ফিরে গেল।

শিবলিঙ্গের উপরে, বিশেষ করে দীপবর্তিকা প্রজ্বলনের মহাপুণ্যে সেই গুণনিধি জন্মান্তরে দম-নামে কলিঙ্গাধিপতি অরিন্দমের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। পিতা অরিন্দমের মৃত্যুর পর দম পিতৃ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েই গ্রামাধিপদের ডেকে তাঁর আদেশ জানিয়ে দিলেন—'যস্ত যস্যাভিতো গ্রামং যাবন্তশ্চ শিবালয়াঃ॥ তত্র তত্র সদা দীপো দ্যোতনীয়োঽবিচারিতম্। মমাজ্ঞাভঙ্গদোষেণ শিরশ্ছেৎ-স্যাম্যসংশয়ম্।'—নিজ নিজ গ্রামে যত শিবমন্দির আছে, অবিচারিত-ভাবে প্রতি শিবালয়ে রাত্রে দীপ দান করবে। আমার এই আদেশ যে লঙ্ঘন করবে সে দণ্ডনীয় হবে, যে প্রতিপালন করবে না, তার শিরশ্ছেদ হবে।

ভয়ে প্রতি শিবালয়ে দীপ জ্বলতে শুরু করল। আর নিজেও সংস্কারবলে দীপদান ছাড়া অন্য কিছু জানতেন না বলে, জীবনব্যাপী অসংখ্য দীপ দান করেছিলেন। সেই পুণ্যবলে মহাদেবের প্রসাদে তিনি দিকপতিরূপে এই অলকাপুরীর আধিপত্য লাভ করেছিলেন।

এরপর গণদ্বয় শিবশর্মাকে বললেন, কিরূপে কুবের মহাদেবের পরম মিত্রত্ব লাভ করেছিলেন। পাদ্ম নামক পূর্বকল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্যের বিশ্বশ্রবা নামে এক পুত্র ছিল। সেই বিশ্বশ্রবার পুত্র হল বৈশ্রবণ। এই বৈশ্রবণ উগ্র তপস্যার বলে মহাদেবকে প্রসন্ন করে বিশ্বকর্মার-নির্মিত এই অলকাপুরীর আধিপত্য লাভ করেছিলেন। অনন্তর পাদ্মকল্প অতীত হলে মেঘবাহনকল্পে যজ্ঞদত্তের পুত্র ধনদ মহাদেবের উদ্দেশ্যে দীপদানের তুল্য আর কোন

ব্রত নেই অবগত হয়ে তপস্যার জন্য এলেন বিশ্বেশ্বরের পুরী কাশীধামে। সেখানে একটি শম্ভুলিঙ্গ স্থাপন করে মহাদেবের সঙ্গে অভিন্নতারূপ দীপাধারে অমলা ভক্তিরূপ ঘৃত ঢেলে, হৃদয়রূপ রত্নদীপের বর্তিকায় তপস্যারূপ অগ্নি প্রজ্বলিত এবং নিশ্চল ধ্যানরূপ তেজ আর নির্মল জ্ঞানরূপ নির্মল জ্যোতি বিকীরণ করে তপস্যা করলেন দশলক্ষ বৎসর। প্রাণবায়ুর অবরোধে নির্বাত ধনদ হলেন অস্থিচর্মসার। এমনি এক সময়ে বিশালাক্ষী দেবীকে নিয়ে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর আবির্ভূত হলেন সেখানে। ধ্যানভঙ্গ হল তপস্বীর। কোটি সূর্যাধিক প্রভায় দেদীপ্যমান উমাপতি বিশ্বনাথের দিকে নিমেষমাত্র তাকিয়েই আর চেয়ে থাকতে না পেরে চক্ষু নিমীলন করে প্রার্থনা জানালেন—হে দেব, আমাকে দৃষ্টি-সামর্থ্য দিন, যাতে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে পারি। দেবদেব উমাপতি করতল-স্পর্শে তাঁকে দৃষ্টি-সামর্থ্য দান করতেই তপস্বী প্রত্যক্ষ করলেন। উমাকে দেখে তাঁর দিকে নির্ণিমেষ লোচনে তাকিয়ে ধনদ বারবার ভাবতে লাগলেন—কে এই অপরূপা রমণী। আহা কী রূপ! কী প্রেম! কী শ্রী! কী সৌভাগ্য! এমনিভাবে যখন দেখছেন আর ভাবছেন তপস্বী, তাঁর বাম চোখ বিনষ্ট হয়ে গেল। তবুও তিনি তাকিয়ে রইলেন একচোখে। তপস্বীকে তদবস্থায় দেখে ঈষৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উমা অভিযোগ জানালেন মহাদেবকে। শুনে ঈষৎ হেসে পার্বতীকে মহাদেব বললেন—ভুল ভেব না পার্বতী। তপস্বী তোমার রূপ-সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নয়। বলতে পার, তোমার তপৈশ্বর্যের প্রতি অসূয়া-সম্পন্ন। উমা, ঐ তপস্বী তোমার পুত্র। তারপর তিনি যজ্ঞদত্ত-তনয়কে সন্তুষ্টচিত্তে বললেন—"নিধীমামধিনাথস্তং গুহ্যকানাং ভবেশ্বরঃ॥ যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ রাজা রাজ্ঞাঞ্চ সুব্রত। পতিঃ পুণ্যজনানাঞ্চ সর্ব্বেষাং ধনদো ভব॥ ময়া সখ্যঞ্চ তে নিত্যম্ বৎস্যামি চ তবান্তিকে। অলকাং নিকষা মিত্র তব প্রীতি বিবৃদ্ধয়ে॥' (১৫৫-৫৭)—তুমি নিধিসমূহ আর গুহ্যকগণের ঈশ্বর হও। হে সুব্রত! যক্ষ, কিন্নর

আর রাজগণের অধিপতি হও। তুমি হবে পুণ্যজনের গতি আর সর্বজীবের ধনদাতা। আমার সঙ্গে তুমি সখ্যতার বন্ধনে বদ্ধ হলে। মিত্র, তোমার প্রীতিবৃদ্ধির জন্য আমি সর্বদাই তোমার অলকাপুরীর কাছেই থাকব।—এখন ওঠ, এই দেবী পার্বতী তোমার জননী। এঁর প্রসাদ লাভ কর। দেবীও অলকেশকে এই বলে বর দিলেন—মহাদেবে তোমার ভক্তি নিশ্চলা হক। হে পুত্র! বামনেত্র নষ্ট হওয়ার জন্য তুমি 'একলিঙ্গ' নামে খ্যাত হবে আর যেহেতু আমার রূপের প্রতি তুমি ঈর্ষাপ্রযুক্ত হয়েছিলে, তাই তুমি পরিচিত হবে 'কুবের' নামে। তোমার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ কুবেরেশ্বর লিঙ্গরূপে সাধকগণের সিদ্ধিদাতা হবে।

এইভাবে বর প্রদান করে মহেশ্বর দেবী পার্বতীকে নিয়ে বিশ্বেশ্বরের পরমধামে অন্তর্হিত হলেন।

[অধ্যায় ১৪]

এই অলকাপুরীর পুরোভাগে ঈশানপুরী। একেই বলে রুদ্রপুর। স্মরণে-মননে সর্বদা যাঁরা শিব-পরায়ণ, যাঁরা সব কিছু শিবপদে সমর্পণ করে স্বর্গাভিলাষী হয়ে নিশ্চল তপস্যা করেছেন, তাঁরাই এই রমণীয় রুদ্রপুরে রুদ্ররূপে অবস্থিত। ঈশানেশ্বরের অনুকম্পায় ত্রিশূলধারী, জটাজুটমণ্ডিত অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন প্রভৃতি একাদশ রুদ্র একত্রচারী এবং ঈশানদিকের অধিপতি হয়ে এই পুরে থেকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে আটটি পুরকে রক্ষা করছেন, সেই সঙ্গে শিবভক্তদের অভিলষিত বর প্রদান করছেন। কিন্তু, হে দ্বিজ শিবশর্মা! এই একাদশ রুদ্রকেও কিন্তু ঈশানেশ্বরের অনুকম্পা লাভের জন্য বারাণসীতে ঈশানেশ নামে লিঙ্গ স্থাপন করে সুকঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল। এই কথা বলে গণদ্বয় ঈশানেশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে বললেন—'ঈশানেশং সমর্ভ্যর্চ্চ্য কাশ্যাং দেশান্তরেষপি॥

বিপন্নাস্তেন পুণ্যেন জায়ন্তেঽত্র পুরোহিতাঃ।' কাশীতে ঈশানেশের অর্চনা করে দেশান্তরে দেহান্ত হলেও, সেই পুণ্যবলে তিনি এখানে পুরোহিতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন।

বিষ্ণুর গণদ্বয় পুণ্যশীল আর সুশীলের মুখ থেকে এইসব মনোরম কথা শুনতে-শুনতে এগিয়ে চলেছে ব্যোমপথে শিবশর্মার বিমান। দেখল, স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত এক মায়াময় জগৎ। সমস্ত ইন্দ্রিয় তার যেন পুলকে উৎফুল্লিত হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করল—এটি কোন্ লোক ?

গণদ্বয় বললেন—'শিবশর্ম্মন্ মহাভাগ লোক এষ কলানিধেঃ। পীযূষবর্ষিভির্যস্য করৈরাপ্যাযতে জগৎ।'—হে মহাভাগ শিবশর্মা, যাঁর অমৃতবর্ষী কিরণসমূহের দ্বারা সমস্ত জগৎ আনন্দিত, এই সেই চন্দ্রলোক।

পুণ্যশীল এবং সুশীল এরপর শিবশর্মাকে শোনালেন দ্বিজরাজ চন্দ্রের বিবরণ।

পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির মানসে এক পুত্র উৎপন্ন করলেন। সেই পুত্র ছিলেন মনসিজ (অর্থাৎ মনে মনে সঙ্কল্প করা মাত্রই জাত।) তিনি হলেন অত্রিমুনি। আমরা শুনেছি, তিনি দিব্য পরিমাণে তিন হাজার বছর দুশ্চর তপস্যা করেছিলেন। সেই সময় তাঁর রেতঃ ঊর্ধ্বগামী হয়ে সোমরূপে পরিণত হয়ে দুই নেত্র দিয়ে নির্গত হয়। বিধাতার আদেশে দশটি দেবী সেই দুরন্ত তেজসম্পন্ন রেতঃ গ্রহণ করল। কিন্তু গর্ভধারণে অসমর্থ হলে সোম পৃথিবীতে নিপতিত হল। ব্রহ্মা সোমকে নিপতিত দেখে, তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর দিব্য বিমানে তুলে নিলেন। তারপর সাগরান্ত পৃথিবীকে একুশবার প্রদক্ষিণ করলেন। এই সময় ভূতলে তাঁর যতটুকু তেজ ক্ষরিত হয়েছিল, তা-ই ওষধিরূপে হল পৃথিবীর পোষক।

এরপর সোম ব্রহ্মতেজে বর্ধিত হয়ে এলেন পরম পবিত্র অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীধামে। সেখানে সোম অমৃতোদ-নামে একটি কূপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার জলে স্নান করলে মানুষ অজ্ঞান-অন্ধকার মুক্ত হয়

আর চন্দ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করে অনন্য-মনে শতপদ্মসংখ্যা (একশ' কোটি বছরে এক পদ্মসংখ্যা) পরিমিত বৎসর তপস্যা করেছিলেন। দেবদেব প্রীত হয়ে জগৎ-জীবনদায়িনী চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কলা নিজ মস্তকে ধারণ করলেন। দক্ষশাপে মাসান্তে চন্দ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও এই কলার দ্বারাই পুনরায় পূর্ণতা লাভ করে থাকেন। তাই নয়, তাঁরই প্রসাদে তিনি বীজ, ওষধি এবং জল ও ব্রাহ্মণদের উপর অধিপত্যের অধিকার পেয়েছিলেন। চন্দ্র চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের সামনে শুধু দুষ্কর তপস্যা নয়, শত সহস্র দক্ষিণা-সহকারে রাজসূয় যজ্ঞ-ও করেছিলেন। সেই যজ্ঞে ঋত্বিক হয়েছিলেন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, অত্রি আর ভৃগু মুনি আর সদস্য হয়েছিলেন স্বয়ং হরি, বহুমুনি পরিবৃত হয়ে। সেবা করেছিলেন সিনীবালি, কুহু, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্তি, ধৃতি আর লক্ষ্মী। দেবী উমার সঙ্গে রুদ্র পরিতুষ্ট হয়ে, সোমমূর্তি শম্ভুর বেশে দেব চন্দ্রকে 'সোম' নামে ভূষিত করে এই বর দিয়েছিলেন: 'তং মমাস্য পরা মূর্তিরিত্যুক্তস্তত্তপোবলাৎ। জগত্তবোদয়ং প্রাপ্য ভবিষ্যতি সুখোদয়ম্।। তৎ পীযূষময়ৈর্হস্তৈঃ স্পৃষ্টমেতচ্চরাচরম্। ভানুতাপপরীতঞ্চ পরাং গ্লানিং বিহাস্যতি।। (৩৮-৩৯)—ত্রৈলোক্যের আনন্দের জন্য তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ মূর্তি, সমস্ত জগৎ তোমার উদয়ে সুখী হবে। তপন তাপে তাপিত এই বিশ্বচরাচর, তোমার অমৃতবর্ষী কিরণস্পর্শে শীতল হবে। মহাদেব এই বলে চন্দ্রকে আরও বর দিলেন—যে স্থানে তুমি আমার নামে চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছ, এটি হল সেই সিদ্ধ যোগীশ্বরী পীঠ যেখানে সুর, অসুর, গন্ধর্ব, নাগ, বিদ্যাধর, রাক্ষস, গুহ্যক, যক্ষ, কিন্নর এবং নরলোকের সপ্তকোটি সিদ্ধ সিদ্ধি লাভ করেছে। পরম গুহ্য এই সিদ্ধপীঠে তপস্যা করে তুমিও সেই সুদুর্লভ সিদ্ধি লাভ করেছ। তোমার প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রোদ-কূপ চন্দ্রোদ তীর্থরূপে গয়াতীর্থের সমতুল ফল প্রদানকারী হয়ে থাকবে।

এই সব বর প্রদান করে দেবদেব মহেশ্বর কাশীপুরীতে অন্তর্হিত হলেন।

ভ্রমণশ্রমহারী মনোরম কাহিনী শুনতে-শুনতে বিষ্ণুর দুই গণ পুণ্যশীল আর সুশীলের সঙ্গে শিবশর্মা চন্দ্রলোক অতিক্রম করে এল নক্ষত্রলোকে।

[অধ্যায় ১৫]

মুনিবর অগস্ত্য সহধর্মিণী লোপামুদ্রাকে বলে চলেছেন দ্বিজ শিবশর্মার সেই বিচিত্র কাহিনী। গণদ্বয়ের বর্ণিত লোক-লোকের বর্ণনা কৌতূহলী করে তুলেছে লোপামুদ্রাকেও।

নক্ষত্রলোকের দর্শনমাত্রেই জিজ্ঞাসু শিবশর্মাকে গণদ্বয় বললেন—

পুরাকালে সৃষ্টি-অভিলাষী ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ-পৃষ্ঠ হতে প্রজা-সৃষ্টিতে নিপুণ দক্ষ নামে এক প্রজাপতি উৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর তপস্যার ফলে রোহিনী প্রভৃতি ষাটটি অপরূপা কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা কাশীতে গিয়ে সঙ্গমেশ্বরের কাছে নক্ষত্রেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে সহস্র দিব্য-বৎসর সোমমূর্তি মহাদেবের কঠোর তপস্যা করেছিল, যা ছিল পুরুষেরও দুঃসাধ্য। বিশ্বেশ্বর মহাদেব তাদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দর্শন দিয়ে বললেন—তোমরা নারী হয়েও পুরুষেরও অসাধ্য যে সুকঠোর তপস্যা করেছ, তার জন্যে তোমরা স্ত্রী হয়েও ইচ্ছাধীন পুরুষ-মূর্তি ধারণ করতে পারবে এবং 'নক্ষত্র' নামে অভিহিত হয়ে চন্দ্রলোকের উপরে অবস্থান করবে। তারকারাজির কাছে তোমরা হবে মাননীয়া মেষাদি রাশিগণের উত্তম উৎপত্তি স্থান। দক্ষতনয়ারা বলল—দেব, আপনি যদি প্রীতই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের এই অভিলাষ পূরণ করুন, যে আমরা যেন আপনার তুল্য রূপবান, আপনার তুল্য ভবতাপহারী পতি লাভ করি।

বিশ্বেশ্বর তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে বললেন—'ঔষধীনাং সুধায়াশ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ যঃ পতিঃ। পতিমত্যো ভবত্যোঽপি তেন পত্যা

শুভাননাঃ॥'—হে শুভাননা, যিনি ওষধি, সুধা এবং ব্রাহ্মণগণের পতি (সেই দেব চন্দ্র), তোমাদের পতি হবেন।

বিশ্বেশ্বরের আদেশে একমাত্র নক্ষত্র-পূজক, নক্ষত্র-ব্রতচারীরাই এই নক্ষত্রলোকের অধিবাসী হবার যোগ্য আর কাশীতে যারা নক্ষত্রেশ্বরের দর্শন করবে, তাদের যাবতীয় গ্রহবৈগুণ্য দূর হয়ে যাবে।

গণদ্বয়ের মুখে নক্ষত্রলোকের বিবরণ শুনতে-শুনতে শিবশর্মার নয়নপথে আবদ্ধ হল বুধলোক।

পুণ্যশীল এবং সুশীল শিবশর্মাকে শোনালেন বুধের জন্মবৃত্তান্ত।

অত্রি মুনির নয়নোৎপন্ন পুত্র, ব্রহ্মার পৌত্র, সমস্ত ওষধি এবং জ্যোতিঃসমূহের অধিপতি দ্বিজরাজ চন্দ্র, স্বয়ং মহাদেব স্বীয় উত্তমাঙ্গে যাঁর একটি কলা ধারণ করেছেন, সেই দেব চন্দ্র ঐশ্বর্য্যমদে একবার এমনি মত্ত হয়ে উঠেছিলেন যে স্বীয় পুরোহিত, গুরু এবং নিজ পিতৃব্য অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির পত্নীকে কামাসক্ত হয়ে একবার হরণ করেছিলেন। বৃহস্পতির পত্নী তারা ছিলেন অপরূপা সুন্দরী। দেবতা এবং ঋষিরা বারবার চন্দ্রকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু একদিকে কামাসক্তি যাকে একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব ছাড়া আর কারও পক্ষে জয় করা অসম্ভব, তার উপর ঐশ্বর্য্যমদমত্ততা চন্দ্রকে এমনিভাবে গ্রাস করেছিল যে তিনি তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন।

দেবতারা সকলে বারবার অনুরোধ জানালেন চন্দ্রকে, দেবগুরু বৃহস্পতিকে তিনি যেন অবিলম্বে তারাকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু চন্দ্র তাদের অনুরোধে কর্ণপাত না করে ভোগাসক্তির প্রাবল্যে ভেসে গেলেন।

যখন কোন কিছুই চন্দ্রকে সংযত করতে পারল না, তখন রুদ্রদেব তাঁর সুবিখ্যাত 'অজগব' নামে ধনু তুলে ধরলেন চন্দ্রের দিকে। চন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-আক্রমণ করলেন মহাদেবকে 'ব্রহ্মশির' নামে মহাস্ত্র নিক্ষেপ করে। ফলে সুরু হল তুমুল যুদ্ধ। শেষে তারকাময় সেই যুদ্ধ এমনি প্রলয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে অকালে

পৃথিবী বুঝি ধ্বংস হয়ে যায়। স্বয়ং বিধাতা ব্রহ্মা তখন সম্বর্ত নামক রুদ্রকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করে, চন্দ্রের কাছ থেকে তারাকে উদ্ধার করে বৃহস্পতিকে সমর্পণ করলেন। বৃহস্পতি তারাকে গর্ভবতী দেখে যথেষ্ট ধিক্কার জানালেন পত্নীকে। ঈষিকা কাশ তৃণরাশিতে তারা সেই গর্ভ ত্যাগ করতেই ভূমিষ্ঠ হন দেবকান্তি-বিশিষ্ট এক-পুত্র। দেবশ্রেষ্ঠগণ সংশয়িত-চিত্তে তারাকে জিজ্ঞেস করলেন—সত্য করে বল, এ পুত্র কার ঔরসজাত? লজ্জায় তারা কিছু না বলে অধোবদন হয়ে রইলেন। সদ্যজাত অমিততেজা সেই বালক গর্ভধারিণীকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হতেই স্বয়ং ব্রহ্মা তাকে নিবৃত্ত করে তারাকে যখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তারা তখন জানালেন—এ পুত্র চন্দ্রের। ব্রহ্মা নবজাতকের মস্তক আঘ্রাণ করে তার নাম রাখলেন 'বুধ'।

বুধ এরপর পিতা সোমের অনুমতি নিয়ে কাশীতে গিয়ে 'বুধেশ্বর' মহালিঙ্গ স্থাপন করে চন্দ্রশেখর মহাদেবের ধ্যানে মগ্ন হলেন। তপস্যায় অযুত বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর বিশ্বভাবন মহাদেব মহালিঙ্গ হতে আবির্ভূত হয়ে বুধকে বর যাচ্ঞা করতে বললেন। পিণাকপানি মহাদেবের দর্শনে উৎফুল্লিত বুধ স্তুতিবাক্যে দেবদেবকে প্রীত করে শুধু বললেন—আপনি আমাকে এই বর দিন, যেন আপনার চরণকমলে আমার একান্ত ভক্তি থাকে।

পরিতুষ্ট মহাদেব বললেন—'রৌহিণেয় মহাভাগ সৌম্য সৌম্য-বচোনিধি। নক্ষত্রলোকাদুপরি তব লোকো ভবিষ্যতি। মধ্যে সর্ব্বগ্রহাণাঞ্চ সপর্য্যাং লপ্সসে পরাম্॥ ত্বয়েদং স্থাপিতং লিঙ্গং সর্ব্বেশং বুদ্ধিদায়কম্। দুর্ব্বুদ্ধিহরণং সৌম্য স্বল্লোকবসতিপ্রদম্॥ (৬০-৬২)।—হে রৌহিণেয়! হে মহাভাগ! হে সৌম্য, সৌম্য-বচোনিধে! নক্ষত্রলোকের উপরে হবে তোমার লোক। গ্রহগণের মধ্যে তুমি উৎকৃষ্টতররূপে সম্মানিত হবে। আর তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গ হবে সকলের বুদ্ধি-প্রদানকারী, দুর্বুদ্ধি-হরণকারী। ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিরাই হবে তোমার লোকের অধিবাসী।

এই বর প্রদান করে ভগবান শম্ভু লিঙ্গ মধ্যে অন্তর্হিত হলেন।

সেই থেকে কাশীতে চন্দ্রেশ্বরের পূর্বে অবস্থিত বুধেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করলে অন্তিমকালেও জীব বুদ্ধিভ্রংশ হয় না।

[অধ্যায় ১৬]

বুধলোক অতিক্রম করে শিবশর্মাকে নিয়ে বিষ্ণুর-গণদ্বয় পুণ্যশীল এবং সুশীলের বিমান উপস্থিত হল শুক্রলোকে।

গণদ্বয় শিবশর্মার সঙ্গে এই লোকের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—এই লোকটি হল দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের। শুক্রাচার্যের অপর এক নাম হল ভার্গব। ইনি সুকঠোর তপস্যা করে মহাদেবের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা, যা স্বয়ং মহাদেব, পার্বতী, কার্তিক এবং গণেশ ছাড়া এমন কি দেবগুরু বৃহস্পতিও জানতেন না।

দুর্ভেদ্য গিরিব্যূহ এবং বজ্রব্যূহের দুই অধিনায়ক—অন্ধক এবং অন্ধকরিপু। দুই জনের মধ্যে একবার তুমুল সংগ্রাম শুরু হলে দানবরাজ অন্ধকের মহা-মহা যোদ্ধারা, যারা দৈত্যগুরুর কৃপায় সানুচর রুদ্র ও উপেন্দ্রেরও ত্রাস; ভূপাতিত হতে লাগল। তাই দেখে অন্ধক যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে শরণাপন্ন হল গুরুদেব শুক্রাচার্যের কাছে। প্রার্থনা—তিনি যেন তাঁর লব্ধ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে তাদের সমূহ-সর্বনাশ থেকে উদ্ধার করেন। শিষ্যের প্রার্থনায় দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সেই বিদ্যা প্রয়োগ করতেই হুণ্ড, তুহণ্ড, কুজম্ভ, পাক, চন্দ্রদমন প্রভৃতি নিপতিত দানব-বীরেরা যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জেগে উঠল এবং দানব সৈন্যেরা জলপূর্ণ মেঘরাশির মত গর্জন তুলে পুনরায় বিপুল বিক্রমে প্রমথ সৈন্যদের আক্রমণ করল।

যুদ্ধস্থলে হতবাক প্রমথ সৈন্যদের নির্বিশেষ নিহত হতে এবং

শুক্রাচার্যের এই অদ্ভুত কর্ম দেখে শিলাদ-তনয় নন্দী তৎক্ষণাৎ মহাদেবের কাছে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করে বললেন—"যদি হ্যসৌ দৈত্যবরান্নিরস্তান সঞ্জীবয়েদত্র পুনঃপুনস্তান্। জয়ঃ কুতো নো ভবিতা মহেশ গণেশ্বরানাং কুত এবং শান্তিঃ॥" (৩২)—হে মহেশ! ইনি (শুক্রাচার্য) যদি বারবার বিনাশপ্রাপ্ত দৈত্যগণের জীবন দান করতে থাকেন, তাহলে কিভাবে এই যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করব আর প্রমথগণেরাই বা শান্তি পাবে কোথা থেকে?

গণশ্রেষ্ঠ প্রিয় নন্দীর কথা শুনে মহাদেব তাঁকে বললেন—"নন্দিন, প্রযাহি ত্বরিতোঽতিমাত্রং দ্বিজেন্দ্রবর্য্যং দিতিনন্দনানাম্। মধ্যাৎ সমুদ্ধৃত্য তথানয়াংশু শ্যেনো যথা লাবকমণ্ডজাতম্॥ (৩৪)—নন্দী, শ্যেনপক্ষী যেভাবে লাবক-শাবককে নিয়ে যায়, তুমি এক্ষুনি গিয়ে ঠিক সেইভাবে দানবদের মধ্যস্থল হতে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে এখানে নিয়ে এস। মহাদেবের আদেশ পাবামাত্র সিংহ-গর্জনে ধাবমান হলেন সেখানে, যেখানে পাশ, অসি, বৃক্ষ, উপল প্রভৃতি আয়ুধ হস্তে দানবগন দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে রক্ষা করছিলেন তাদের গুরুদেবকে। তাদের পরাস্ত করে গণশ্রেষ্ঠ নন্দী গমনোদ্যত হতেই তাঁকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হতে থাকল বজ্র, শূল প্রভৃতি মারাত্মক দানব-অস্ত্রশস্ত্র। নন্দীও মুখনিসৃত অগ্নির সাহায্যে সেগুলি দগ্ধ করে, দানবসৈন্যকে মথিত করে স্খলিত-বেশ, বিচ্যুত-ভূষণ, বিমুক্ত-কেশরাশি শুক্রাচার্যকে নিয়ে উপস্থিত হলেন মহাদেবের সামনে। দেবদেব মহাদেবও মুখব্যাদন করে ফলভক্ষনের ন্যায় শুক্রাচার্যকে উদরসাৎ করলেন।

শুক্রাচার্য এইভাবে হৃত হওয়ায় ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়ল দানব-সেনারা। অপরদিকে কুলগুরুকে রক্ষা করতে না-পারার ধিক্কারে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল দানব অন্ধক। সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল অন্ধক—যোগিব্যক্তিরা কর্মবিপাক হতে যেমন জীবাত্মাকে মুক্ত করে আমিও তেমনি ইন্দ্রাদি দেবগণের সঙ্গে এই প্রমথ সেনাদের নিহত

করে আমাদের গুরুকে মুক্ত করে আনবই। উৎসাহিত করে তুলল সেনাদের। শুরু হল তুমুল সংগ্রাম,—গগনবিদারী শব্দ, অস্ত্রের ঘর্ষণ, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহতি,—হতাহতের আর্তনাদ—যেন সে এক প্রলয়কালীন সংগ্রাম। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে চলেছে এমনি ঘোরতর সংগ্রাম, তখন মহাদেবের উদরস্থিত ভার্গব মুনি কোনরকমে নিষ্ক্রান্ত হবার পথ খুঁজতে লাগলেন দেবদেবের উদর মধ্যে। খুঁজে বেরালেন একশ বছর ধরে। দেখলেন, মহাদেবের দেহমধ্যে সপ্তলোক, পাতালসমূহ, ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইন্দ্র, অপ্সরাগণের বিচিত্র আলয়; দেখলেন প্রমথাসুরের সেই ঘোরতর যুদ্ধ, কিন্তু এমন কোন ছিদ্র দেখতে পেলেন না, যে পথে তিনি নিষ্ক্রান্ত হতে পারেন। তিনি তখন শাম্ভব-যোগবলে বীর্যরূপ (শুক্র) ধারণ করে মহাদেবের উদর থেকে নির্গত হয়ে প্রণাম জানালেন মহাদেবকে। উদরস্থাৎ হওয়া সত্ত্বেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ জীবিত আছেন দেখে প্রীত মহাদেব তাঁকে বললেন—"শুক্রবনিঃশৃতো যস্মাত্তস্মাত্ত্বং ভৃগুনন্দন। কর্ম্মণানেন শুক্রস্তং মম পুত্রোঽসি গম্যতাম্" (৭৬)—হে ভৃগুনন্দন! তুমি শুক্ররূপে আমার জঠর হতে নির্গত হলে, তাই তোমার নাম হল 'শুক্র' আর তুমি হলে আমার পুত্রস্বরূপ। এখন যাও।

মহাদেবের উদরমধ্য হতে এইভাবে বিনিষ্ক্রান্ত হয়ে ভার্গব দানব-সেনামধ্যে ফিরে এলে আশ্বস্ত হল দানব-সেনারা আর তদবধি ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য নামেই অভিহিত হলেন।

এই ভৃগুনন্দন বহুকাল আগে বারাণসী ধামে গিয়ে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, তার সামনে এক কূপ নির্মাণ করে প্রভু বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। রাজচম্পক, ধুতুরা, পদ্ম, কদম্ব, নাগকেশর, বিল্ব, চম্পক প্রভৃতি শত-সহস্র পত্র-পুষ্প দিয়ে পূজা করতেন মহাদেবকে। দ্রোণপরিমিত (এক কমণ্ডলু) পঞ্চামৃত আরও নানা সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে লক্ষবার মহাদেবকে স্নান করিয়ে, চন্দন প্রভৃতি অঙ্গে লেপন করে নৃত্য, গীত, বেদোক্ত স্তুতি-র দ্বারা পাঁচহাজার বছর তপস্যা করেও যখন মহাদেবের দর্শন পেলেন না,

তখন ইন্দ্রিয়-সংযম এবং চিত্ত-সংহত করে আর কর্ণধূম পান করে মহাদেবের ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন। এইভাবে আরও একহাজার বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর বিরূপাক্ষ মহাদেব দর্শন দিয়ে বললেন,- হে তপোনিধে ভার্গব। বর চাও। পুলকিত ভার্গব বন্দনা করলেন মহাদেবকে তাঁর অপূর্ব অষ্টমূর্ত্যষ্টক স্তোত্র দিয়ে, বারবার আভূমি প্রণত হতে থাকলেন। তখন মহাদেব তাঁর বাহুদ্বয় ধরে তাঁকে সন্নিকটে এনে বলেছিলেন,—তোমার কঠোর তপস্যা, অবিমুক্ত ক্ষেত্রে লিঙ্গ-স্থাপন, আরাধনা, নিশ্চল ও অনন্যসুলভ আচরণ তোমাকে আমার পুত্রত্বের অধিকার দিয়েছে। তুমি এই শরীরেই আমার দেহে প্রবিষ্ট হয়ে আমার বরে ইন্দ্রিয় পথে নির্গত হয়ে সে অধিকার অর্জন করবে। এছাড়াও প্রীত আমি তোমাকে আরও বর দিচ্ছি, যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আমি তপোবলে নির্মাণ করেছি, যা ব্রহ্মাকেও আমি দিই নি, তা আমি তোমায় দিলাম। যে মৃতকে উদ্দেশ্য করে তুমি এই বিদ্যা প্রয়োগ করবে, সে-ই পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। আর সূর্য, অগ্নি ও তারাগণ হতেও অধিক তেজসম্পন্ন সর্বশুভগ্রহ-রূপে তুমি আকাশে দেদীপ্যমান থাকবে।

বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে ভার্গব-প্রতিষ্ঠিত এই শুক্রেশ্বর লিঙ্গের যারা ভক্তিসহকারে অর্চনা করে, একমাত্র তারাই এই শুক্রলোকে এসে অবস্থান করতে পারে।

[অধ্যায় ১৭]

শুক্রলোক অতিক্রম করতেই শিবশর্মা দেখলে আর একটি অপূর্ব লোক। বিষ্ণুর গণদ্বয় পরিচয় করিয়ে দিলেন শিবশর্মাকে এই লোকটির সঙ্গে। বললেন, এটি হল ভূমিপুত্র মঙ্গলের লোক। ইনি কি ভাবে 'মহীসুত' খ্যাতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, শুনুন। পুরাকালে মহাদেব একবার দাক্ষায়ণীর বিরহে উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

সেই সময় তপস্যাক্লিষ্ট মহাদেবের কপাল হতে স্বেদবিন্দু নির্গত হয়ে ভূমিতে পড়েছিল। তা থেকে জন্ম-পরিগ্রহ করল এক লোহিতাঙ্গ পুত্র। আর ধরণী ধাত্রী-রূপে সেই পুত্রকে লালন-পালন করেছিল। তাই মঙ্গল খ্যাত হয়েছিলেন 'মহীসুত'-রূপে। এই মহীসুত একবার ত্রিলোকের মুক্তিদাত্রী অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীতে গিয়ে কম্বলাশ্বতর লিঙ্গদ্বয়ের উত্তরে পঞ্চমুদ্রাময় মহাস্থানে একটি লিঙ্গ স্থাপন করে উগ্র তপস্যায় রত হয়েছিলেন। সেই সুকঠোর তপশ্চর্যার ফলে, সে-সময়, তাঁর দেহ থেকে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারের তুল্য তেজ নির্গত হয়েছিল। সেইজন্য মঙ্গল 'অঙ্গারক' নামে প্রসিদ্ধ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ হল অঙ্গারকেশ্বর। তপস্যায় তুষ্ট মহাদেব মঙ্গলকে দিয়েছিলেন বিশিষ্ট গ্রহ পদ। বারাণসীধামে এই অঙ্গারকেশ্বরের, যাঁরা অর্চনা করে থাকে, দেহান্তে তারা হয় পরম ঐশ্বর্যময় এই লোকের অধিবাসী। তাছাড়াও মঙ্গলবার চতুর্থী তিথিতে সর্ববিঘ্নবিনাশক গজেন্দ্রবদন দেব গণেশেরও জন্ম হয়েছিল।

মঙ্গললোক অতিক্রম করতেই শিবশর্মার নয়নপথে অপরূপ দ্যুতিময় আর একটি লোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পুণ্যশীল আর সুশীল বললেন, এটি হল দেবগুরু বৃহস্পতির পুরী। বৃহস্পতি হলেন অঙ্গিরার পুত্র, তাই 'আঙ্গিরস' নামেই পরিচিত। সৃষ্টিভিলাষী ব্রহ্মার মরীচি প্রভৃতি যে অনুরূপ সাতজন মানসপুত্র আবির্ভূত হয়ে সৃষ্টিকর্মে রত হয়েছিলেন অঙ্গিরা ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। আঙ্গিরস ছিলেন যেমন শান্ত, দান্ত, অক্রোধী, মৃদুভাষী অথচ বাকপটু তেমনি রূপবান এবং সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। রূপ-গুণ এবং বুদ্ধির সমাবেশে তিনি ছিলেন দেবগণের মধ্যে অদ্বিতীয়। এই দিব্যতেজা আঙ্গিরস কাশীতে গিয়ে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে দিব্য পরিমাণে দশ হাজার বছর সুকঠোর তপস্যা করার পর তেজোরাশিরূপে বিশ্বভাবন বিশ্বেশ্বর লিঙ্গোপরি আবির্ভূত হয়েছিলেন। আঙ্গিরস তখন পুলকিত-চিত্তে এমন একটি সুললিত স্তোত্রে দেবদেবের বন্দনা করেছিলেন যে ত্রিগুণময় হয়েও ত্রিগুণাতীত মহাদেব অত্যন্ত প্রীত হয়ে সেই স্তোত্রের নাম

রেখেছিলেন 'বায়ব্য' স্তোত্র। বৃহৎ-তপস্যা করেছিলেন বলে মহাদেব অঙ্গিরসের নাম রেখেছিলেন 'বৃহস্পতি' আর যেহেতু লিঙ্গার্চনার ফলে তিনি মহাদেবের জীবনস্বরূপে পরিণত হয়েছিলেন তাই ত্রিলোকমধ্যে তিনি হন 'জীব'।

মহাদেব কিন্তু আঙ্গিরসের সর্ববিধ আচরণে এমনি প্রীত হয়েছিলেন যে ব্রহ্মাকে ডেকে তাঁকে দেবগণের গুরুরূপে অভিষিক্ত করার আদেশ দিয়েছিলেন। মহাদেবের আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ তাঁকে আচার্যপদে, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ তাঁকে সুরাচার্যের পদে সানন্দে, মহা-সমারোহের সঙ্গে বরণ করে নিয়েছিলেন। তদবধি বৃহস্পতি হলেন দেবগুরু। মহাদেবের অনুজ্ঞায় কাশীতে চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে; বীরেশ্বর লিঙ্গের নৈঋর্তে বৃহস্পতির প্রতিষ্ঠিত বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গের যাঁরা অর্চনা করে তারাই একমাত্র বৃহস্পতিলোকে বাস করার অধিকারী। কলিযুগে এটি হবে গুপ্তলিঙ্গ; এই লিঙ্গের দর্শন মাত্রেই ঘটাবে প্রতিভার বিকাশ।

কাহিনীতে মুগ্ধচিত্ত শিবশর্মা এল প্রভামণ্ডলমণ্ডিত শনিলোকে। শিবশর্মার জিজ্ঞাসু মনকে তৃপ্তি দিতে বিষ্ণুর গণদ্বয় বলতে শুরু করলেন:

ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র কশ্যপের দাক্ষায়ণী নামে স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র সূর্যের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল প্রজাপতি বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার। প্রখর তেজসম্পন্ন সূর্যকে উদ্দেশ্য করে পিতামহ কশ্যপ একবার পরিহাস করে বলেছিলেন, "ন খল্বয়ং মৃতোহণ্ডস্থ" গর্ভেই কেন এটা মরে যায় নি। সেই থেকে "লোকোহয়ং মার্তণ্ড ইতি চোচ্যতে।"— সেই থেকে ত্রিলোকে সূর্যের অপর এক নাম হয়ে গিয়েছিল-মার্তণ্ড।

সংজ্ঞা নিজেও তপঃপ্রভাবশালিনী এবং রূপযৌবনগুণান্বিতা হয়েও পতি আদিত্যের প্রখর সেই তেজ সহ্য করতে না পেরে ক্রমশঃই যেন ক্ষীণ-কলেবর এবং দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। সেই অবস্থাতেই তাঁর তিনটি সন্তান হয়েছিল। দুটি পুত্র, একটি কন্যা। পুত্র দুটির মধ্যে

জ্যেষ্ঠ হল বৈবস্বত মনু, কনিষ্ঠ হল যম। আর কন্যার নাম হল যমুনা। সংজ্ঞা এরপর যখন সূর্যের সেই অতি-তেজময় রূপকে সহ্য করতে একেবারে আর অসমর্থা হয়ে পড়ল, তখন নিজের শরীর থেকে স্বানুরূপা এক মায়াময়ী রমণীকে নির্মাণ করলেন। তার নাম হল সবর্ণা অর্থাৎ ছায়া। স্বানুরূপে নিখুঁত সেই রমণীকে অতঃপর তিনি বললেনঃ "মনুরেষ যমাবেতৌ যমুনাযমসংজ্ঞকৌ। স্বাপত্যদৃষ্ট্যা দ্রষ্টব্যমেতদ্বালত্রয়ং ত্বয়া॥" (৭৯)—হে শুচিস্মিতে, সবর্ণা, মনু, যম ও যমুনা আমার এই তিন অপত্যকে নিজের সন্তান মনে করে লালন-পালন কোরো। আমি আমার পিত্রালয়ে চললাম। পতির কাছে কিন্তু এই সব কিছু গোপন রাখবে। সবর্ণা সম্মতি জানালে সংজ্ঞা গোপনে পতিগৃহ ত্যাগ করে পিত্রালয়ে গেল। প্রজাপতি বিশ্বকর্মা কিন্তু সব শুনে কন্যাকে পিতৃগৃহে আশ্রয় দিলেন না। ভর্ৎসনা করে পতিগৃহে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। স্বানুরূপা সবর্ণাকে সে ছলনা করে রেখে এসেছে। এখন সে সেখানে থাকতে কিভাবেই বা ফিরে যাবে পতিগৃহে। উপায়ান্তর না দেখে নিজের শক্তিকে সূর্যতেজ ধারণক্ষম করে তোলার জন্যে চলে গেল উত্তরকুরু জনপদের এক তৃণময় অঞ্চলে। সেখানে বাড়বা (ঘোটকী) রূপ ধরে তপস্যায় রতা হল।

এদিকে, সবর্ণাকে সংজ্ঞা-বোধে নিঃসন্দেহে কেটে যাচ্ছিল সূর্যের সংসার। সবর্ণারও হল তিনটি সন্তান। দুটি পুত্র, একটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ হল সাবর্ণি নামক অষ্টম মনু, কনিষ্ঠ হল শনৈশ্চর (শনি) আর একটি কন্যা। নাম ভদ্রা। ক্রমে ক্রমে সবর্ণার মধ্যে জেগে উঠল সংজ্ঞার সন্তানদের প্রতি বিমাতৃ-সুলভ আচরণ। জ্যেষ্ঠ বৈবস্বত নীরবে মায়ের এই অস্বাভাবিক আচরণ সহ্য করে যেতেন কিন্তু, যম তা সহ্য করতে না পেরে একদিন ক্রোধে সবর্ণাকে পদাঘাত করলেন। সবর্ণাও অভিশাপ দিলে, যমের ঐ উদ্যত চরণ যেন দেহ থেকে খসে যায়। অভিশাপ-ভয়ে ভীত যম তখনি পিতা সূর্যের চরণপ্রান্তে গিয়ে লুণ্ঠিত হয়ে সব বৃত্তান্ত নিবেদন করল। শুনে বিবস্বান (সূর্য)

বললেন, "অপরাধসহস্রেঽপি জননী ন শপেৎ সুতম্। তস্মাৎ কিমপি ভো বাল ভবিষ্যত্যত্র কারণম্॥" (১০৪)—বালক! সহস্র অপরাধ করলেও জননী কখনও পুত্রকে অভিশাপ দেয় না। নিশ্চয়ই এখানে অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে। তবে মাতৃশাপ অলঙ্ঘনীয়। কৃমি-কীটেরা যখন তোমার পায়ের গলিত মাংস নিয়ে খসে পড়বে, তখন তুমি শাপমুক্ত হবে।

এই বলে বিবস্বান অন্তঃপুরে গিয়ে সবর্ণাকে স্নেহবৈষম্যের কারণ জিজ্ঞাসা করেও যখন দেখলেন সবর্ণা নিরুত্তর তখন সমাধিযোগে সব কিছু অবগত হলেন। তারপর সবর্ণাকে শাপদানে উদ্যত হতেই সবর্ণা অকপটে সংজ্ঞার গোপন কাহিনী বিবস্বানের কাছে প্রকাশ করল। সঙ্গে সঙ্গে সপারিষদ বিবস্বান গিয়ে হাজির হল বিশ্বকর্মার কাছে। যথোচিত অভ্যর্থনা জানিয়ে বিশ্বকর্মা বললেন—"তবাতি-তেজসো ভীতা প্রাপ্যোত্তরকুরূন্ রবে। বড়বারূপমাস্থায় বনে চরতি শাদ্বলে॥" (১১৩)—তোমার অতীব তেজভয়ে ভীতা তোমার পত্নী সংজ্ঞা উত্তরকুরুজনপদে বনমধ্যে ঘোটকীরূপ ধারণ করে তৃণ-সমূহের উপর বিচরণ করছে। মনে-মনে অনুতপ্ত হলেন বিবস্বান। অনুরোধ জানালেন প্রজাপতি বিশ্বকর্মাকে তাঁর জন্মগত প্রখর তেজকে হ্রাস করে দিতে, যাতে সে পত্নীর কাছে পীড়াদায়ক না হয়। বিশ্বকর্মা তখন তাঁকে ভ্রমিযন্ত্রে আরোপ (কুঁদে) করে তাঁর তেজ কিছু পরিমাণে হ্রাস করে দিতেই বিবস্বান হলেন অতীব সৌম্যদর্শন। অনন্তর তিনি উত্তরকুরুজনপদে গিয়ে শুষ্ক তৃণভক্ষণকারী বড়বারূপী সংজ্ঞাকে দেখে মিলন-কামনায় নিজে বড়বরূপ (ঘোটক) ধারণ করে তার সঙ্গে মিলিত হলেন। ঘোটকীরূপী সংজ্ঞা ঘোটক-রূপী সূর্যকে পরপুরুষ জ্ঞানে নিজের সতীত্বকে অটুট রাখার জন্যে সূর্যের বীর্যকে নাসিকা বিবর দিয়ে বাইরে নিক্ষিপ্ত করলে, বিবস্বান অতীব প্রীত হয়ে স্বীয় রূপ প্রকাশ করলেন তাঁর কাছে। পতির সৌম্যদর্শন মূর্তি দেখে উদ্বেলিত-চিত্ত সংজ্ঞাও তখন বড়বারূপ পরিত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে সুখে মিলিত হল। বড়বারূপী সংজ্ঞার

নাসিকা-বিবর থেকে সূর্যের ঐ শুক্র থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন ভিষকশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

যাই হোক, এই হল সূর্য-পুত্র শনির জন্মবৃত্তান্ত। শনি বারাণসী-ধামে গিয়ে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা এবং দুঃসাধ্য তপস্যা করে গ্রহপদবী এবং এই লোকের অধিপতি হয়েছিলেন। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে আর শুক্রেশ্বরের উত্তরে এই শনৈশ্চর লিঙ্গ অর্চনা করলে যেমন গ্রহপীড়া থাকে না, তেমনি এই লোকে সুখে বসবাস করার অধিকারী হয়।

[অধ্যায় ১৮]

মায়াপুরীতে ত্যক্তদেহ মাথুর ব্রাহ্মণ শিবশর্মা বিষ্ণুর গণদ্বয় পূণ্যশীল এবং সুশীলের সঙ্গে ব্যোমমার্গে দিব্য বিমানে বিষ্ণুলোকে যেতে-যেতে এবং লোকসমূহের কাহিনী শুনতে শুনতে এল আর এক লোকে। অনুপম তেজসম্পন্ন এই লোকপথ অতিক্রম করতে গিয়ে দেখল শিবশর্মা চারণ আর মাগধগণ এসে তার স্তব করল, দেবকন্যাসদৃশ কন্যারা এসে তাকে ক্ষণকালের জন্য অবস্থান করার আহ্বান জানিয়েও বিফল মনোরথজনিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে চলে গেল।

কৌতূহলী শিবশর্মাকে গণদ্বয় বললেন—এটি হল সপ্তর্ষিমণ্ডল। অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মার সাত মানসপুত্র পুরাণে যাঁরা সাত ব্রহ্মা রূপে কীর্তিত—সেই মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ সর্বলোকের মাতৃস্বরূপা সম্ভূতি, অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, স্মৃতি আর উর্জ্জা নামে সতী-সাধ্বী সহধর্মিণীদের নিয়ে বসবাস করেন। এদের সঙ্গে এই লোকে বাস করেন দেবদেব নারায়ণের চোখেও শ্রদ্ধাশীলা, পতিব্রত-পরায়ণা অরুন্ধতী, যাঁর কেবলমাত্র নাম-গ্রহণেই গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়।

পুরাকালে ব্রহ্মা এই সপ্ত মানসপুত্রকে উৎপন্ন করে বলেছিলেন—"প্রজাঃ সৃজত মে পুত্রাঃ নানারূপাঃ প্রযত্নতঃ"—হে আমার পুত্রগণ;

তোমরা যত্ন নিয়ে নানারকম প্রজা সৃষ্টি কর।

ব্রহ্মার অভিলাষ পূরণে কৃতকৃত্য হবার জন্য এই সাত ঋষি তখন ব্রহ্মাকে প্রণাম করে অবিমুক্ত ক্ষেত্র শিবধাম বারাণসীতে গিয়ে আপন-আপন নামাঙ্কিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে দেবাদিদেব মহাদেবের প্রীতি কামনায় কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন। তাঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব এই সাত ঋষিকে দিয়েছিলেন প্রাজাপত্যপদ।

গোকর্ণেশ সরোবরের পশ্চিমে অত্রীশ্বর লিঙ্গ; কর্কোটবাপীর ঈশান-কোণে মরীচিকুণ্ডের পাশে মরীচীশ্বর লিঙ্গ; স্বর্গদ্বারের পশ্চিমে পুলহেশ এবং পুলস্ত্যেস লিঙ্গ; হরিকেশবনে আঙ্গিরসেশ্বর আর বরণা-তীরে বশিষ্ঠেশ্বর এবং ক্রতীশ্বর শিবলিঙ্গ। সপ্তঋষির প্রতিষ্ঠিত এই সপ্তলিঙ্গের মধ্যে যারা যে লিঙ্গের সেবক, সপ্তর্ষিলোকে তারা সেই সেই লিঙ্গেশ্বরের লোকে স্ব-স্ব গুণে বিভূষিত হয়ে বসবাস করেন।

পতিব্রতপরায়ণা, পুণ্যশীলা, অপরূপা অরুন্ধতীও এই লোকেই বাস করে থাকেন। বিরল অরুন্ধতীর পতিসেবা। দেবদেব নারায়ণও স্বীয় অর্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মীর সামনেই অবেগীভূত কণ্ঠে তাঁর প্রশংসা করতে দ্বিধা বোধ করেননি। সতী-সাধ্বী অরুন্ধতীর নাম-মাত্র উচ্চারণেই মেলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য।

[অধ্যায় ১৯—২১]

সপ্তর্ষিলোক অতিক্রম করতেই অপরূপ আর এক লোক দেখে স্তম্ভিত হল বিষ্ণুশর্মা। মনে হল যেন তার বিচ্ছুরিত তেজোরাশি সূত্রধারের মত সূত্রহস্তে নভোমণ্ডলে গগনাঙ্গন পরিমাপে ব্যস্ত। নানাবিধ বাতময় রজ্জুর দ্বারা আকুলিত করাঙ্গুলি, চঞ্চলদর্শন।

বিষ্ণুর গণদ্বয় শিবশর্মাকে বলল—এটি সত্যনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণ ধ্রুব-র জগৎ।

স্বয়ম্ভুব মনুর পুত্র নরপতি উত্তানপাদের ছিল দুই পুত্র—উত্তম এবং

ধ্রুব। জ্যেষ্ঠ পুত্র উত্তম ছিল প্রধানা মহিষী সুরুচির গর্ভজাত আর ধ্রুব ছিল সুনীতির। একদিন সভাস্থলে নৃপতি যখন উপবিষ্ট, সুনীতি বালকপুত্র ধ্রুবকে অলংকৃত করে পাঠালেন রাজসেবায়। সভাস্থলে এসে উত্তমকে পিতৃ-অঙ্কে সুখাসীন দেখে ধ্রুব-র মনেও বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। সে-ও সিংহাসনোপরি পিতার কাছে যেতে উদ্যত হলে বিমাতা সুরুচি তাকে তিরস্কার করে বলল—যে পুণ্যবলে এই সিংহাসনে আরোহণ করা যায়, সে পুণ্য তোমার নেই। বালক, ভুলে যেও না যে তুমি অভাগিনী সুনীতির গর্ভজাত। বিমাতার এই কঠোর মন্তব্যে ধ্রুব নিরস্ত হয়ে কোনরকমে অশ্রুজল সংবরণ করে, পিতাকে প্রণাম সেরে ফিরে এল মায়ের কাছে। দেখলে বিমাতার এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ বাক্যও উচ্চারণ করলেন না পিতা উত্তানপাদ। মর্মাহত পুত্রের অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখে উদ্বেল হয়ে উঠল মাতৃ-হৃদয়। সযত্নে তার মুখ মুছিয়ে দিয়ে কারণ জানতে চাইল সুনীতি। আত্ম-সংবরণ করে বালক ধ্রুব বিমাতার দ্বারা তিরস্কৃত হবার কারণ জানতে চাইল। জানতে চাইল, কোন সুকৃতি-বলে উত্তম পিতার প্রিয়, সে নয়; উত্তম রাজ-সিংহাসনের উপযুক্ত, সে নয় আর কেনই বা রাজ-মহিষী হয়েও জননী তার অবজ্ঞেয়া!

স্বপত্নী-বিদ্বেষহীনা, সুবুদ্ধিপরায়ণা, সুনীতি বালক-পুত্র ধ্রুবর এই সব প্রশ্ন শুনে ক্ষণকাল চিন্তা করে বললে—এই সবই জন্মান্তরের ফল। জন্মান্তরে সুরুচি যে সাধনা করেছিল, এ-জন্মে স-পুত্র সেই ফল তো ভোগ করতেই হবে, বাবা। হয়ত, আমাদের তপস্যা, তার তুলনায় অল্প ছিল, তাই রাজ-সান্নিধ্যে এসেও আমরা রাজসম্পদ ভোগের অধিকারী হতে পারিনি। নিজের কর্মই যাবতীয় মান-অপমানের কারণ, বিধাতারও সাধ্য নেই, তার ফলভোগ থেকে রেহাই পান।

স্থিরচিত্তে বালক ধ্রুব সব শুনে জননীকে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বললে—আমি যদি মনুবংশে নৃপতি উত্তানপাদের ঔরসে আপনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে থাকি, আর তপস্যাই যদি যাবতীয় সম্পদের কারণ হয় তাহলে তপস্যা করেও লোকে যে পদ লাভ করতে পারে না, আমি

নিশ্চয়ই সেই পদ লাভ করব। ন'বৎসরের বালক ধ্রুব এই প্রতিজ্ঞ করে মাতৃ-আশীর্বাদ নিয়ে গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বনমধ্যে প্রবে করলে। অজ্ঞাত তার কাছে কানন-পথ। চিন্তানিবিষ্ট হল ধ্রুব তারপর চক্ষু উন্মীলিত করতেই দেখলে, তার সামনে সাতজন ঋষি— তিলক-শোভিত কপাল, অঙ্গুলিতে কুশের অঙ্গুরী, যজ্ঞসূত্রে অলংকৃ হয়ে বসে আছেন তাঁরা কৃষ্ণাজিনের উপর। বিপদ-ত্রাতারূপে যে অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটল এই সপ্তর্ষির।

ধ্রুব তাঁদের যথাযোগ্য অর্চনা করে, আত্ম-পরিচয় এবং গৃহ হ নিষ্ক্রমনের কারণ জানিয়ে বলল: "অনন্যনৃপভুক্তং যৎ যদন্যেভ্য সমুচ্ছি তম্। ইন্দ্রাদিদুরবাপং যৎ কথং লভ্যং দুরাসদম্॥"—হে সপ্তর্ষিগণ আপনারা উপদেশ করুন, যে পদ অন্যান্য নৃপতিগণ কর্তৃক উপযুক্ত হয়নি, যা সর্বোচ্চ, ইন্দ্রাদি দেবগণের পক্ষেও যে পদ সুদুর্লভ, কীভাবে সেই পদ পাওয়া যায়।

ধ্রুবর মনোগত অভিলাষ জানতে পেরে তৃপ্ত হলেন মারীচ-প্রমুখ সপ্তর্ষিগণ। তারপর তাঁরা একে-একে ধ্রুবকে উপদেশ দিলেন, ভগবান অচ্যুতের পদসেবা, ভগবান গোবিন্দের চরণ-কমল ধূলির রসাস্বাদন ভগবান কমলাপতির চরণ-পঙ্কজে মতি, বিষ্ণুর স্মরণ, বিশ্বব্যাপক জনার্দনের উপর পরম নির্ভর, ভগবান হৃষিকেশের আরাধনাই, একমাত্র তার অভীষ্ট পূরণ করতে পারে। ধ্রুব জানতে চাইলে আরাধনার উপায়। সপ্তর্ষিগণ তখন তাকে দিয়ে গেলেন সেই পথ:

"তিষ্ঠতা গচ্ছতা বাপি স্বপতা জাগ্রতা তথা
শয়নেনোপবিষ্টেন জপ্যো নারায়ণঃ সদা॥
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ বাসুদেবাত্মকেন চ।
ধ্যায়ংশ্চতুর্ভুজং বিষ্ণুং জপ্তা সিদ্ধিং ন কো গতঃ॥ (১৯/১১৩-১১৪)

—অবস্থানে, গমনে, নিদ্রায়, জাগরণে, শয়নে, উপবেশনে, সব সময়েই ভগবান নারায়ণের জপ করবে। বাসুদেবাত্মক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের ভগবান চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে চিন্তাপূর্বক জপ করে কোন্ ব্যক্তি না সিদ্ধি লাভ করেছে।

তোমার পিতামহ বৈষ্ণব-প্রধান মনুও ছিলেন এই মহামন্ত্রের উপাসক। তুমিও বাসুদেব-নিষ্ঠ হও, অভিলাষ পূরণ হবে।

এই বলে অন্তর্হিত হলেন সপ্তর্ষিগণ।

উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুবও কানন হতে নির্গত হয়ে যমুনাতটস্থ ভগবান হরির আদি এবং প্রিয়তম স্থান মধুবনে এসে বাসুদেবের ধ্যানে নিমগ্ন হল। ক্রমে-ক্রমে নিখিল সংসার বাসুদেবময় বলে প্রতীয়মান হতে লাগল ধ্রুবের নয়নে। এমনকি স্থলে-জলে মনুষ্যেতর প্রাণীসমূহের মধ্যেও দর্শন করতে শুরু করল শ্রীহরিকে। ধ্রুবর নয়ন যেমন অখিল-চরাচরে শ্রীহরি ছাড়া আর কিছু দর্শন করতে পারেনা, কর্ণদ্বয়ও তেমনি মুকুন্দ, গোবিন্দ, দামোদর, চতুর্ভুজ ছাড়া আর কোন শব্দও যেন শ্রবণ করতে পারে না। সর্ব-ইন্দ্রিয়ে রাজপুত্র ধ্রুব যেন অনুভব করতে শুরু করল পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দের স্পর্শামৃত। তপস্যায় কৃশতনু ধ্রুব ক্রমশঃই তপঃপ্রভাবে দেদীপ্যমান হয়ে উঠতে লাগল। সেই সঙ্গে কৌস্তুভোদ্ভাসিত হৃদয় পীতকোষেয় বস্ত্র-শোভিত ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষের অবিরত ধ্যানে নিখিল সংসারকে ধ্রুব বিলোকন করতে লাগলেন তেজোময়রূপে।

ধ্রুব-র ক্রমবর্ধমান তপঃপ্রভাব দেখে চিন্তিত এবং ভীত হয়ে উঠলেন দেবরাজ ইন্দ্র—বুঝিবা তারই পদাভিষিক্ত হয়ে যায় ধ্রুব। তাই তিনি ধ্রুবকে স্খলিত করার জন্যে ভূত-প্রেতদের পাঠালেন বালকের তপোবিঘ্ন ঘটাতে। বিকটদর্শন বিকটাকৃতি সেই সব ভূত-প্রেতগণ নানা রোমহর্ষক বিভীষিকা সৃষ্টি করেও যখন তপোভঙ্গ করতে পারল না, তখন নিল ছলনার আশ্রয়। মাতৃভক্ত ধ্রুবকে তপস্যাচ্যুত করার জন্যে তখন কোন এক প্রেতিনী ধ্রুব-জননী সুনীতির রূপ পরিগ্রহ করে পুত্রকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অসীম আকুলতা নিয়ে দেখা দিলে ধ্রুবের সামনে। ছলনাময়ী প্রেতিনী ধ্রুবকে বোঝাবার চেষ্টা করলে—এই বয়স তপস্যার জন্য নয়। সংসারাশ্রম না করে কী কেউ তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়। তাছাড়া, যারা সংসারে শ্রীভ্রষ্ট, সংসারে যাদের কোন স্থান নেই তারাই এইভাবে জীবন কাটাতে প্রবৃত্ত হয়।

ধ্রুব তো তা নয়, সে রাজার পুত্র। নির্বিকার-চিত্তে সব শুনলে ধ্রুব। কোন প্রত্যুত্তর না করে আবার শ্রীহরির ধ্যানে নিমগ্ন হল। সেই সময় ভূতেরা দেখল, শ্রীহরির সুদর্শন চক্রের তেজোরাশি সূর্যের ন্যায় মণ্ডলাকারে ধ্রুবকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলেছে। ভীত ভূত-প্রেতগণ তখন ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করল।

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে, দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে দেবরাজ এল পিতামহ ব্রহ্মার কাছে জানতে, ধ্রুব-র এই তপস্যা কোন্ পদাভিলাষে। ব্রহ্মা বললেন—বিষ্ণুভক্ত ধ্রুব, তাই অপরকে সে তাপিত করবে না, সে-বিষয়ে তোমরা নিঃশঙ্ক হতে পার। "আরাধ্য বিষ্ণুং দেবেশং লব্ধা তস্মাৎ স্বকাঙ্ক্ষিতম্। ভবতামপি সর্বেষাং পদানি স্থিরয়িষ্যতি॥"—দেবেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করে সে তার আকাঙ্ক্ষিত পদই গ্রহণ করবে; তোমাদের কারো কোন পদের বিঘ্ন ঘটাবে না।

এদিকে নিরলস তপশ্চর্যায় খিন্ন বালক ধ্রুব-র নয়নপথে একদিন আবির্ভূত হলেন স্বয়ং ভগবান গরুড়বাহন পুণ্ডরীকাক্ষ। আবেগাশ্রু নিয়ে তাঁর চরণে ভূলুণ্ঠিত হল ধ্রুব; রুদ্ধবাক। সুদর্শনধারী বিষ্ণু তাঁর কঠিন-কোমল করে তাকে উত্তোলন করে ধূলিধুসরিত তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করলে বাক্যস্ফূর্ত হল ধ্রুব-র। সুললিত ছন্দোবদ্ধ বাক্যে বিষ্ণুর স্তুতিগান করলে ধ্রুব। সেই হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যরেতা, সর্বভূতাত্মার বন্দনা-শেষে তাঁর শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করলে ধ্রুব—"সর্ব্বেষাং হৃদয়াবাসঃ সাক্ষাৎ সাক্ষী ত্বমেব হি : বহিরন্তর্ব্বিনা ত্বাত্ত ন হ্যন্যং বেদ্মি সর্ব্বগম্॥"—তুমি সর্বসাক্ষীরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। অন্তরে, বাহিরে হে দেব, আমি যে সর্বব্যাপী তোমায় ছাড়া আর কাউকে জানি না।

শরণাগত ধ্রুবের এই স্তুতিবাক্যে প্রীত ভগবান বিষ্ণু তখন ধ্রুবকে বললেন, তোমার মনোভিলাষ আমি জানি। জীবজগতের উৎপত্তির কারণ অন্ন, অন্নের উৎপত্তির কারণ বৃষ্টি, বৃষ্টির উৎপত্তির কারণ সূর্য,—ধ্রুব, তুমি সেই সূর্যের আধার হও। আর "জ্যোতিশ্চক্রস্য সর্বস্য

গ্রহক্ষাদেঃ সমন্ততঃ। গগনে ভ্রমতো নিত্যং ত্বমাধারো ভবিষ্যসি॥ মেধীভূতস্তু বৈ সর্ব্বান্ বায়ুপাশৈর্নিয়ন্ত্রিতান্। আকল্পং তৎ পদং তিষ্ঠ ভ্রাময়ন্ জ্যোতিষাং গণান্॥" (৭৯—৮০)—গ্রহ নক্ষত্রাদিসহ জ্যোতিশ্চক্র আকাশে যা নিয়ত পরিভ্রমণরত, তুমি নিত্য তার আধার রূপে বিরাজ করবে আর এই জ্যোতিশ্চক্রের বন্ধনস্তম্ভরূপে অবস্থান করে বায়ুপাশে নিয়ন্ত্রিত এই জ্যোতিমণ্ডলকে প্রলয়কাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করাবে।

মহাদেবের প্রসাদে পূর্বে এই পদে আমিই অধিষ্ঠিত ছিলাম। এখন আমার এই পদ তোমায় দিলাম। তুমি এই পদে থেকে এক কল্প-পরিমিত কাল (অর্থাৎ ব্রহ্মার এক অহোরাত্র অর্থাৎ ৮৬৪ কোটি বৎসর) শাসন করবে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, মহাত্মা মনু, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুর্লভ এই পদ আমি তোমাকে দান করলাম। তবে, এই পদে স্থায়িত্ব লাভ করতে হলে যা করণীয় সেই গুহ্যবিষয় তোমাকে বলি শোন।

আমি প্রত্যহ বৈকুণ্ঠ হতে জগৎপূজ্য মহাদেবকে আরাধনা করার জন্য কাশীতে গমন করি, যেখানে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর জীবগণের কর্মে ভেদ-বুদ্ধিহীন মহামন্ত্র দান করে অন্তিমকালে প্রাণীগণকে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত করেন। তাঁরই প্রসাদে আমার মধ্যে ত্রিভুবন রক্ষার এই শক্তি; আমি আমার নেত্রপম দিয়ে তাঁকে আরাধনা করার ফলেই প্রাপ্ত হয়েছি দৈত্যমথনকারী এই সুদর্শনচক্র। আজ সুপবিত্র কার্তিকী-যাত্রার দিন। এই দিন উত্তর বাহিনী গঙ্গায় স্নান করে বিশ্বেশ্বর দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। তাই আমি এখনি কাশীতে যাব, তুমিও চল। এই বলে ধ্রুবসহ জনার্দন গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করে এলেন পঞ্চক্রোশীর সীমান্তে। অতঃপর মণিকর্ণিকায় স্নান এবং বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়ে তিনি ধ্রুবকে বললেন—লোকে আমাকে অনন্ত বলে থাকে, কিন্তু আমিও অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীর গুণসমূহের অন্ত পাই না। এই স্থানে একটি শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা এবং বিত্তশাঠ্য না রেখে তার অর্চনা অশেষ ফলদায়ক। বললেন—"লিঙ্গং স্থাপয় যত্নেন

ক্ষেত্রেঽত্রৈবাবিমুক্তকে। ত্রৈলোক্যস্থাপনং পুণ্যং যথা ভবতি তেঽক্ষয়ম্॥ (১১৪)—তুমি এই অবিমুক্তক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপন কর, তাতে তোমার ত্রৈলোক্য স্থাপনের পুণ্য সঞ্চয় হবে।

ধ্রুবও বিষ্ণুর নির্দেশে বৈদ্যনাথের নিকট শিবলিঙ্গ স্থাপন করলে। নির্মাণ করলে বৃহৎ প্রাসাদ, তারই সামনে খনন করালে কুণ্ড। তারপর নিশ্চল আরাধনায় কৃতকৃত্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করলে।

এই ধ্রুবেশ্বরের অর্চনা এবং ধ্রুবকুণ্ডে যারা উদকক্রিয়া করে, তারাই সর্ববিধ ভোগসম্পন্ন হয়ে এই ধ্রুবলোকের অধিবাসী হয়।

[অধ্যায় ২২]

দিব্য বিমানে বিষ্ণুর দুই সর্বদর্শীগণের সঙ্গে বৈকুণ্ঠলোকগামী শিবশর্মা এরপর উর্ধ্ব-ত্রিলোক পথে প্রথমে এল মহর্লোকে। পরম রমণীয় তেজঃসমাবৃত এই লোকে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা হলেন তপস্যাদ্বারা বিধূতপাপরাশি কল্পায়ু মহাত্মাগণ, বিষ্ণুময় জীবন অতিবাহিত করে ক্লেশ যাদের ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে; সমস্ত জগৎকে যাঁরা দর্শন করেন তেজোরূপে। মহলোক অতিক্রম করে শিবশর্মা এল সেই জনর্লোকে, যেখানে ব্রহ্মার মানস-পুত্রদের সঙ্গে থাকেন উর্ধ্বরেতা, দ্বন্দ্ববিমুক্ত, নির্মলচিত্ত যোগিগণ। জনর্লোক অতিক্রম করে দিব্য বিমান তাঁদের নিয়ে এল তপোলোকে। যাঁরা বাসুদেবে শরণাগত, যাঁদের তপস্যা কেবল গোবিন্দের সন্তোষ সাধন; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যাঁদের মধ্যে কাতরতা নেই, নেই শীতাতপের বিশেষ অনুভূতি, দেহবোধহীন যাঁরা কেবল তপস্যামগ্ন, তাঁরাই হন এই লোকের অধিবাসী।

তপোলোক অতিক্রম করে মহোজ্জ্বল সত্যলোকে আসা মাত্রই শিবশর্মাকে নিয়ে বিষ্ণুর দুই গণ বিমান হতে অবতরণ করে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হয়ে প্রণাম নিবেদন করলে।

ব্রহ্মা সুতীর্থে প্রাণত্যাগকারী সুপণ্ডিত শিবশর্মাকে স্বাগত জানিয়ে

বললেন, মর্তভূমির মানুষেরা ইন্দ্রিয় দমন, লোভ-পরিহার ও তামসিকতা পরিত্যাগ করে এই সমস্ত লোকে সহজেই আসতে পারে,—মানুষের মধ্যে সেই মহদ্‌গুণ আছে। তবে ঃ

সত্বরং গত্বরং সর্ব্বং যচ্চৈতত্তবতেক্ষিতম্।
দৈনন্দিন প্রলয়তঃ সৃজামি চ পুনঃপুনঃ॥ (২২/২৬)

—তুমি এই যে সমস্ত দর্শন করে এলে, এগুলি সবই নশ্বর। দৈনন্দিন প্রলয়ান্তে আমি পুনঃপুনঃ এই সমস্তই সৃজন করছি।

সব দেবগণই কর্মভূমির অভিলাষী। সেই কর্মভূমিতে অর্জিত পুণ্যফলভোগী হয়ে তাঁরা এই সব লোকে এসে বসবাস করেন।

এছাড়াও হে দ্বিজ শোন ঃ

নার্য্যাবর্ত্তসমো দেশো ন কাশীসদৃশী পুরী।
ন বিশ্বেশসমং লিঙ্গং ক্বাপি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে॥ (২২/৩৭)

—আর্যাবর্ত তুল্য দেশ, কাশী তুল্য পুরী, বিশ্বেশ্বর তুল্য লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও নেই।

পুণ্যশীলদের আবাসভূমি স্বর্গ, সুখের আকর সন্দেহ নেই। কিন্তু পাতাল-পরিভ্রমণান্তে নারদ বলেছেন, দৈত্য-দানব-উরগ অধ্যুষিত পাতাল স্বর্গ হতেও রমণীয়। আবার সুমেরু পর্বত বেষ্টিত ইলাবৃতবর্ষ পাতাল হতেও উৎকৃষ্ট—পুণ্যকর্মের ভোগভূমি তোমার মত তীর্থে প্রাণত্যাগকারীদের স্থান। সমুদ্রমধ্যে যতগুলি দ্বীপ, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের ন'টি বর্ষের মধ্যে হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যভাগে অবস্থিত দেবদুর্লভ কর্মভূমি ভারতবর্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র অপেক্ষাও ভারতবর্ষে নৈমিষারণ্য পরম স্বর্গসাধন। সর্বতীর্থ[illegible] হল প্রয়াগ। তবুও দেহাবসানে অনায়াস মুক্তিলাভের একমাত্র ক্ষেত্র হল অবিমুক্তপুরী বারাণসী। আমি চতুর্দশ ভুবনের স্রষ্টা, কিন্তু কাশীক্ষেত্রের স্রষ্টা স্বয়ং বিশ্বেশ্বর। দুষ্কর তপস্যা করে যম সবকিছুর উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলেও কাশীর অধিবাসীদের নিয়ন্তা হলেন কালভৈরব এবং স্বয়ং বিশ্বনাথ। মহাপবিত্র এই কাশীক্ষেত্রে তাই সর্ববিষয়ে বিশুদ্ধ চিত্ত নিয়েই মানবগণের বাস করা

উচিত।

জ্ঞান-ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না। তপস্যা, জপ এবং যজ্ঞ হল জ্ঞানলাভের উপায়। কাশীবাসীর ক্ষেত্রে এর কোন প্রয়োজনই নেই। নির্বিকার সদাচার জীবন-যাপনের দ্বারা সেখানকার মানুষেরা একজন্মেই মুক্তিলাভ করে থাকে। সেই কাশীতে পবিত্রচিত্তে তুমি যে পুণ্য অর্জন করেছ, অবশ্যই তুমি তার ফলভাগী।

[অধ্যায় ২৩ ও ২৪]

ব্রহ্মার কথা শুনে হৃষ্টান্তঃকরণ শিবশর্মার মনে জাগে প্রশ্ন। বিষ্ণুর গণদ্বয়ই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ জানিয়ে ব্রহ্মা নিরস্ত হলে গণদ্বয়-সহ শিবশর্মা তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আবার বৈকুণ্ঠপথে বিমানে আরোহন করলে।

শিবশর্মা জিজ্ঞাসা করে, কতখানি পথ ইতিমধ্যে তারা অতিক্রম করেছে আর কতখানিই বা যেতে হবে আর বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা বলেছেন, কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারাবতী, কাশী, অযোধ্যা, মায়াপুরী ও মথুরা এই সাতটি মোক্ষপ্রদ পুরীর মধ্যে একমাত্র কাশীই হল মুক্তিক্ষেত্র। তবে কী আমার নির্বান লাভ ঘটে নি?

গণদ্বয় শিবশর্মাকে প্রসন্ন করার জন্য বললেন, পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে নিযুত যোজন উর্ধ্বে সূর্য, সূর্য থেকে লক্ষ যোজন উর্ধ্বে চন্দ্র এবং চন্দ্র থেকে লক্ষযোজন উর্ধ্বে নক্ষত্রমণ্ডল। নক্ষত্রমণ্ডল থেকে বুধ, বুধগ্রহ থেকে শুক্র, শুক্রগ্রহ থেকে মঙ্গল, মঙ্গলগ্রহ থেকে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি থেকে শনৈশ্চর প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে দ্বিলক্ষযোজন উর্ধ্বে। শনৈশ্চর থেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল, এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে ধ্রুবলোক প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে লক্ষ যোজন উর্ধ্বে। মহীতল হল ভূলোক, ভূলোক থেকে সূর্য পর্যন্ত ভুবর্লোক। আদিত্য থেকে ধ্রুবলোক পর্যন্ত স্বর্লোক। ভূতল থেকে এক কোটি যোজন উর্ধ্বে

মহর্লোক, দু'কোটি যোজন ঊর্ধ্বে জনলোক, চারকোটি যোজন ঊর্ধ্বে তপোলোক, আট কোটি যোজন ঊর্ধ্বে সত্যলোক। বৈকুণ্ঠলোক এই সত্যলোকের উপরে ষোড়শ কোটি যোজন ঊর্ধ্বে এবং তারও ষোড়শ কোটি যোজন ঊর্ধ্বে শিবলোক কৈলাস—যেখানে পার্বতী, গণেশ, কার্তিক ও নন্দীসহ দেবাদিদেব মহাদেবের অবস্থান। বেদ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা যাঁর তত্ত্ব জানতে অক্ষম, যিনি মন ও বাক্যের অগোচর যিনি অদ্বিতীয় এবং সর্বজ্ঞ সেই বিশ্বভাবন, বিশ্বপাবন বিশ্বেশ্বর মহাদেব-এর অবস্থান কারণেই কৈলাস অতুলনীয়।

এরপর গণদ্বয় বললেন ঃ

"নিরাকারোঽপি সাকারঃ শিব এব হি কারণম্।
ভুক্তয়ে মুক্তয়ে বাপি ন শিবান্মোক্ষদোঽপরঃ ॥" (২৩/৩৮)

—নিরাকার হলেও মায়াবশে সাকার শিবই জীবগণের ভুক্তি ও মুক্তির কারণ। শিব ছাড়া দ্বিতীয় মোক্ষপ্রদাতা আর কেউ নেই।

আরও বললেন ঃ

"যথা শিবস্তথা বিষ্ণুর্যথা বিষ্ণুস্তথা শিবঃ।
অন্তরং শিববিষ্ণোশ্চ মনাগপি ন বিদ্যতে ॥" (২৩/৪১)

—যিনি বিষ্ণু তিনিই শিব; যিনি শিব তিনিই বিষ্ণু। শিব ও বিষ্ণুতে কিছুমাত্র ভেদ নেই।

পুরাকালে মহাদেবই বিশ্বকর্মাকে দিয়ে স্বীয় সিংহাসন-সদৃশ সিংহাসন, সহস্র যোজন বিস্তৃত রত্নময় ছত্র নির্মাণ করিয়ে বিষ্ণুকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে, লক্ষ্মীসমাযুক্ত করিয়ে নিজ ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যান্বিত করে ব্রহ্মা, গণাধিপগণ, সনকাদি যোগিগণ, দেবর্ষিগণ, ঋষিগণ প্রভৃতি সকলকে ডেকে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের ঈশ্বরপদে তাঁকে অভিষেক করে এই বৈকুণ্ঠলোক দান করেছিলেন। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির আধাররূপে, ধর্ম, অর্থ ও কামের মোক্ষদাতারূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাঁকে বামবাহু আর ব্রহ্মাকে দক্ষিণ বাহুরূপে স্বীকৃতি দিয়ে পার্বতীপতি মহাদেব স্বয়ং কৈলাস পর্বতে লীলারত হলেন প্রথমগণের সঙ্গে।

বৈকুণ্ঠলোকের বর্ণনা শেষে গণদ্বয় এবার শিবশর্মার নির্বাণলাভের উপায় সম্বন্ধে বললেন :

সুতীর্থ মায়াপুরীতে দেহত্যাগের ফলে তুমি যে পুণ্য সঞ্চয় করেছ তার ফলে তুমি ব্রহ্মার বর্ষপরিমিত কাল অপ্সরাগণে পরিবেষ্টিত হয়ে বিষ্ণুলোকে অবস্থান করবে। তারপর জন্মগ্রহণ করে তুমি হবে নন্দীবর্দ্ধন নগরের অসপত্ন, প্রতাপশালী, ধার্মিক রাজা। তোমার রাজত্বকালে তোমার নগরী হিংসা-দ্বেষ বিবর্জিত হয়ে সবদিক থেকেই হবে সুউন্নত, সুসমৃদ্ধ। আর তোমার হৃদয়মধ্যে অহরহ চলবে বিষ্ণুর চরণারবিন্দের ধ্যান।

সেখানে তুমি পরিচিত হবে রাজা বৃদ্ধকালরূপে। দশহাজার রমণী হবে তোমার রাজ্ঞী আর তিনশত পুত্রের তুমি হবে পিতা।

তোমার রাজত্বকালের কোন এক সময়ে বারাণসী থেকে কতকগুলি তীর্থযাত্রী তোমার রাজসভায় সমাগত হবে, এবং আশীর্বাদ করে বলবে—'সমস্ত জগতের গুরু দেবদেব কাশীপতি বিশ্বেশ্বর তোমার কুমতি অপনয়ন করুন। যাঁর স্মরণমাত্রে মুক্তি, যাঁর প্রসাদে তোমার এই ঐশ্বর্য এবং নিষ্কণ্টক রাজসিংহাসন, সেই বিশ্বনাথ তোমার হৃদয়ে অবস্থান করুন,—এই আশীর্বাদ গ্রহণ করে তুমি তাদের যথোচিত মর্যাদায় বিদায় দেবে। তারপর শুভক্ষণ দেখে পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়ে অনঙ্গলেখা নামে তোমার যে রাজ্ঞী থাকবে, তাকে সঙ্গে নিয়ে কাশীধামে গমন করবে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন, একটি প্রাসাদ নির্মাণ এবং একটি কূপ খনন করে ব্রত, উপবাস, নিয়ম প্রভৃতির দ্বারা শরীর ক্ষয় করতে থাকবে।

এইভাবে তুমি যখন কাল কাটাতে থাকবে, সেই সময় এক মধ্যাহ্নে দেখবে এক বৃদ্ধ তাপস লাঠির উপর দেহের ভার রেখে শিবমন্দির থেকে নির্গত হয়ে নির্জনে তোমার কাছে এসে বসবেন। দেখবে, সেই তাপসের দেহ অতিশয় জীর্ণ; মস্তকে পিঙ্গল জটাভার এবং তেজোদীপ্ত। তিনি এসে জানতে চাইবেন তোমাদের পরিচয়, জানতে চাইবেন তোমার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নাম, জানতে চাইবেন

এই প্রাসাদ কার তৈরি ?

তুমি প্রত্যুত্তরে শুধু এইটুকুই বলবে—আমি বৃদ্ধকাল নামে রাজা, সহধর্মিনীর সঙ্গে দক্ষিণদেশ থেকে এসে এই লিঙ্গার্চনায় অভিনিবিষ্ট হয়েছি। আর এই প্রাসাদের কর্তা এবং কারয়িতা স্বয়ং শম্ভু। তাপস পিপাসার্ত হয়ে অতঃপর তোমার কাছ থেকে জল চাইলে কূপ থেকে জল এনে যখনই তাঁর তৃষ্ণা নিবারণ করবে, তখনই দেখবে, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তাপস তরুণের তারুণ্য লাভ করে আবির্ভূত হবেন তোমার সামনে এবং বিস্ময়াহত তোমাকে তোমাদের পূর্ব পরিচয় জানাবেন। তিনি বলবেন, আমি তোমার সহধর্মিনীকে জানি। পূর্বজন্মে উনি ছিলেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তুর্বসুর কন্যা শুভব্রতা। নৈধ্রুবের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। অপ্রাপ্তযৌবনে নৈধ্রুর নিধনপ্রাপ্ত হলে শুভব্রতা বৈধব্য পালন করে মুক্তিক্ষেত্র অবন্তীপুরীতে পরলোক গমণের পর পুণ্যফলে এ-জন্মে পাণ্ড্য নৃপতির কন্যা এবং তোমার সহধর্মিনী হয়ে কাশীক্ষেত্রে এসেছেন এবং এবার নির্বাণ লাভ করবেন। আর তুমি শিবশর্মা নামে সেই মাথুর ব্রাহ্মণ, পুণ্যবলে বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থানের পর এজন্মে বৃদ্ধকাল রাজা হয়ে কাশীক্ষেত্রে নির্জনে বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হয়ে পরম মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছ। তুমি যথার্থ পথই গ্রহণ করেছ —অহং-বিবর্জিত হয়ে মহাদেবগত যে হয়েছ, তাতেই তোমার পুণ্যফল অটুট। কারণ,—

"সুকৃতং নৈব সততমাখ্যাতব্যং কদাচন।
কৃতং ময়েতি কথনাৎ পুণ্যং ক্ষয়তি তৎক্ষণাৎ॥" (২৪/৬৯)

—আপনার সুকৃত কখনো নিজমুখে প্রকাশ করবে না। 'আমি করেছি' এই কথা বলামাত্রই পুণ্যক্ষয় হয়।

যাই হোক, কৃত্তিবাসের উত্তরে অবস্থিত এই লিঙ্গ বৃদ্ধকালেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হবে, হবে অনাদিসিদ্ধ লিঙ্গ। জরা ও সর্বব্যাধিবিনাশক এই কূপের নাম হবে কালোদক। এই বলে তিনি তোমার এবং অনঙ্গলেখার হাত ধরে সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তর্হিত হবেন। তারপর গণদ্বয় বললেন—

"মহাকাল মহাকাল মহাকালেতি কীর্তনাৎ।
শতধা মুচ্যতে পাপৈর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥" (২৭/৮৩)

—'মহাকাল, মহাকাল, মহাকাল'—এই নাম কীর্তন করলে শত পাপ হ'তে মুক্তিলাভ নিশ্চিত।

পরোপকার ব্রতে ব্রতী কাশীক্ষেত্র পরিত্যাগকারী মুনি অগস্ত্য সহধর্মিনী লোপামুদ্রাকে এই কাহিনী বিবৃত করে বললেন, এইভাবেই পরবর্তীকালে শিবশর্মা কাশীক্ষেত্রে পরম মুক্তি লাভ করেছিল।

তাই—"ইত্থং মোক্ষস্তু নির্নীতঃ প্রিয়ে হ্যানন্দকাননে।
অতঃ স্মরামি তাং কাশীং হেলয়ামুক্তিদায়িনীম্॥ (২৪/৮৯)

—প্রিয়ে! আনন্দকাননে এইভাবেই মোক্ষ নির্নীত, সেই কারণেই অনায়াস-মুক্তিদায়িনী। কাশীক্ষেত্রকে আমি সর্বদাই স্মরণ করি।

[অধ্যায় ২৫]

সহধর্মিনী লোপামুদ্রাসহ অগস্ত্য শ্রীপর্বত প্রদক্ষিণ করে উপস্থিত হলেন স্কন্দ কাননে। জলধারাধৌত ফলভারাবণত পাদপ-সমাযুক্ত, হিংসা-দ্বেষ বিবর্জিত এই কানন যেন তাপসের নির্জন তপস্যার জন্যই অপেক্ষমান।

মহাতপা মহামুনি অগস্ত্য সেখানে এসে দর্শন করলেন সাক্ষাৎ দেব স্কন্দকে। পত্নীর সঙ্গে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করে ষড়াননের প্রীতির উদ্দেশ্যে করজোড়ে স্বকৃত স্তব করলেন।

"নমোঽস্তু তে ব্রহ্মবিদাং বরায় দিগম্বরায়াম্বর সংস্থিতায়।
হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যবাহবে নমো হিরণ্যায় হিরণ্যরেতসে॥" (২৫/১৩)

—আপনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, আপনি দিগম্বর, আপনি অম্বরসংস্থিত, আপনি হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যবাহু, হিরণ্য, হিরণ্যরেতা, আপনাকে নমস্কার।

অতঃপর অগস্ত্যমুনি দেব স্কন্দকে তিনবার প্রদক্ষিণ করার পর

ষড়ানন কার্তিকেয়ের নির্দেশে পত্নীসহ তাঁর সম্মুখে উপবেশন করলেন। কি কারণে অগস্ত্য মুনি কাশী পরিত্যাগ করে এসেছেন, তা সবই জানেন সর্বজ্ঞ ষড়ানন। জানতে চাইলেন সোৎসুকে কাশীর সংবাদ। আক্ষেপ করে বললেন, ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র কাশীই হল মুক্তি ক্ষেত্র। দান, তপস্যা, যাগ-যজ্ঞ যা দিতে পারে না, একমাত্র মহাদেবের প্রসাদই তা দিতে পারে। বললেন ঃ

"অহমেকচরোঽপ্যত্র তৎক্ষেত্রপ্রাপ্তয়ে মুনে।
তপ্যে তপাংসি নাদ্যাপি ফলেয়ুর্মে মনোরথাঃ॥" (২৫/২২)

—সেই ক্ষেত্র লাভের আশায় আমি এই একস্থানে অবস্থান করে দীর্ঘ তপস্যা করে চলেছি; কিন্তু মুনি, আজও আমার সেই মনোরথ সফল হল না।

তুমি ধন্য—দুর্লভ কাশীবাসে পবিত্র তোমার দেহ। সাগ্রহে দেব কার্তিকেয় সেই পবিত্রতা কামনায় অগস্ত্যকে নিবিড় আলিঙ্গন দিলেন।

অগস্ত্য জিজ্ঞেস করলেন স্কন্দকে—হে প্রভু ষড়ানন! আপনি মাতৃক্রোড়ে বসে মহাদেব কর্তৃক পার্বতীর কাছে বারাণসীর যে মহিমা কীর্তন শুনেছিলেন, তা বলুন।

স্কন্দ বললেন, আমার ছয় মুখেও সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের শ্রুত মহিমাকীর্তন শেষ হবার নয়। ব্রহ্মাণ্ডে যত লোক আছে তার মধ্যে কাশীক্ষেত্র সবিশেষ একটি লোক যেখানে সর্বসিদ্ধিদাতা দেবদেব মহাদেবের অবস্থান।

"কৃত্বা পাপসহস্রানি পিশাচত্বং বরং ত্বিহ।
ন তু ক্রতুশতং প্রাপ্য স্বর্গে কাশীপুরীং বিনা॥" (২৫/৭১)

—সহস্র পাপ করে পিশাচ হওয়া ভাল। কিন্তু শতযজ্ঞের দ্বারা প্রাপ্য স্বর্গও কাশীর কাছে কিছুই নয়।

অন্তিমকালে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর জীবের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দান করেন, যাতে জীব ব্রহ্মময়তা লাভ করে।

[অধ্যায় ২৬—অধ্যায় ৩০]

অনুসন্ধিৎসু মুনিবর অগস্ত্য প্রীত দেব স্কন্দকে এবার প্রশ্ন করেন—ভূমণ্ডলে কবে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রখ্যাত এবং মোক্ষপ্রদ হল ? মণি-কর্ণিকাই বা কেন হল ত্রৈলোক্যপূজ্য ? গঙ্গা যখন ভূমণ্ডলে আগমন করেন নি, তখনই বা কি ছিল ? এই পুরী কি কারণেই বা 'বারাণসী' 'কাশী' 'রুদ্রাবাস' 'মহাশ্মশান' নামে খ্যাত ?

শুনে স্কন্দ বললেন, জগন্মাতা পার্বতীও দেবদেব মহাদেবকে এইসব প্রশ্নই করেছিলেন। মহাদেব প্রত্যুত্তরে যা বলেছিলেন আর আমি মাতৃক্রোড়ে বসে যা শুনেছিলাম, বলছি ; শোন।

মহাপ্রলয়ে যখন বিনষ্ট হল স্থাবর-জঙ্গম ; চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত হল ; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ যখন হল অব্যক্ত, তখন মন ও বাক্যের অগোচর বেদ-স্বীকৃত অদ্বিতীয়স্বরূপ, মায়া-বিবর্জিত, শাশ্বত-সনাতন পরম ব্রহ্ম ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কল্পনা করলেন এক দ্বিতীয় মূর্তি। আমিই (মহাদেবই) সেই মূর্তি, পণ্ডিতগণ যাকে নবীন ও প্রাচীন ব্রহ্ম বলে কীর্তন করে থাকেন। অনন্তর অদ্বিতীয় স্বরূপ আমি বিহার-অভিলাষ স্বীয় শরীর হতে সৃষ্টি করলাম শক্তিকে—পণ্ডিতেরা যাকে বলেছেন, 'প্রধান, মায়া, গুণবতী, পরা, বুদ্ধিতত্ত্বের জননী ও বিকারবর্জিতা' আর নির্মাণ করলাম অবিমুক্ত ক্ষেত্র। সেই শক্তি হলেন প্রকৃতি।

অতঃপর সেই প্রকৃতি ও পুরুষ পরমানন্দে পঞ্চক্রোশ-পরিমিত কাশীক্ষেত্রে লীলাসহকারে বিহার করেন। এই ক্ষেত্র তাঁদেরই পদতল থেকে নির্মিত আর প্রলয়কালেও যেহেতু তাঁরা এই ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন না, তাই 'অবিমুক্ত' ক্ষেত্র—

"ন যদা ভূমিবলয়ং ন যদাপাং সমুদ্ভবঃ।
তদা বিহর্তুমীশেন ক্ষেত্রমেতদ্বিনির্ম্মিতম॥ (২৬/২৮)

—যখন ছিল না ভূমণ্ডল, জলেরও সৃষ্টি হয়নি, সেই সময় স্বয়ং ঈশই বিহারে অভিলাষী হয়ে নির্মাণ করেছিলেন এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র।

এই ক্ষেত্র হল মহাদেব ও পার্বতীর নিরন্তর সুখাস্পদ রমণীয় পর্য্যঙ্কস্বরূপ। আনন্দদায়ী বলে মহাদেব প্রথমে এর নাম রেখেছিলেন 'আনন্দকানন' তার পরে 'অবিমুক্ত'। একথা নিশ্চিত জানবে, অগস্ত্য, আনন্দকানন কাশীক্ষেত্রে দৃষ্ট ইতস্ততঃ প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি শিবলিঙ্গই আনন্দকন্দবীজসমূহের অঙ্কুরস্বরূপ।

এরপর দেব স্কন্দ অগস্ত্যের কাছে মণিকর্ণিকার মাহাত্ম্যকীর্তনে প্রবৃত্ত হলেন।

সেই পুরাকালে মহেশ্বর ও মহামায়া বিহার করতে করতে একদিন সঙ্কল্প নিলেন—অপর একজন পুরুষ সৃজন করবেন, যাঁর উপর সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁরা নিশ্চিন্তে কাশীক্ষেত্রে মৃত ও শরণাপন্ন জীবদেরই নির্বাণ-দান কার্যে রত থাকতে পারবেন। চৈতন্যরূপিনী জগজ্জননীর সঙ্গে জগৎপিতা পরমেশ্বর ধূর্জটি সঙ্কল্পীভূত হবার পর স্বকীয় বাম অঙ্গের উপর যে মুহূর্তে স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, সেই মুহূর্তেই আবির্ভূত হলেন ত্রৈলোক্যসুন্দর অনুপমেয় এক পুরুষ—পুরুষোত্তম। সত্ত্বগুণাশ্রয়ী শান্তশ্রী, সমুদ্রবিজয়ী গাম্ভীর্যসদৃশ সেই পুরুষের দেহকান্তি ছিল ইন্দ্রনীলমণির মত, সুবর্ণবর্ণ নেত্রপদ্ম, চতুর্ভুজ, নাভিদেশে সুগন্ধ শতদল পদ্মশোভিত।

সেই মহাপুরুষকে অবলোকন করে মহাদেব বললেন: "মহাবিষ্ণুর্ভবাচ্যুত"—হে অচ্যুত: তুমি মহাবিষ্ণু হও আর—

"তব নিশ্বসিতং বেদাস্তেভ্যঃ সর্বমবৈষ্যসি।
বেদদৃষ্টেন মার্গেণ কুরু সর্ব্বং যথোচিতম্॥" (২৬/৪৯)

তোমার নিঃশ্বাস থেকেই বেদসকল আবির্ভূত হবে, আর তা থেকেই তুমি সব জানতে পারবে। বেদপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে তুমি যথোচিত বিধান কোরো।—এই বলে মহেশ্বর মহামায়ার সঙ্গে চলে গেলেন আনন্দকাননে।

মহাদেবের নির্দেশে বিষ্ণু সেখানে প্রথমে নিজের চক্রদ্বারা এক

রমণীয় পুষ্করিণী খনন করে স্বীয় গাত্র-স্বেদ সলিলে তা পরিপূরিত করলেন। অতঃপর তার তীরে বসে নিমীলিত নেত্রে বিষ্ণু বসলেন নিশ্চল তপস্যায়। এইভাবে পঞ্চাশ হাজার বছর অতিক্রান্ত হলে ভবানীর সঙ্গে ভবানীপতি বিষ্ণুর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। বারবার স্বীয় মস্তক আন্দোলন করতে করতে বললেন, 'তোমার চিত্তের অসীম ধৈর্য্য আর মহতী তপস্যায় তুমি নিজেই বহ্নিদীপ্ত হয়ে উঠেছ। হে মহাবিষ্ণো! কী প্রয়োজন আর তোমার এই তপস্যার। তুমি বর প্রার্থনা কর।'

বিষ্ণু প্রার্থনা জানালেন—সর্বদাই যেন ভবানীর সঙ্গে ভবানীপতির চরণ দর্শন হয়। মহাদেব সম্মতি জানালেন বিষ্ণুর প্রার্থনায়। আর বললেন,—হে বিষ্ণু! তোমার মহতী তপস্যা অবলোকন করে বিস্ময়ে বারবার আমার মস্তক আন্দোলিত হয়েছিল।

"তদান্দোলনতঃ কর্ণাৎ পপাত মণিকর্ণিকা।
মনিভিঃ খচিতা রম্যা ততোঽস্তু মণিকর্ণিকা॥" (২৬/৬৩)

—সেই আন্দোলনের ফলে আমার কর্ণ থেকে মণি-খচিত রমণীয় মণিকর্ণিকা এই স্থানেই পতিত হয়েছে। এই স্থান তাই 'মণিকর্ণিকা' নামে প্রসিদ্ধ হবে।

বিষ্ণুর প্রার্থনায় সেইদিন থেকে মণিকর্ণিকা হল সর্বতীর্থ শ্রেষ্ঠা এবং—

"কাশতেঽত্র যতো জ্যোতিস্তদনাখ্যেয়মীশ্বরঃ।
অতো নামাপরঞ্চাস্তু কাশীতি প্রথিতং বিভো॥" (২৬/৬৭)

আর প্রার্থনা জানালেন,—হে বিভো! সেই অনাখ্যেয় জ্যোতিঃ-স্বরূপ ঈশ্বর যে কারণে এই ক্ষেত্রে শোভা পেয়ে থাকেন, সেই কারণে সংসারে এই স্থান 'কাশী' নামে বিখ্যাত হোক।

আরও প্রার্থনা জানালেন—পঞ্চক্রোশী এই কাশীর নাম গ্রহণে যেন সর্ব পাপ বিদূরিত হয়; শশক, মশক, কীট, পতঙ্গ, তুরঙ্গ, ভুজঙ্গ প্রভৃতি জীবগণের এখানে দেহাবসানে যেন মুক্তিলাভ ঘটে; চার বেদ সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করলে যে পুণ্য হয়, এখানে লক্ষ গায়ত্রী জপে যেন সেই

পুণ্য অর্জিত হয়। শ্রদ্ধা-সহকারে কাশীর দর্শনই যেন পুণ্য সঞ্চয়ের হেতু হয়।

জগৎপতি দেবদেব মহাদেব প্রসন্নচিত্তে বিষ্ণুর অভীপ্সা পূরণ করে বললেন—হে মহাবাহো! তোমার ইচ্ছাই পূরণ হবে। বেদোক্ত বিধানে তুমি সৃষ্টি করো, ধর্মানুসারে পালন কর আর অধার্মিকের নাশকারক হও। যারা তপোবলে গর্বিত হয়ে তোমার অবমাননা করবে, তাদের বিনাশ আমি করব। আর কাশীক্ষেত্রের যাবতীয় শাসনভার আমার। যে যেখানে যেভাবেই মৃত্যুর কবলে পতিত হোক না কেন, কাশীর স্মরণই তাকে পুণ্যফল দেবে। পাপকারীগণের কাশী-প্রবেশ হবে পাপমুক্তির উপায়; মণিকর্ণিকায় স্নান হবে সর্বতীর্থ স্নানের শ্রেষ্ঠ স্নান।

মহাদেব পার্বতীকে বলেছিলেন ঃ

"অবিমুক্তং মহৎ ক্ষেত্রং পঞ্চক্রোশপরীমিতম্।

জ্যোতির্লিঙ্গং তদেকং হি জ্ঞেয়ং বিশ্বেশ্বরাভিধম্॥" (২৬/১৩১)

—পঞ্চক্রোশপরিমিত অবিমুক্তক্ষেত্রকে মহৎ ক্ষেত্র এবং বিশ্বেশ্বরকে জ্যোতির্লিঙ্গস্বরূপ জানবে।

যোগে বিঘ্ন আছে, তপস্যাও ক্লেশসাধ্য। আবার তপস্যা ও যোগ-ভ্রষ্ট হলে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। কিন্তু কাশীতে মৃত্যু হলে রুদ্রপিশাচ হয়ে সে মুক্তিলাভ করবে। এখানে যেহেতু একমাত্র আমিই শাসক, যমদূতগণের প্রবেশ ক্ষমতা নেই।

অতঃপর দেব স্কন্দ পার্বতী-সমীপে মহাদেব-কর্তৃক কীর্তিত কাশীর বারাণসী প্রভৃতি অপরাপর নামের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তা বললেন অগস্ত্যকে।

সূর্যবংশে পরম ধার্মিক এবং মহাতেজস্বী নরপতি ভগীরথ যখন শুনলেন কপিলের ক্রোধাগ্নিতে তাঁর পূর্বপুরুষেরা দগ্ধ হয়ে রয়েছেন, তখন তাঁদের উদ্ধার কামনায় রাজ্যভার অমাত্যদের হস্তে অর্পণ করে গঙ্গার আরাধনায় কৃতনিশ্চয় হয়ে তপস্যায় রত হলেন হিমালয়। দেবাদিদেব বিষ্ণুকে বলেছিলেন,

"মমৈব সা পরা মূর্ত্তিস্তোয়রূপা শিবাত্মিকা।
ব্রহ্মাণ্ডানামনেকানামাধবঃ প্রকৃতিঃ পরা॥
শুদ্ধবিদ্যাস্বরূপা চ ত্রিশক্তিঃ করুণাত্মিকা।
আনন্দামৃতরূপা চ শুদ্ধধর্ম্মস্বরূপিনী॥" (২৭/৭-৮)

—সেই মঙ্গলময়ী জলরূপা গঙ্গা আমারই আত্মিকা। তিনিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধারভূতা পরমাপ্রকৃতি। শুদ্ধবুদ্ধিস্বরূপা, ত্রিশক্তি-রূপিনী, করুণাময়ী তিনিই আনন্দামৃতরূপা এবং শুদ্ধধর্মরূপিণী।

ব্রহ্মশাপাগ্নিতে দগ্ধ জীবনের তিনিই একমাত্র মুক্তিদাত্রী এবং সর্বদুর্গতিনাশিনী। সত্যযুগে সর্বত্রই তীর্থ, ত্রেতাযুগের তীর্থ পুস্কর, দ্বাপরের তীর্থ কুরুক্ষেত্র আর কলির তীর্থ হল গঙ্গা। সত্যযুগে ধ্যানই ছিল মোক্ষের উপায়, ত্রেতায় ধ্যান এবং তপস্যা, দ্বাপরে ধ্যান আর কলিযুগে গঙ্গাস্নান।

শ্রদ্ধাবনত এবং ভক্তিপ্লুত চিত্তে গঙ্গার শরণ কলিযুগে অনিবার্য মোক্ষের কারণ। কেননা, সূক্ষ্মধর্ম, পরমজ্ঞান, পরম তপস্যা, স্বর্গ সব কিছুর মূলেই শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা এবং ভক্তিসহকারে নিত্যস্নায়ী স্নানান্তে শিবলিঙ্গের অর্চনা করলে একজন্মেই মুক্তি লাভ করে থাকে। বহুতর সিদ্ধি ও সিদ্ধলিঙ্গ, নানাবিধ স্পর্শলিঙ্গ, রত্নখচিত প্রাসাদনিচয় চিন্তামণি মণিসমূহ, কলির ভয়ে ভীত হয়ে গঙ্গাজলমধ্যে আত্মগোপন করে থাকেন। তাই স্নানে যেমন পুণ্য ; স্পর্শে এবং দর্শনেও তেমনি পুণ্য।

"যথাশ্বমেধো যজ্ঞানাং নাগানাং হিমবান্ যথা।
ব্রতানাঞ্চ যথা সত্যং দানানামভয়ং যথা॥
প্রাণায়ামশ্চ তপসাং মন্ত্রাণাং প্রণবো যথা।
ধর্ম্মাণাপ্যহিংসা চ কাম্যানাং শ্রীযথা বরা॥
যথাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং স্ত্রীণাং গৌরী যথোত্তমা।
সর্ব্বদেবগণানাঞ্চ যথা ত্বং পুরুষোত্তম॥
সর্ব্বেষামেব পাত্রাণাং শিবভক্তো যথা বরঃ।
তথা সর্ব্বেষু তীর্থেষু গঙ্গা তীর্থং বিশিষ্যতে॥" (২৭/১০-১৩)

—যজ্ঞসমূহমধ্যে যেমন অশ্বমেধ, পর্বতসমূহ মধ্যে যেমন হিমালয়,

ব্রতসমূহ মধ্যে সত্য, দানসমূহে যেমন অভয়, তপঃসমূহে যেমন প্রাণায়াম, মন্ত্রসমূহে যেমন প্রণব, ধর্মসমূহ মধ্যে যেমন অহিংসা, কাম্য-সমূহে যেমন লক্ষ্মী, বিদ্যাসমূহে যেমন আত্মবিদ্যা, স্ত্রীসমূহ মধ্যে যেমন গৌরী আর হে পুরুষোত্তম, দেবসমূহ মধ্যে যেমন তুমি, সর্বপ্রকার পাত্র-মধ্যে শিবভক্ত যেমন শ্রেষ্ঠ, সর্বতীর্থ মধ্যে গঙ্গাই তেমনি শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

সেই কলিকলুষনাশ গঙ্গায় শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে স্নান, সেবা, গঙ্গা-তীরে বিশুদ্ধান্তঃকরণে বাস, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গঙ্গাজল দান, ব্রতাদি কর্ম এবং "ওঁ নমঃ শিবায়ৈ গঙ্গায়ৈ শিবদায়ৈ নমো নমঃ। নমস্তে বিষ্ণুরূপিণ্যৈ ব্রহ্মমূর্ত্যৈ নমোহস্তু তে॥"—হে গঙ্গে, মঙ্গলদায়িণী শিবাস্বরূপিনী, ব্রহ্মমূর্তি ও বিষ্ণুরূপিণী, তোমাকে নমস্কার ইত্যাদি স্তবে যারা তুষ্ট করে তারা কায়িক, বাচিক ও মানসিক দশবিধ পাপ থেকে অবশ্যই মুক্তি লাভ করে। বিশেষতঃ কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গার ন্যায় পবিত্র ও পাপনাশিনী আর কিছুই নেই কারণ, সেই অবিমুক্তক্ষেত্রে আমার সর্বদা অবস্থান।

যে কোন অবস্থাতেই মৃত জীবের অস্থি গঙ্গায় পতিত হলে তার কিরকম সদ্‌গতি হয় বিষ্ণুর নির্বন্ধাতিশয্যে দেবদেব তাঁকে যে কাহিনী বলেছিলেন, দেব স্কন্দ অতঃপর তা শোনালেন অগস্ত্যকে।

পুরাকালে কলিঙ্গদেশে স্নান, সন্ধ্যা ও বেদ-বিবর্জিত লবণ-বিক্রয়-কারী এক ব্রাহ্মণ ছিল। নাম তার বাহীক। ব্রাহ্মণ বংশজ হলেও নামে মাত্র ব্রাহ্মণ সেই বাহীক কৌবিন্দী নামে তন্তুবায়-জাতীয়া এক নবীনা বিধবাকে বিবাহ করেছিল। কোন এক সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে কৌবিন্দী পতির সঙ্গে দেশান্তরী হল। পথিমধ্যে দণ্ডকারণ্যে ক্ষুধাতুর সেই ব্রাহ্মণ বাহীক হল ব্যাঘ্রের শিকার। ব্রাহ্মণ নিহত হলে এক শকুন তার বাঁ পা নিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে আকাশে উড়ল। তখন আর এক ক্ষুধাতুর শকুন আকাশপথে সেই শকুনের কাছ থেকে গ্রহণাভিলাষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল। দুই শকুনে যখন চলেছে সংগ্রাম, হঠাৎ পাদগুল্ফটি চঞ্চুচ্যুত হয়ে নিপতিত হল গঙ্গাজলে।

এদিকে ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যমকিঙ্করেরা এসে

তার সূক্ষ্মদেহকে দৃঢ়ভাবে রজ্জুবদ্ধ করলে এবং দুরন্ত প্রহার করতে করতে তাকে নিয়ে উপস্থিত হল যমরাজের সামনে। প্রহারের ফলে ব্রাহ্মণ তখন রুধির বমন করছে। যমরাজ তখন চিত্রগুপ্তকে ডেকে বাহীকের পাপ-পুণ্যের হিসাব এবং বিচার করতে বললেন।

চিত্রগুপ্ত তখন এই ব্রাহ্মণের জীবন-বৃত্তান্ত পরীক্ষা করে যমরাজকে বললেন, এই দুরাত্মা পাঁচ বছর বয়স থেকেই পরস্বাপহরণ, দ্যূতক্রীড়ায় রত হয়েছিল। ব্যাভিচারিণী শূদ্রাণীর সঙ্গে সহবাস, দণ্ডাঘাতে গাভী হত্যা, জননীকে পদাঘাত, পিতৃবাক্যের অবমাননা করে এসেছে জীবনভোর। অকারণ জীবহত্যা, শূদ্রান্নে শরীর পোষণ. পর্বদিনেও মৈথুন পরায়ণ, অনৃতভাষী, সর্বদা হিংসাশ্রয়ী এই বাহীক সাধুগণেরও অনিষ্ট সাধনে পরাঙ্মুখ ছিল না। শিশ্নোদর-পরায়ণ এই পাষণ্ড কাউকে কোনদিন কিছু দানও করেনি। এ সাক্ষাৎ মূর্তিমান পাতক। হে রবিজ! একে ঘোর রৌরব, অন্ধতমিস্রা, কুম্ভীপাক, অতি রৌরব, কালসূত্র, কৃমিভক্ষ, পূঁযশোণিতকর্দম, অসিপত্রবন, যন্ত্রপীড়, সুত্রংস্ট্রক, অধোমুখ, পূতিগন্ধ, বিষ্ঠাগর্ত, সূচীভেদ্য, সন্দংশ, লালাপ এবং ক্ষুরধার নামক প্রতিটি নরকে এক এক কল্প রাখা উচিত। চিত্রগুপ্তের পরামর্শে যমরাজের আদেশে কিঙ্করেরা বাহীককে তৎক্ষণাৎ নিয়ে গেল ঘোর রৌরবে।

এদিকে শকুনের মুখ থেকে বাহীকের অস্থি গঙ্গাজলে নিপতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সুরলোক থেকে ঘণ্টা নিনাদিত, শত দিব্যস্ত্রী-সঙ্কুল এক দিব্য রথ এসে উপস্থিত হল এবং গঙ্গায় অস্থি পতন-জনিত পুণ্যফলে বাহীকও দিব্যবেশ ধারণ, দিব্যগন্ধানুলেপনে অনুলিপ্ত হয়ে দিব্য-বিমানে স্বর্গলোকে গমন করলে।

'ত্রিপথগা' গঙ্গাই হল শ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং শ্রেষ্ঠ নদী।

অগস্ত্য প্রশ্ন করেন,—শরীরের শক্তাশক্ত অনুসারে সকলেরই ত' গঙ্গাস্নান সম্ভব নয়, আর সব দেশেই গঙ্গা নেই। তাহলে তাদের মুক্তির উপায় কি?

দেব স্কন্দ বললেন,—সেখানে একটাই মাত্র উপায় পবিত্রচিত্তে স্পষ্টাক্ষরে গঙ্গার সহস্রনাম স্তোত্র পাঠ। গঙ্গাস্নানের প্রতিনিধি এই স্তোত্র হল মুক্তিবীজাক্ষর-স্বরূপ।

এই সুখদা-ত্রিপথগা গঙ্গাকে ব্রহ্মশাপদগ্ধ পিতামহগণের উদ্ধারের অভিলাষে ভগীরথ মহাদেবের আরাধনা করে গঙ্গাকে ভূতলে নিয়ে এলেন পথ দেখিয়ে। নিয়ে এলেন তাঁকে পুরোগামী হয়ে মণিকর্ণিকায়; নিয়ে এলেন মহাদেবের আনন্দ-কাননে হরির চক্রপুষ্করিণীতে। পূর্ব থেকেই মুক্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত। এখন সুরধনি গঙ্গার মিলনে মণিকর্ণিকা হয়ে উঠল দেবগণেরও দুর্লভ।

সেই সময় এই মুক্ত পুরীর রক্ষণাবিধানে বদ্ধপরিকর হয়ে যম, ইন্দ্র, অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ অবিমুক্তক্ষেত্রের দক্ষিণে দুষ্টগণের প্রবেশ প্রতিরোধিনী 'অসি' নদী, আর উত্তরদিকে পাপীগণের অনায়াস মোক্ষপ্রাপ্তি বাসনার প্রতিবন্ধক স্বরূপ 'বরণা' নদী নির্মাণ করলেন। বরণা ও অসির সঙ্গম লাভ করে কাশীর অপর নাম হল 'বারাণসী'।

কেবলমাত্র এই দুটি নদী নির্মাণ করেই দেবগণ বারাণসীতে যথেচ্ছ প্রবেশ পথ রোধ করেন নি, পশ্চিম ভাগ রক্ষা করার জন্য আদেশ দিলেন দেহলী বিনায়ককে। বিশ্বেশ্বর যাদের কাশী প্রবেশে অনুমতি দেবেন, অসি, বরণা আর দেহলী বিনায়ক একমাত্র তাদেরই বারাণসীতে প্রবেশ করতে দেন।

এই প্রসঙ্গেই দেব স্কন্দ অগস্ত্য-সমীপে কীর্তন করলেন এক পুরা কাহিনী।

দাক্ষিণাত্যে সেতুবন্ধ সমীপে ধনঞ্জয় নামে এক মাতৃভক্ত বণিক বাস করত। যেমন ছিল তার রূপ, তেমনি ছিল তার গুণ, উদারতা, সহৃদয়তা, সত্যপ্রিয়তার অতুলনীয় আধার কৃষ্ণভক্ত সেই বণিক, স্বধর্ম-নিরত থেকেও ছিল সদাচার নিষ্ঠ। কালক্রমে ধনঞ্জয়ের জরাতুরা পত্নী ব্যাধিপীড়িতা হয়ে মৃত্যুমুখে পতিতা হল। যৌবনে ধনঞ্জয়-জননী ছিল মোহাবিষ্টা, যৌবনমদে মত্তা। মেঘছায়ার ন্যায় চঞ্চল যৌবনকে নিয়ে নিজের পতিকেও বঞ্চনা করতে দ্বিধা করেনি সে। মৃত্যুর

পর তাই তার উপযুক্ত নরকেই সে গমন করেছিল।

মাতৃভক্ত ধনঞ্জয় কিন্তু মৃতের সদ্‌গতির উদ্দেশে জননীর অস্থিসমূহ তাম্রাধারে সংগ্রহ করে গঙ্গার অভিমুখে গমন করল। যথাবিধি যক্ষকর্দমাভ্যন্তরস্থ অস্থি চেলবস্ত্রে বন্ধন করে সর্বদাই শুদ্ধাচারে থেকে পদব্রজে চলতে চলতে একসময় সে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ল। ফলে, বাধ্য হয়ে তাকে নিতে হল এক ভারবাহী।

কোনরকমে কাশীতে উপস্থিত হয়ে ধনঞ্জয় ভারবাহী শবরের উপর সব রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে ভোজনদ্রব্য ক্রয় করার জন্য বিপণিতে গেলে শবর তাম্রাধারটি ধনজ্ঞানে চুরি করে নিজগৃহে পালাল। তারপর সেখান থেকে এক নির্জন অরণ্যে গিয়ে তাম্রাধারটি খুলে কতকগুলি অস্থি দেখে হতোদ্যম হয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করল।

এদিকে বণিক ফিরে তাম্রাধারটি অপহৃত হয়েছে দেখে বিষণ্নচিত্তে খুঁজতে খুঁজতে গেল সেই শবরের বাড়ি। বাড়িতে চেল বস্ত্রখণ্ডটি দেখে তার স্থির বিশ্বাস হল, শবরই সেটি অপহরণ করেছে। বিনিময়ে প্রভূত অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিলে শবর তাকে নিয়ে চলল সেই বনে। কিন্তু এমনি ব্যাপার যে শবর দিকভ্রান্ত হল। চতুর্দিক ঘুরেও আগের ঠিক সেই স্থানটিতে পৌঁছোতে না পেরে, বণিককে বনের মধ্যে রেখেই সে ফিরে এল। ধনঞ্জয় এরপর সেই বনের মধ্যে দু'তিন দিন অস্থির অন্বেষণ করে ফিরল। অবশেষে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে প্রত্যাগমন করতে বাধ্য হল কাশীতে। কাশীতে এসেও মাতৃ-অস্থি তার আর গঙ্গায় দেওয়া হল না, গয়া আর প্রয়াগে পারলৌকিক কাজ সেরে তাই বাধ্য হয়েই বণিককে ফিরে যেতে হল স্বদেশে।

তাই বলছিলাম, বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞা ছাড়া কাশীবাস কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

মহাদেব বলেছিলেন, জলচর, স্থলচর প্রভৃতি যে সকল জীবই কাশীতে বাস করুক না কেন দেহান্তে তারা রুদ্র দেহ ধারণ করে আমাতেই লীন হয়। স্বর্গে বর্ষবাণ, অন্তরীক্ষে বাতবান, পৃথিবীতে অন্নবান নামে খ্যাত যে সমস্ত রুদ্রগণ বিরাজিত, পূর্বাদি দিকে দশ দশ

সংখ্যক যে সকল রুদ্র আছেন, বেদবাদিগণ উর্ধ্বস্থিত যে রুদ্রগণের বর্ণনা করেন, যে সকল অসংখ্য রুদ্র পাতালদেশে বিদ্যমান, কাশীতে রুদ্ররূপী যে জীবগণ বাস করেন, সকলের চেয়ে তারাই হলেন শ্রেষ্ঠ। সেই কারণে কাশীর অপর এক নাম হল 'রুদ্রাবাস।'

—আবার প্রলয়কালে মহাভূতগণ, মহাকালমূর্তি পরমেশ্বর মহাদেব, যাঁর অপর নাম মহাবিষ্ণুতে অন্তর্হিত-আত্মা হয়ে শবরূপে কাশীতে শয়ন করে থাকেন, তাই কাশীর অন্য এক নাম 'মহাশ্মশান'।

দেবদেব শম্ভু মহাদেবী এবং মহাবিষ্ণুর কাছে কাশীর নাম পরম্পরা যেভাবে বলেছিলেন, দেব স্কন্দ সেইভাবে তা শোনালেন কলসোদ্ভব অগস্ত্যকে।

[অধ্যায় ৩১]

কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য অতঃপর দেব স্কন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"কোঽসৌ ভৈরবনামাত্র কাশীপুর্য্যাং ব্যবস্থিতঃ।
কিং রূপমস্য কিং কর্ম্ম কানি নামানি চাস্য বৈ॥" (৩১/৩)

—কাশীতে ভৈরব নামে কে অবস্থিত ? তাঁর রূপ, কর্ম আর নাম-সমূহই বা কি ? আর ভৈরবের অনুগ্রহই বা কিভাবে লাভ করা যায় ?

দেব স্কন্দ বললেন—পুরাকালে একবার সুমেরুশৃঙ্গে মহর্ষিগণ সমবেত হয়ে লোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করে জানতে চাইলেন, একমাত্র কোন্ তত্ত্ব অব্যয়! ব্রহ্মা মহেশের মায়ায় মোহিত হয়ে বললেন, "আমিই জগদ্‌যোনি, আমি বিধাতা, আমি স্বয়ম্ভু, আমিই এক ঈশ্বর, আমিই অনাদি ব্রহ্মস্বরূপ। আমার অর্চনা না করলে কেউই মুক্তি লাভ করতে পারে না। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমিই জগতের একমাত্র সৃষ্টি ও প্রলয়কর্তা। আমা হ'তে আর কেউ শ্রেষ্ঠ নেই।" ব্রহ্মার এই কথা শুনে নারায়ণ-অংশ সম্ভূত ক্রতু (যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) ক্রোধারক্ত লোচনে ব্রহ্মাকে বললেন—"পরমতত্ত্ব

না জেনে এসব তুমি কি বলছ ? হে অজ্ঞ ! আমিই লোকসমূহের কর্তা, যজ্ঞ ও পরম নারায়ণস্বরূপ। আমাকে অনাদর করলে জগৎ হবে জীবনহীন। আমিই পরম জ্যোতি, পরমাগতি। আমা কর্তৃক প্রেরিত হয়েই তুমি এই সমস্ত সৃষ্টি করেছ।"

পরস্পর-বিবদমান ব্রহ্মা এবং ক্রতু জয়াভিলাষে শরণাপন্ন হল প্রমাণস্বরূপ চার বেদের।

ঋগ্বেদ বললেন—"ভূতগণ যাঁর অন্তরে অবস্থিত, যা থেকে সমস্ত উৎপন্ন এবং মহাত্মাগণ যাঁকে 'পর' বলে থাকেন, সেই একমাত্র রুদ্রই পরম তত্ত্ব। যজুর্বেদ বললেন, "যে ঈশ যজ্ঞসমূহ এবং যোগের দ্বারা অর্চিত এবং যাঁর দ্বারা লোকে আমরা প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হয়েছি, সেই সর্বদর্শী শিবই একমাত্র পরম তত্ত্ব।" সামবেদ বললেন, "এই বিশ্বকে যিনি ভ্রমণ করাচ্ছেন, যোগিগণ দ্বারা যিনি বিচিন্তিত, যাঁর দীপ্তিতে বিশ্ব প্রকাশিত, সেই ত্র্যম্বকই পরম তত্ত্ব। অথর্ববেদ বললেন, "কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণ যে দেবেশকে দর্শন করে থাকেন, সেই কৈবল্য-রূপী দুঃখহারী শঙ্করকেই, মহাত্মাগণ একমাত্র পরম তত্ত্বরূপে কীর্তন করে থাকেন।"

শ্রুতির এই জাতীয় কথা মনঃপুত হল না ব্রহ্মা এবং ক্রতুর। ঈষৎ হাস্য-সহকারে বললেন, যে দেবেশ রুদ্র বা শিবকে তোমরা পরমতত্ত্ব-রূপে প্রমাণ দিতে চাইছ, সে তো বৃষবাহন, অহিভূষণ, জটাধারী, দিগম্বর, শ্মশানবাসী, আর শিবার সঙ্গে ক্রীড়ারত। কিভাবে সেই প্রমথনাথ পরম ব্রহ্মত্ব লাভ করতে পারে ?

ঠিক সেই সময়েই তাঁদের সামনে আবির্ভূত হলেন অমূর্ত সনাতন স্বয়ং প্রণবাত্মা। বললেন, "লীলবিগ্রহধারী ভগবান হর আত্মার শক্তি ছাড়া আর কারো সাথে কখনো লীলা করেন না। ঐ আনন্দ-রূপা শিবা কোন বহিরাগতা নন, উনি শিবেরই শক্তি।"

এতেও ব্রহ্মা এবং ক্রতুর মোহনাশ এবং অজ্ঞানান্ধকার দূর হল না। সেই সময় তাঁদের মাঝে পৃথিবী এবং স্বর্গের মধ্যস্থল উদ্ভাসিত করে আবির্ভূত হল এক মহৎ জ্যোতি। জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যে দৃষ্ট হল

এক পুরুষাকৃতি। তাই দেখে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। কে এই হিরণ্যগর্ভ! মনে এই প্রশ্ন উদিত হওয়া মাত্রই তাঁরা দেখলেন ত্রিশূলহস্ত, ভাললোচন, সর্প-বিভূষণ, চন্দ্রশেখর মহাদেবকে। দেখামাত্র ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ মুখর হয়ে উঠে বলল—"হে চন্দ্রশেখর! আমি তোমাকে জানি, তুমি আমার কপাল হতে উৎপন্ন হয়েছিলে। রোদন করেছিলে বলে তোমার নাম রেখেছিলাম 'রুদ্র'। সুতরাং তুমি আমারই পুত্র। আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে রক্ষা করব।" প্রজাপতির এই উদ্ধত বাক্য শুনে কোপ-বিশিষ্ট সেই পুরুষাকার হতে ভৈরবাকৃতি এক পুরুষের সৃষ্টি হল। চন্দ্রশেখর তাঁকে বললেন, "হে কালভৈরব! তুমি এই ব্রহ্মাকে শাসন কর। তুমি কালের ন্যায় দীপ্তিমান, তাই তুমি 'কালরাজ' নামে বিখ্যাত হবে। যেহেতু তুমি বিশ্বকে ভরণ করতে সমর্থ, তাই তোমার অপর নাম হবে 'ভৈরব'। কালও তোমাকে ভয় করবে, তার জন্যে আর এক নাম হবে 'কালভৈরব'। তুমি যখন দুষ্ট হয়ে দুষ্টগণকে দমন করবে, তখন তোমার নাম হবে 'আমর্দক'। আর যেহেতু ভক্তগণের পাপসমূহকে তুমি নিমেষে ভক্ষণ করবে, তোমার অন্য এক নাম হবে 'পাপভক্ষণ'। আর—

"যা মে মুক্তিপুরী কাশী সর্ব্বাভ্যোঽপি গরীয়সী।
আধিপত্যঞ্চ তস্যাস্তে কালরাজ সদৈব হি ॥" (৩১/৪৬)

"—হে কালরাজ! সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমার যে মুক্তিপুরী কাশী রয়েছে, সেখানে তুমি সর্বদা আধিপত্য করবে।"

কালভৈরব এই বর লাভ করে তৎক্ষণাৎ বামহস্তের কণিষ্ঠাঙ্গুলির নখের অগ্রভাগ দিয়ে যে মুখে ব্রহ্মা শিবের অবমাননা করেছিল, সেই পঞ্চম মুখ ছিন্ন করে ফেলল।

তাই দেখে ক্রতু শঙ্করের স্তব করতে লাগলেন আর প্রজাপতিও শতরুদ্রী জপ করতে লাগলেন। অতঃপর দেব শঙ্কর প্রীত হলেন, আশ্বাস দিলেন আর স্বীয় অপর মূর্তি কপর্দী ভৈরবকে বললেন—ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ তোমার উপর অর্পিত হয়েছে। তুমি ব্রহ্মার

এই কপাল ধারণ করে ভিক্ষান্নে কাপালিক-ব্রত পালন কর। এই বলে তেজোময় দেব অন্তর্হিত হলে শিব রক্তবর্ণা রক্তবস্ত্রপরিহিতা, রক্তগন্ধানুলিপ্তা, রক্তমাল্যশোভিনী, করালবদনা, রুধির-পানরতা ব্রহ্মহত্যা নামে এক কন্যা উৎপাদন করে সেই ভৈরবনাদিনী ভয়ঙ্করীকে আদেশ দিলেন, কালভৈরব যে পর্যন্ত বারাণসীতে গমন না করছেন, সে পর্যন্ত তাঁর অনুগমন করতে। ব্রহ্মহত্যার সংসর্গে কৃষ্ণবর্ণ কালরাজ মহাদেবের আদেশে কাপালিক-ব্রত ধারণ করে কপালহস্তে ত্রিভুবন ভ্রমণ করেও পাপমুক্ত হলেন না। ত্রিভুবন পর্যটন করতে করতে এক সময় কালভৈরব এলেন নারায়ণের আলয়ে। নারায়ণ এবং লক্ষ্মী উভয়েই কপর্দীর মায়া-অন্তরালবর্তী রূপটি দেখে তাঁর অনেক স্তব-স্তুতি করলেন। নারায়ণ নানাভাবে বারবার দেবেশকে অনুরোধ করতে লাগলেন, এই মায়া লীলা ত্যাগ করতে। গোবিন্দ যখন এইভাবে অনুরোধ জানাচ্ছেন, লক্ষ্মী তখন মহাদেবের পাত্রে 'মনোরথবতী' নামে ভিক্ষা প্রদান করলেন। ভিক্ষা গ্রহণে তৃপ্ত কপর্দী প্রস্থানোদ্যত হলে ব্রহ্মহত্যাও আবার তার অনুগমনে উদ্যত হল। গোবিন্দ বারবার অনুরোধ করেও ব্রহ্মহত্যাকে নিরস্ত করতে পারলেন না। গোবিন্দ-বচনে প্রীত মহাদেব তাঁকে বর দিতে চাইলে, বিষ্ণু এই বর প্রার্থনা করলেন, পরমেশ্বর শঙ্করের চরণযুগলের সঙ্গে তাঁর যেন কখনো বিচ্ছেদ না ঘটে। ঈশ্বর, সেই বরই বিষ্ণুকে প্রদান করে বললেন, 'তুমি সমস্ত দেবগণের বরদাতা হবে।'

অতঃপর কপর্দী ভীষণাকৃতিতে যে মুহূর্তে কাশীতে প্রবেশ করলেন, ব্রহ্মহত্যা হাহাকার করে পাতালে প্রস্থান করলেন, ভৈরবের হাত থেকে ব্রহ্মার কপালও নিপতিত হল। আর তাই দেখে কালভৈরব সকলের সামনেই আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। যে স্থানে ভৈরব কপালমুক্ত হয়েছিলেন, সেই স্থান হল কপালমোচন তীর্থ। কালভৈরব সেই কপালমোচন তীর্থকে সামনে রেখে কাশীর আধিপত্য গ্রহণ করলেন। যমরাজের অগম্য কাশীর অধিবাসীগণের ভাগ্যনিয়ন্তারূপে অবস্থিত হলেন কালভৈরব।

বারাণসীতে বাস করে যারা এই কালভৈরবের অর্চনা না করে, শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাদের পাপ দিন দিন বাড়তে থাকে। আর—

"কালরাজং ন যঃ কাশ্যাং প্রতিভূতাষ্টমী কুজম্।
ভজেত্তস্য ক্ষয়েৎ পুণ্যং কৃষ্ণপক্ষে যথা শশী॥" (৩১—১৫৫)

কাশীতে থেকে যারা চতুর্দশী, অষ্টমী আর মঙ্গলবারে কালরাজের পূজা না করে, তাদের পুণ্য কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।

[অধ্যায় ৩২]

ঘটোদ্ভব অগস্ত্য অতঃপর দেব স্কন্দের কাছ থেকে জানতে চাইলেন হরিকেশের বৃত্তান্ত। হরিকেশ কার পুত্র? কিভাবেই বা তিনি বারাণসীর দণ্ডনায়ক হয়েছিলেন এবং "অন্নদত্ব" লাভ করে কাশীক্ষেত্রের শত্রুগণের সর্বদা ভ্রান্তি উৎপাদনকারী সম্ভ্রম এবং বিভ্রম নামক গণদ্বয়ের উপর আধিপত্য অর্জন করেছিলেন।

স্কন্দ বললেন, পুরাকালে গন্ধমাদন পর্বতে রত্নভদ্র নামে এক পরম ধার্মিক যক্ষ বাস করত। পূর্ণভদ্র নামে এক পুত্র লাভ করে রত্নভদ্র ধর্মানুসারে বিষয় ভোগের পর বৃদ্ধ বয়সে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে শান্তযোগবলে পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করলে পূর্ণভদ্র উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হল। সুখ-বিহারে সমর্থ্য হল বটে পূর্ণভদ্র কিন্তু পুত্রহীন হওয়ায় শান্তি ছিল না তার মনে, বিশাল প্রাসাদ মনে হতে লাগল নিস্তব্ধ শ্মশানভূমি।

একদিন একান্তে পত্নীসমূহের মধ্যেও প্রিয়তমা পত্নী যক্ষিণী কনককুণ্ডলাকে নিভৃতে ডেকে নিজের মনের খেদ প্রকাশ করলে তার কাছে। বিলাপরত পতিকে কনককুণ্ডলা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললে, হে নাথ! আপনি ত' জানেন, মহাদেবের ভক্তি থাকলে সর্ব মনোরথ সিদ্ধ হয়, অপত্যাদি ত' দূরের কথা মোক্ষও লাভ হয়। মহাদেবের

অনুগ্রহে শালঙ্কায়নের পুত্র শিলাদ নন্দীকেশ্বর নামে অমর পুত্র লাভ করেছিলেন ; শ্বেতকেতু কালপাশে বদ্ধ হয়েও জীবন লাভ করেছিলেন ; উপমন্যু ক্ষীর সমুদ্রের আধিপত্য লাভে সমর্থ্য হয়েছিলেন ; অসুরাধিপতি অন্ধক গাণপত্য পদে অভিষিক্ত হয়ে ভৃঙ্গিপদ লাভ করতে পেরেছিলেন ; দধীচি যুদ্ধে বাসুদেবকে জয় করেছিলেন ; দক্ষ প্রজাপতিত্ব পেয়েছিলেন।

"বিধাতুঃ শাম্ভবীং ভক্তিং প্রিয় সর্ব্বে মনোরথাঃ।
সিদ্ধয়োঽষ্টৌ গৃহদ্বারং সেবন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥" (৩২/৩৪)

—হে প্রিয়! মহাদেবকে যে ভক্তি করে তার সমস্ত মনোরথ সত্বরই পরিপূর্ণ হয়। এবং অনিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি তার গৃহদ্বারে অবস্থান করে, এতে কোন সংশয় নেই।

গীতজ্ঞ যক্ষরাজ পূর্ণভদ্র কনককুণ্ডলার পরামর্শ অনুসারে কাশীতে গীতবাদ্যের দ্বারা নাদেশ্বরকে পরিতুষ্ট করে অভিলষিত পুত্র লাভ করলে এবং তার নাম রাখলে 'হরিকেশ'। পুত্রলাভে মন-প্রাণ ভরে উঠল পূর্ণভদ্রের। এদিকে কিন্তু আট বছর বয়স থেকেই হরিকেশ ক্রমশঃ শিবভাবে ভাবিত হয়ে উঠতে থাকল। এমন কি খেলার সময়ও শিবলিঙ্গ নির্মাণ করে তৃণ দিয়ে তার পূজা-পূজা খেলা করত। মুখে অহরহ শিবনাম। আবার ঘুমঘোরেও স্পষ্ট বলে উঠত—'হে ত্রিলোচন! একটু অপেক্ষা করুন, আমি যাচ্ছি।' এই সব দেখে-শুনে পূর্ণভদ্র আপ্রাণ চেষ্টা নিলে পুত্রকে গৃহের ঐশ্বর্যাভিমুখী করার জন্যে। বললে—পুত্র এখন অর্থোপার্জন-বিদ্যা শেখার সময়। এখন ঐসব দরিদ্রবৃত্তি ত্যাগ করে সর্ববিদ্যা আয়ত্ত করে বৃদ্ধ বয়সে ভক্তিযোগের উপাসনা কোরো। হরিকেশ কিন্তু পিতার উপদেশে নির্বিকার থেকে, যা করছিল, তাতে আরও অভিনিবিষ্ট হয়ে পরল দেখে ক্রুদ্ধ হল পিতা পূর্ণভদ্র। একদিন পিতাকে ক্রোধারুণ দেখে হরিকেশ গোপনে গৃহত্যাগ করে সর্বগতির পরম গতিস্থান বারাণসীতে গিয়ে আনন্দকাননে তপস্যায় রত হল।

কিছুকাল অতীত হয়েছে। মহাদেব একদিন পার্বতীকে নিয়ে

আনন্দকাননে প্রবেশ করে সর্বসুখ ও শান্তির আকর প্রিয় লীলাকানন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন এমন সময় বনমধ্যে এক অশোক বৃক্ষমূলে তপস্যামগ্ন দেখলেন হরিকেশকে। স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হরিকেশ অস্থিচর্মসার, বল্মীকগ্রস্ত। প্রাণবায়ুর ঈষৎ আন্দোলনের ফলেই কেবল প্রতীয়মান হয় যে এখনও সে জীবিত আছে। স্তব্ধ হিংস্র শ্বাপদেরা বেষ্টন করে রয়েছে তার চতুর্দিক, যেন হিংসা ভুলে। অর্ধোন্মীলিত পিঙ্গলনেত্রে যেন তার সুধা ক্ষরণ হচ্ছে। দেখে যেন মনে হয়, স্বয়ং তপস্যা নররূপ ধারণ করে তপস্যামগ্ন হয়েছেন।

পার্বতী বিচলিতা হয়ে উঠলেন হরিকেশের ঐ নিদারুণ তপস্যা দেখে। অনুরোধ জানালেন মহেশকে কৃপা করার জন্যে। বৃষভবাহন মহেশ্বর তখন নন্দীর হাত ধরে বৃক্ষ হতে অবতরণ করে সমাধিস্থ হরিকেশকে স্পর্শ করতেই তার নয়নদ্বয় উন্মোচিত হল। সম্মুখে সহস্র সূর্যের তেজসম্পন্ন ত্রিলোচনকে দর্শন করে জয়ধ্বনি সহকারে তাঁকে প্রণাম জানাল হরিকেশ।

তুষ্ট শশিশেখর তখন তপোনিধি হরিকেশকে এই বলে বর দিলেন ঃ

"ত্বং দণ্ডপাণির্ভব নামতোঽধুনা সর্ব্বান্ গণান্ শাধি মমাজ্ঞয়োৎকটান্।
গণাবিমৌ ত্বামনুযায়িনৌ সদা নাম্না যথার্থ্যৌ নৃষু সম্ভ্রমোদ্ভ্রমৌ॥"

(৩২/১৫২)—

—আজ থেকে তুমি 'দণ্ডপাণি' হয়ে আমার আজ্ঞায় উৎকট গণসমূহকে শাসন করবে আর সম্ভ্রম এবং উদ্‌ভ্রম নামে গণদ্বয় সব সময়ই তোমার অনুগামী থাকবে।

সেই সঙ্গে তুমি কাশীবাসী জনগণের হবে অন্নদাতা, প্রাণদাতা এবং জ্ঞানদাতা। আমার প্রতিভূরূপে তুমিই তাদের সদ্‌গতি-বিধান করবে। এছাড়াও, কাশীতে গণ, দেব এবং মানবসমূহের মধ্যে তুমিই হবে প্রথম পূজনীয়। আগে হবে তোমার পূজা তার পরে আমার। হে দণ্ডপাণে! তুমি এই পুরী শাসন করার জন্যে, দুষ্টগণের দণ্ডবিধান এবং ভক্তগণকে অভয় দানের জন্যে আমার সামনে দক্ষিণ

দিকে তুমি অবস্থান কর।

কাহিনী শেষ করে স্কন্দ আক্ষেপ-সহকারে বললেন, আমি কাশীবাস কালে অসূয়া-বশে তার মর্যাদা রাখিনি, তাই আজ এখানে বাস করতে হচ্ছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে আজ তাই নিত্য এখান থেকে আমি তার ভজনা করি। আর হে কলস-সম্ভব! তোমার এই কাশীক্ষেত্র পরিত্যাগ, আমার আশঙ্কায় সেই দণ্ডপাণিরই ভ্রূকুটি।

[অধ্যায় ৩৩—৩৪]

ঘটোদ্ভব অগস্ত্য অতঃপর জ্ঞানবাপীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য জানতে সমুৎসুক হলে দেব স্কন্দ বললেন—

সত্যযুগে এই অনাদিসিদ্ধ সংসারে যখন মেঘসমূহ জলবর্ষন করত না, পৃথিবীর কোন কোন স্থানে মনুষ্যসঞ্চার শুরু হয়েছে, পান বা স্নানের নিমিত্ত মানুষের মনে যখন জলের কোন অভিলাষই ছিল না, তাছাড়া ক্ষীর ও লবণ সমুদ্র ছাড়া যখন আর কোথাও জলও ছিল না, সেই সময় একদিন, পূর্ব এবং উত্তর দিকের অধিপতি রুদ্র ঈশান ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতে করতে কাশীক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। ত্রিশূলধারী ঈশান প্রথমেই সর্বগণ পরিসেবিত সেই মহালিঙ্গ দর্শন করলেন—যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ক্রতু এবং ব্রহ্মার বিবাদ-ভঞ্জনে। চতুর্দিকে জ্যোতির্ময়ী মাল্যভূষিত সেই মহালিঙ্গকে ঘটপূর্ণ শীতল জলে স্নান করাবার প্রবল বাসনা জাগল ঈশানের অন্তরে। তৎক্ষণাৎ, রুদ্রমূর্তি ঈশান মহালিঙ্গের দক্ষিণভূমিতে ত্রিশূল দিয়ে প্রচণ্ডবেগে এক কুণ্ড খনন করে ফেললেন। আর সেই কুণ্ড থেকে সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল যেন জলপ্লাবন। স্বচ্ছ সে সলিল যেমনই নির্মল, সুস্বাদু, তেমনি শীতল, সুখস্পর্শ। ঈশান হৃষ্টচিত্তে হাজার কলস সেই জল দিয়ে মহালিঙ্গকে স্নান করাতে লিঙ্গাত্মা বিশ্বলোচন আবির্ভূত হয়ে ঈশানের কর্মের প্রশংসা করে বললেন :

"শিবং জ্ঞানমিতি ব্রূয়ুঃ শিবশব্দার্থচিন্তকাঃ।
তচ্চ জ্ঞানং দ্রবীভূতমিহ মে মহিমোদয়াৎ॥
অতো জ্ঞানোদনাম্নৈতত্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
অস্য দর্শন মাত্রেন সর্ব্বপাপৈ প্রমুচ্যতে॥ (৩৩/৩২-৩৩)

—'শিব'-শব্দের অর্থচিন্তকেরা 'শিব' শব্দের অর্থ "জ্ঞান" বলে থাকেন। সেই জ্ঞানই আমার মহিমায় এই স্থানে জলরূপে দ্রবীভূত হয়েছে। এইজন্যে এই তীর্থ জ্ঞানোদ তীর্থ নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হবে আর স্পর্শমাত্রেই সমস্ত পাপ বিদূরিত হবে।

এই তীর্থে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পারলৌকিক ক্রিয়া করলে পিতৃগণ প্রলয়কাল পর্যন্ত শিবলোকে বাস করবে। এই তীর্থ হবে শিবতীর্থ, জ্ঞানতীর্থ, তারকতীর্থ, মোক্ষতীর্থ। এই তীর্থজল দর্শন, স্পর্শন, স্নান এবং পানে ধর্মাদি চতুর্বর্গ লাভ হবে। মহেশ্বর এইভাবে জ্ঞানবাপীকে জ্ঞানোদ-তীর্থে প্রতিষ্ঠিত করে অন্তর্হিত হলে ঈশান সেই সলিল পানে পরমজ্ঞান লাভ করে নির্বৃতি লাভ করলেন।

স্কন্দ বললেন, হে কলসোদ্ভব! পুরাকালে কোন এক সময়ে এই জ্ঞানবাপীতে অপূর্ব এক ঘটনা ঘটেছিল, শোন ঃ

কাশীতে হরিস্বামী নামে এক সদ্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুশীলা নামে তার এক কন্যা ছিল। এমনি সুশ্রী, সুগঠিতা, সর্বগুণাধারা ছিল সেই কন্যারত্ন যে মানব, দেব, কিন্নর, বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব, অসুরদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে তাকে লাভ করতে সমুৎসুক ছিল। কিন্তু, সুশীলা সর্ববিষয়ে নির্বিকার থেকে প্রতিদিন জ্ঞানবাপীতে স্নান করে অনন্যচিত্তে শিবমন্দির সম্মার্জন করত। জ্ঞানোদতীর্থের এই সেবার ফলে অন্তরে বাহিরে সমস্ত জগৎই শিবময় দেখতে শুরু করেছিল।

এক রাত্রে গৃহাঙ্গনে শয়ান সুশীলা। কোন এক বিদ্যাধর তার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হয়ে তাকে হরণ করল। সুশীলাকে নিয়ে মলয় পর্বতের উদ্দেশ্যে আকাশপথে গমনোদ্যত বিদ্যাধর আক্রান্ত হল ঘোরাকৃতি ত্রিশূলধারী বিদ্যুন্মালী নামে এক রাক্ষস দ্বারা। বিদ্যুন্মালী ত্রিশূলাগ্রের দ্বারা বিদীর্ণ করল বিদ্যাধরের বক্ষ। ক্রোধারক্ত-লোচনে

বিদ্যাধরও প্রচণ্ড এক মুষ্টাঘাতে নিহত করল বটে বিদ্যুন্মালীকে কিন্তু ত্রিশূলাঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ায় নিজেও প্রাণত্যাগ করল। এদিকে অপহৃতা হলেও সুশীলা এই প্রথম পুরুষ-স্পর্শসুখ অনুভব করে বিদ্যাধরকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করে নিয়েছিল। তাই তার প্রাণবিয়োগে সুশীলাও বিরহে প্রাণত্যাগ করল।

জ্ঞানব্যাপীর জলপানের ফলে সুশীলার দেহাভ্যন্তরে সব-সময়ই অবস্থান করত তিনটি শিবলিঙ্গ। তাই তার সামনে প্রাণত্যাগের ফলে রাক্ষস দিব্য শরীর ধারণ করে স্বর্গে গমন করল। মৃত্যুকালে যেহেতু সুশীলার প্রতি কামনা নিয়েই প্রাণত্যাগ করেছিল, বিদ্যাধর রাজা মলয়কেতুর ঔরসে মাল্যকেতু-রূপে জন্মগ্রহণ করল আর সুশীলাও আসঙ্গাভিলাষী হয়ে প্রাণত্যাগ করার ফলে কর্ণাটদেশে কলাবতী নামে জন্ম-পরিগ্রহ করল। কালক্রমে মাল্যকেতুর সঙ্গে কলাবতীর বিবাহ-ও হল। তিনটি অপত্য লাভও করলে। কিন্তু জন্মান্তরের সংস্কার বলে প্রধানা এবং প্রিয়তমা মহিষী হয়েও রাজরানীর সুখৈশ্বর্য এবং বিলাস-ব্যসনের পরিবর্তে কলাবতী সব-সময়ই ভস্মলিপ্তা হয়ে থাকতেই ভালবাসত আর শিবলিঙ্গের অর্চনা করত।

একদিন উত্তর প্রদেশের এক চিত্রকর রাজা মাল্যকেতুকে একটি মনোরম চিত্রপট প্রদান করল। মাল্যকেতুও সেটি সমর্পণ করল কলাবতীকে। চিত্রপটখানি ছিল বারাণসীর। কলাবতী যতবারই দেখে সেই পট ততবারই কী যেন এক অব্যক্ত স্মৃতি তাকে তোলপাড় করতে থাকে, বিস্মৃত হয়ে যায় নিজের অস্তিত্ব। একসময় যেন হঠাৎ খুলে যায় তার স্মৃতির দ্বার। সখী-পরিবৃতা কলাবতী আত্ম-বিস্মৃতা হয়ে দেখতে থাকে সেই পট আর পরিচয় দিতে থাকে প্রতিটি স্থানের—যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠছে পটের প্রতিটি স্থান আর স্থান-মাহাত্ম্য। বরণা নদী, উত্তর-বাহিনী গঙ্গা, মণিকর্ণিকা, কুলস্তম্ভ, কপালমোচন, মৎস্যোদরী তীর্থ থেকে শুরু করে প্রতিটি মোক্ষপ্রদ লিঙ্গ। সর্বজ্ঞার মত কলাবতী আপন মনেই বলতে থাকে:

"সর্ব্বেষামপি লিঙ্গানাং মৌলিত্বং কৃত্তিবাসসঃ।
ওঙ্কারেশঃ শিখা জ্ঞেয়া লোচনানি ত্রিলোচনঃ॥
গোকর্ণভারভূতেশৌ তৎকর্মৌ পরিকীর্ত্তিতৌ।
বিশ্বেশ্বরাবিমুক্তৌ চ দ্বাবেতৌ দক্ষিণৌ করৌ॥
ধর্ম্মেশমনিকুর্ণেশৌ দ্বৌ করৌ দাক্ষিণেতরৌ।
কালেশ্বরকপর্দ্দীশৌ চরণাবতিনির্ম্মলৌ॥
জ্যেষ্ঠেশ্বরো নিতম্বশ্চ নাভির্বৈঃ মধ্যমেশ্বরঃ।
কপর্দ্দোঽসৌ মহাদেবঃ শিরোভূষা শ্রুতীশ্বরঃ॥
চন্দ্রেশো হৃদয়ং তস্য আত্মা বীরেশ্বরঃ পরঃ।
লিঙ্গং তস্য তু কেদারঃ শুক্রং শুক্রেশ্বরং বিদুঃ॥
অন্যানি যানি লিঙ্গানি পরঃ কোটিশতানি চ।
জ্ঞেয়ানি নখলোমানি বপুষো ভূষণান্যপি॥" (৩৩/১৬৭-১৭২)

—কৃত্তিবাসেশ্বরই সমস্ত লিঙ্গের মস্তক-স্বরূপ, ওঙ্কারেশ্বর শিখা, ত্রিলোচনেশ্বরই লোচনত্রয়। দুই কর্ণ হল গোকর্ণেশ্বর আর ভারভূতেশ্বর। দুই দক্ষিণ কর হল বিশ্বেশ্বর আর অবিমুক্তেশ্বর। দুই বাম কর হল—ধর্মেশ্বর ও মণিকর্ণিকেশ্বর; কালেশ্বর ও কপর্দীশ্বর হল চরণদ্বয়। জ্যেষ্ঠেশ্বর নিতম্ব, মধ্যমেশ্বর নাভি, মহাদেব কর্পদ (জটা), শ্রুতীশ্বর শিরোভূষা। চন্দ্রেশ্বর হৃদয়, বীরেশ্বর আত্মা, কেদারেশ্বর লিঙ্গ, শুক্রেশ্বর শুক্রস্বরূপ। অন্যান্য যে সমস্ত কোটি কোটি লিঙ্গ আছেন, তাঁরা নখ, লোম আর শরীরের অলঙ্কার স্বরূপ।

এইভাবে দেখতে-দেখতে আর বলতে-বলতে জ্ঞানবাপী নয়নগোচর হতেই বাষ্পাকুল হয়ে উঠল কলাবতীর কণ্ঠ, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তনু, মুর্ছিতা হয়ে পড়ল কলাবতী। ব্যস্ত হয়ে উঠল সখীরা। সঙ্গ ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা যখন তাদের ফলবতী হল না, বুদ্ধিশরীরিনী নামে কলাবতীর এক পরিচারিকা সেই চিত্রপট দেখিয়েই তাকে পুনরায় সুস্থ করে তুলল। কলাবতী বারবার পটস্থ সেই জ্ঞানবাপীকে স্পর্শ করতে-করতে জন্মান্তরের জ্ঞান লাভ করে সখীদের বললে।

অতঃপর সব পরিচয় গোপন রেখে কলাবতী মহীপতি মাল্যকেতুকে সম্মত করিয়ে পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়ে শুভদিন দেখে কাশী অভিমুখে প্রস্থান করলে।

কাশীতে এসে কলাবতী জ্ঞানবাপীর সোপান সংস্কার করে স্বামীকে নিয়ে কঠোর তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনে যখন নিজের আয়ুষ্কাল প্রায় শেষ করে এনেছে, সেই সময় একদিন সকালে তারা দেখল এক জটাধারীকে তাদের কাছে আসতে। সেই জটাধারী এসে তাদের হাতে একটু বিভূতি অর্পণ করে বললেন—ওঠ। উত্তমরূপে বেশভূষা কর। এই স্থানে এখনই তোমাদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার—মুক্তি লাভ হবে। জটাধারীর কথা শেষ হতে-না-হতেই শব্দায়মান কিঙ্কিনীজাল-মণ্ডিত এক বিমান উপস্থিত হল তাদের সামনে। বিমান হতে অবতরণ করলেন ভূতভাবন ভগবান চন্দ্রশেখর। তাঁদের কর্ণমূলে দিলেন সেই অনির্বচনীয় তারকব্রহ্ম উপদেশ। অতঃপর চন্দ্রশেখর নভোমার্গ উদ্দীপিত করে স্বীয় ধামে গমন করলেন আর কলাবতীও স্বামী মাল্যকেতু-সহ সেই অনাখ্যেয় পরমব্রহ্মাখ্য অপরিমেয় উত্থিত জ্যোতিতে লীন হয়ে গেল।

[অধ্যায় ৩৫—৩৮]

মিত্রাবরুণ-নন্দন মুনি অগস্ত্য অতঃপর দেব স্কন্দ-র কাছ থেকে জানতে চান দেবদেব মহাদেব কীর্তিত সেই সব আচার, যা কাশী প্রাপ্তির সহায়ক। কেননা,

"আচারঃ পরমো ধর্ম্ম আচারঃ পরমং তপঃ।
আচারদ্বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারাৎ পাপসঙ্ক্ষয়॥" (৩৫/১৫)

আচারই পরম ধর্ম, আচারই পরম তপ এবং আচার হতেই আয়ু বৃদ্ধি ও পাপক্ষয় হয়ে থাকে।

স্কন্দ বললেন—হে কলসোদ্ভব! প্রাণীগণের মধ্যে মানবগণই শ্রেষ্ঠ। কারণ তারা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী। মানবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণই

শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁরা বিদ্বান্, বিদ্বানগণের মধ্যে যাঁরা কৃতধী, কৃতধীর মধ্যে যাঁরা ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা, আবার অনুষ্ঠাতাগণের মধ্যে যাঁরা ব্রহ্মতৎপর, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ। বিদ্বজ্জন সদাচারকেই ধর্মমূল বলে স্বীকার করে থাকেন। যম, নিয়ম এবং প্রাণায়ামকে আশ্রয় করে যে কর্মের অনুষ্ঠান করলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হন, সেই কর্মই বিধেয়। দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হলে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে পরিত্যাগ করে প্রস্থান করে, অনুগামী হয় একমাত্র ধর্ম। তাই বিশেষ করে, ব্রাহ্মণদের সব সময়ই সদাচার অভ্যাস করা উচিত। উৎসাহ, মেধা, সৌভাগ্য, রূপ-সম্পদের প্রবর্তক এবং মনপ্রসন্নতার হেতু প্রাতঃস্নানের পর সন্ধ্যা বন্দনা ব্রাহ্মণদের অবশ্য করণীয়। কারণ, প্রণবই পরম ব্রহ্ম, প্রাণায়ামই পরম তপস্যা, গায়ত্রীর অতিরিক্ত কিছু নেই। নির্মল-চিত্ত ব্যক্তিই সর্বতীর্থে স্নাত, সর্বপ্রকার মালবর্জিত এবং শত-যজ্ঞের ফলোপভোক্তা। একমাত্র বিশ্বেশ্বরের কৃপা ছাড়া চিত্ত কখনো নির্মল হতে পারে না।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণকে 'দ্বিজাতি' বলা যায়, তার মধ্যে ব্রাহ্মণগণ জন্ম মাত্রেই দ্বিজাতি বলে গণ্য হয়ে থাকে। যথাবিহিত উপনয়নের দ্বারা সংস্কৃত হবার পর গুরু-সন্নিধানে বেদাধ্যয়ন এবং ব্রহ্মচর্য পালন অবশ্য কর্তব্য। গুরুর প্রতি অনন্য ভক্তি শ্রুতির নৈঃশ্রেয়সী সম্পত্তির অধিকারী হবার যোগ্যতা দেয়। পিতা, মাতা, ও আচার্যকে সর্বদা সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করা উচিত। এই তিনজন প্রসন্ন হলে পুরুষার্থ চতুষ্টয় লাভ হয়ে থাকে। এই তিনজনের সেবাই পরম তপস্যা, পরম ধর্ম। মাতৃভক্তিবলে ভূর্লোক, পিতৃভক্তিতে ভুবর্লোক, আচার্য ভক্তিতে স্বর্লোকের উপর আধিপত্য অর্জন করা যায়।

অস্খলিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম শেষে সদ্বংশজা, সুলক্ষণা সবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করে গৃহস্থাশ্রম বিধেয়। গৃহস্থাশ্রমেয় তুল্য আশ্রম নেই, যদি পত্নী হয় সহধর্মিনী। তাই পত্নী নির্বাচনকালে, বুধগণ শরীর, গঠন, গন্ধ, ছায়া, সত্ত্ব, স্বর, গতি এবং বর্ণ—এই যে আট প্রকার প্রধান লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, তার বিচার এবং বিশ্লেষণ অবশ্যই করণীয়। গৃহ-

স্থাশ্রম পঞ্চশূণায় আবৃত। উদূখল-মুষল, পেষণী (যাঁতা), চুল্লী, জলকুম্ভ ও সম্মার্জনী এই অত্যাবশ্যকীয় পাঁচটির মাধ্যমে গৃহস্থাশ্রমীর জীবহিংসা হয়ে থাকে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিবন্ধন, পঞ্চযজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্ম, পিতৃ দৈব, ভূত এবং নরযজ্ঞ করা উচিত। অধ্যাপনাকে বলে ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দৈবযজ্ঞ, বলি ভূতযজ্ঞ আর অতিথি-পূজা হল নরযজ্ঞ।

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্নব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মো ঘটোদ্ভব॥" (৩৮/৮৩)

"বাচো বেগং মনোবেগং জিহ্বাবেগঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
উৎকোচদ্যূতদৌত্যার্ত্তদ্রব্যং দূরাৎ পরিত্যজেৎ॥" (৩৮/৮৬)

—হে ঘটোদ্ভব! প্রীতিকর সত্য বাক্য বলবে, অপ্রিয়-সত্য কদাচ বলবে না, আবার মিথ্যা প্রিয় বাক্যও ব্যবহার করবে না। বাক্য, জিহ্বা ও মনের বেগকে প্রতিরোধ করবে। উৎকোচ, দ্যূত, দৌত্য এবং আর্তজনের দ্রব্য গ্রহণ করবে না।

বেদ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, রাজা, সাধুব্যক্তি, তপস্বী, পতিব্রতা স্ত্রীর নিন্দা, মনুষ্যের স্তুতি, আত্মাবমাননা, উদ্যোগী পুরুষের উৎসাহে বাধা, পরধর্ম-বিদ্বেষ এ সবই অধর্ম।

"অধর্ম্মাদেধতে পূর্ব্বং বিদ্বেষ্টৄনপি সঞ্জয়েৎ।
সর্ব্বতো ভদ্রমাপ্যাপি ততো নশ্যেচ্চ সান্বয়ঃ॥" (৩৮/৯৩)

—অধর্মাচরণকারী প্রাণী প্রথমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শত্রুসমূহকে জয় করতে পারে, নানারকম সুখভোগও করে, কিন্তু পরে সবংশে পতন তাদের সুনিশ্চিত।

মিথ্যাবাক্যে যজ্ঞফল, গর্বিত জনের তপস্যার ফল বিনষ্ট হয়। দান করে তা কীর্তন করলে দানের সুফল নষ্ট হয়, ব্রাহ্মণের নিন্দা করলে আয়ু ক্ষয় হয়।

গৃহস্থাশ্রমে এইভাবে সদাচারের দ্বারা দেব, পিতৃলোক এবং ঋষিগণের ঋণ থেকে মুক্তিলাভ করে পুত্রের প্রতি গৃহভার অর্পণ করে ঔদাসীন্য-সহকারে জ্ঞানাভ্যাসে অথবা কাশীকে আশ্রয় করবে। সম্যক

প্রকার জ্ঞানলাভে যেমন আছে মুক্তি, তেমনি সাক্ষাৎ মুক্তির আশ্রয়-স্থল হল কাশী।

সদাচার-ব্যতিরেকে যেমন জ্ঞানলাভও সম্ভব নয়, তেমনি কাশী-প্রাপ্তিও অসম্ভব।

দেব স্কন্দের সদাচার-কথন শেষ হলে কাশী-বিরহে কাশী-প্রাপ্তিতে উন্মুখ-চিত্ত মুনি অগস্ত্য ব্যাকুল অন্তঃকরণে স্কন্দের কাছ থেকে জানতে উৎসুক হলেন, কাশীতে কোন্ কোন্ শিবলিঙ্গ জ্ঞান প্রদান করে থাকে।

[অধ্যায় ৩৯]

কাশী পরিত্যাগের কারণে সন্তপ্ত-হৃদয় মুনি অগস্ত্যকে ষড়ানন স্কন্দদেব বললেন—যিনি নিষ্প্রপঞ্চক, নিরাত্মক, নির্বিকল্প, নিরাকার, অব্যক্ত, স্থূল ও সূক্ষ্মরূপী পরম ব্রহ্ম বলে কীর্তিত, সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মা সংসার হতে জীবগণকে মুক্তি দান করার জন্য অন্যত্র না থেকে কেন কাশীতেই অবস্থান করেন, তার কারণ বলছি, শোন :

অন্যত্র অবস্থান করে যদি কেউ মহৎ-যজ্ঞ, নিষ্কাম মহাদান এবং সুকঠোর তপস্যা করে মহাদেব তাকে ভব-বন্ধন হতে মুক্তি দান করেন ঠিকই কিন্তু কাশীতে অবস্থানকারীজনের ঐ সুমহান কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন পড়ে না। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের অনুমতি-সাপেক্ষে অবস্থানের নামই মহাযোগ। ভক্তিসহকারে নিয়মপূর্বক পত্র-পুষ্প-ফুল-জল বিশ্বেশ্বরকে দানই হল মহাদান। কাশীক্ষেত্রে উত্তর-বাহিনী গঙ্গায় স্নান করে মুক্তিমণ্ডপে ক্ষণিকের বিশ্রাম এবং ক্ষুধা-তাপ অগ্রাহ্য করে, ইন্দ্রিয়সমূহের চাঞ্চল্য নিরোধ করে বাস করার নামই মহতী তপস্যা।

স্কন্দ বললেন, হে মিত্রাবরুণতনয় অগস্ত্য তুমি যেমন দেবগণ কর্তৃক পরোপকারের জন্য প্রার্থিত হয়ে কাশী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছ কিন্তু কাশীকে ভুলতে পারনি, ঠিক সেইরকমই স্বয়ং শঙ্করকেও একবার কাশী ত্যাগ করে মন্দর পর্বতে অবস্থান করতে হয়েছিল এবং তোমারই

মত কাশীর বিরহানলে দগ্ধ হতে হয়েছিল, সেই কাহিনী বলি, শোন :

পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পাদ্মকল্পে একবার ষাট-বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টি হল। ফলে নিখিল প্রাণীনিচয় উপদ্রুত হয়ে কেউ সমুদ্রতীরে, কেউ গিরিগুহায় বাস করতে লাগল। শস্যহীনা ধরিত্রী মরুভূমিতে পরিণত হল। প্রাণীক্ষয় ব্যাপক আকার ধারণ করল। চতুর্দিকে দেখা দিল ভয়ঙ্কর অরাজকতা। বিধাতা ব্রহ্মার সযত্ন সৃষ্টি বুঝি লয় পায়।

চিন্তাকুল বিধাতা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতে-করতে অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীতে এসে দেখলেন, মনুবংশপ্রভব বীরশ্রেষ্ঠ, স্বয়ং ক্ষাত্রধর্মস্বরূপ তপস্যায় নিশ্চলেন্দ্রিয় রাজর্ষি রিপুঞ্জয়কে।

তাঁকে দেখামাত্রই ব্রহ্মা তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে সসম্মানে অনুরোধ জানালেন—হে মহামতে রিপুঞ্জয়! তুমি এই সসাগরা পৃথিবী পালন কর। নাগরাজ বাসুকি অনঙ্গমোহিনী নাম্নী সুশীলা নাগকন্যা তোমায় দান করবেন। তোমার প্রজাপালনে সন্তুষ্ট হয়ে দেবগণ তোমাকে স্বর্গ থেকে বহুবিধ রত্ন ও কুসুমরাশি দান করবেন, সে কারণে তুমি দিবোদাস নামে বিখ্যাত হবে। আর আমার প্রসাদে তুমি দিব্যদেহ লাভ করবে।

শুনে রাজর্ষি রিপুঞ্জয় জিজ্ঞেস করলেন, ভূমণ্ডলে এত নৃপতি থাকতে পিতামহ কেন তাঁকেই রাজ্য পালনের অনুরোধ জানাচ্ছেন। উত্তরে ব্রহ্মা বললেন, ধর্মপ্রাণ নরপতি না হলে দেবগণ বারিবর্ষণ করবেন না, তাই এই অনুরোধ।

দিবোদাস তখন পিতামহের আজ্ঞা মহাপ্রসাদের মত গ্রহণ করতে সম্মত হলেন এই শর্তে যে তিনি যদি পৃথিবীনাথ হন, তাহলে দেবগণকে পৃথিবী পরিত্যাগ করে স্বর্গে অবস্থান করতে হবে। ব্রহ্মা সম্মতি জানিয়ে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন আর দিবোদাসও পটহ-নিনাদে ঘোষণা করলেন :

"...দিবং দেবা ব্রজন্তিতি ॥

মা গচ্ছান্ত্বিহ বৈ নাগা নরাঃ স্বস্থা ভবন্ত্বিতঃ।

ময়ি প্রশাসতি ক্ষৌণীং সুরাঃ স্বস্থা ভবন্তিতি॥" (৩৯/৪৮-৪৯)

—দেবগণ স্বর্গে গমন করুন। নাগগণ নাগলোকে গমন করুন। মনুষ্যগণ আমার রাজ্যে সুখী হোক, দেবগণও সুস্থ হোন।

এদিকে ব্রহ্মা বিশ্বনাথ-সমীপে এসে, প্রণাম করে তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করতে যাবেন এমন সময় ভগবান বিশ্বেশ্বর তাঁকে বললেন, "হে লোকপতে! কুশদ্বীপ থেকে মন্দরপর্বত এখানে এসে দুষ্কর তপস্যায় রত হয়েছে, চল, আমরা তাকে বর প্রদান করে আসি।" এই বলে নন্দী এবং ভৃঙ্গীকে নিয়ে বৃষে আরোহণ করলেন পার্বতীপতি বৃষধ্বজ। অনুগামী হতে হল ব্রহ্মাকেও। সকলে মিলে এলেন সেখানে, যেখানে মন্দর তপস্যায় রত। বৃষধ্বজ তাকে সাদর সম্ভাষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা করতে বললেন। অতঃপর মন্দর দেবদেব মহেশ্বরকে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বললে "হে সর্বগ! আমার মনোভিলাষ কী আপনার অজ্ঞাত! যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্নই হয়ে থাকেন, তবে এই বর দিন, স্বভাবত পাষাণময় আমি যেন অবিমুক্তক্ষেত্রের সমান হই। আপনি আজ থেকে সগণে উমার সঙ্গে আমার শিখরে কুশদ্বীপে অবস্থান করুন।"

মন্দরের প্রার্থনা শুনে কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হলেন শঙ্কর। সেই অবকাশে ব্রহ্মা সবিনয়ে সৃষ্টি-রক্ষার জন্য তাঁর কৃত-কর্মের বৃত্তান্ত জানিয়ে দেবদেবকে অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন মন্দরের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে কিয়ৎকালের জন্য সেখানে অবস্থান করে তাঁর বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করেন। ভূতভাবন ভগবান অগত্যা তাই করলেন —কাশী পরিত্যাগ করে মন্দর পর্বতে কুশদ্বীপে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু ক্ষেত্র পরিত্যাগের আগে সকলের এমনকি ব্রহ্মারও অগোচরে নিজ মূর্তিময় একটি শিবলিঙ্গ স্থাপনা করে গেলেন ক্ষেত্র রক্ষার্থে। এইভাবে ক্ষেত্র থেকে বিযুক্ত হয়েও তিনি বিমুক্ত হলেন না। তাই আনন্দকানন কাশীক্ষেত্রের নাম হল 'অবিমুক্তক্ষেত্র' আর প্রতিষ্ঠিত এবং স্বয়ং শিব, নন্দী, ভৃঙ্গী অর্চিত সেই লিঙ্গের নাম হল 'অবিমুক্তেশ্বর।'

কাশীতে এটিই হল আদিমতম সর্বকালের মোক্ষপ্রদ, চতুর্বর্গ-প্রদাতা লিঙ্গ। এর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এবং বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের শিবলিঙ্গ।

এই অবিমুক্তেশ্বর দর্শনকারীকে দেখলে স্বয়ং দণ্ডধর যমও দূর হতে করযোড়ে প্রণতি করে থাকেন।

[অধ্যায় ৪০—৪১]

অবিমুক্তেশ্বরের মাহাত্ম্য আরও উৎকর্ণ করে তুলল মুনি অগস্ত্যকে। তিনি অধীর আগ্রহে ষড়াননের কাছে জানতে চাইলেন, অবিমুক্তেশ্বর-লিঙ্গ এবং অবিমুক্ত ক্ষেত্র এই উভয়কেই কি উপায়ে পাওয়া যেতে পারে।

স্কন্দ বললেন ঃ

"সমীহিতার্থসংসিদ্ধির্লভ্যতে পুণ্যভারত ঃ।
তচ্চ পুণ্যং ভবেদ্বিপ্র শ্রুতিবত্ম সভাজনাৎ ॥" (৪০/৫)

—হে বিপ্র! পুণ্যবলেই অভীষ্টার্থ সিদ্ধি হয়ে থাকে আর বেদ-প্রতিপাদ্য পন্থা অর্থাৎ শ্রুতিপথেই পুণ্য লাভ করা যায়।

নিষিদ্ধ কর্ম পরিহার এবং বিহিত কর্ম না করলে কলি এবং কাল ব্রাহ্মণকেও নিষ্কৃতি দেয় না। সুখাকাঙ্ক্ষী সকলেই। ধর্মানুশীলনই সেই সুখলাভের একমাত্র পথ। চাতুর্বর্ণের এই ধর্মাচরণে প্রযত্নশীল হওয়া উচিত। সচ্চরিত্র, সদাচারী, দয়ালু, ক্ষমাশীল এবং দেব ও অতিথিভক্ত গৃহস্থ ধার্মিক বলে পরিগণিত। গৃহস্থ প্রতিদিন প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যা, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, বৈশ্যদেব, পিতৃতর্পণ এবং অতিথিসেবা —এই ন'টি আবশ্যকীয় কর্ম করে; অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি মধুর বাক্যে কুশল প্রশ্ন, সৌম্যবাক্য প্রয়োগ, নিজের চোখে, মুখে সৌম্যতা, সেবা এবং অনুগমন করে; যথাশক্তি আসন, পাদশৌচ, ভোজন, স্নান, শয্যা, তৃণ, জল, তেল ও দীপ অভ্যাগতজনকে দান করে, তাহলে গৃহস্থ

অবশ্যই সুফলভোগী হবে। সৎপাত্র, মিত্র, দীন, অনাথ, উপকারীজন, মাতা, পিতা ও গুরু—এই নয়জনকে যা কিছুই প্রদান করা যায়, তা-ই অক্ষয় হয়ে থাকে।

"সত্যং শৌচমহিংসা চ ক্ষান্তির্দ্দানং দয়া দমঃ।
অস্তেয়মিন্দ্রিয়াসংকোচঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্॥" (৪০/৮৬)

—সত্য, শৌচ, অহিংসা, ক্ষমা, দান, দয়া, দম, অস্তেয় এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—এ ন'টি হল ধর্মের সাধন।

ক্রূরতা, পরদারসেবা, ক্রোধ, দ্রোহ, মিথ্যা, অপ্রিয় বাক্য, দ্বেষ, দম্ভ, মায়া পরিত্যাগ করে; হিংসা-বিবর্জিত মৎস্য, মাংস ব্যতিরেকে মৌনভাবে অন্নগ্রহণ, এবং পঞ্চসূনা পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য অহুত নামে জপযজ্ঞ, হুত নামে হোমযজ্ঞ, ভূতবলি নামে প্রহুত যজ্ঞ, পিতৃগণের পরিতৃপ্তির জন্য প্রাশিত যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ-সেবা নামে ব্রাহ্মহুত যজ্ঞ প্রভৃতি নিষ্ঠা-সহকারে করে কালাতিপাতই হল বেদবিহিত ধর্মানুশীলন।

স্কন্দ বললেন, যে গৃহস্থ ন্যায়পথে অর্থ উপার্জন করে, তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ, অতিথিপ্রিয়, নিত্য শ্রাদ্ধকারী, এবং সত্যবাদী-সত্যাশ্রয়ী কাশীনাথ তাদের উপরই প্রসন্ন হন; বিশ্বনাথের প্রসাদে তারাই কাশী বাস করতে পারে।

এই সদাচার-পরায়ণ গৃহস্থ গাত্রচর্ম লোল এবং মস্তক-কেশ শুভ্র হলে, পৌত্র দর্শন করে, পুত্রহস্তে সংসার-ভার অর্পণ এবং গ্রাম্যাহার পরিত্যাগ করে মুনিজনোচিত অন্নে জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্য বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করবে। দেবলোক ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনের জন্য তখন বৈখানস-বৃত্তি অনুসারে শাক বা ফল-মূল আহার এবং দীর্ঘ তপস্যার দ্বারা নিজের দেহকে শুষ্ক করবে। মস্তকে জটাভার, প্রভাতে ও সায়ংকালে স্নান, নখ-লোম ও শ্মশ্রু ধারণ করে একমাত্র বনবাসী তপস্বীগণের কাছ থেকেই ভিক্ষা গ্রহণ করে, এবং স্থির আবাসে না থেকে জীবনের তৃতীয় ভাগের শেষে চতুর্থ ভাগের প্রারম্ভেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। জীবনের এই অবস্থাকে বলা হয় যতি। ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা এবং সর্বদা নির্জনসেবা ছাড়া যতির আর

কোন কর্ম নেই। জীবন বা মৃত্যুর কামনারহিত হয়ে যতি থাকবে শুধুমাত্র কালের প্রতীক্ষায়। মুক্তির অভিলাষী হয়ে, সর্বত্র মমতারহিত এবং সমদর্শী হয়ে বৃক্ষমূলে বাসই তাদের প্রশস্ত। যে সমস্ত যতি ভিক্ষাপাত্র পরিত্যাগ করে করপাত্রী হন, তাদের দিন-দিন শতগুণ পুণ্য অর্জিত হতে থাকে।

প্রতিটি আশ্রমই আত্মজ্ঞান লাভের সোপান; আত্মাই একমাত্র জিজ্ঞাস্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, যত্ন-সহকারে দ্রষ্টব্য। আত্মজ্ঞানই মুক্তির উপায়। যোগ ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান হয় না আবার নিয়ত অভ্যাসেই যোগ সিদ্ধ হয়ে থাকে। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগকে বলে যোগ মতান্তরে প্রাণ বা অপান বায়ুর মিলনকেও যোগ বলা হয়ে থাকে। মানসিক বৃত্তিসমূহকে রোধ করে মনকে একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মায় মেলাতে পারেন, তাঁরাই যোগী। চিত্ত-সংযম ছাড়া এই আয়াস ফলপ্রসূ হতে পারে না। চঞ্চল চিত্তকে স্থির করার জন্যে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই ষড়ঙ্গ যোগের স্বনিষ্ঠ অভ্যাসের দরকার। জগতে যত প্রকার জীবযোনি, আসনও তত প্রকার। তার মধ্যে সিদ্ধাসন এবং পদ্মাসন হল আশু সিদ্ধিপ্রদ। দেহগত বায়ুর নাম 'প্রাণ', তার অবরোধের নাম 'আয়াম'; সেই প্রাণঘটিত যে একশ্বাসময়ী মাত্রা তাকেই বলে প্রাণায়াম। যথাবিধি প্রাণায়াম যাবতীয় ব্যাধি-বিনাশক। চঞ্চল ইন্দ্রিয়-সমূহ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের সতত সঞ্চরণশীল, তাকে প্রত্যাহৃত করে আনার নামই হল 'প্রত্যাহার'। আসনসিদ্ধ, প্রাণায়াম-সংযুক্ত ও প্রত্যাহারসম্পন্ন হয়ে যোগী এবার অভ্যাস করবে 'ধারণা'। মনকে স্থির রেখে পৃথক-পৃথকভাবে হৃদয়ে ক্ষিতিতত্ত্ব, কণ্ঠে অম্বুতত্ত্ব, তালুতে বহ্নিতত্ত্ব, ভ্রূমধ্যে বায়ুতত্ত্ব, এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে আকাশতত্ত্ব চিন্তার নামই হল ধারণা। ভূতগণের জন্যে এই পাঁচটি ধারণা—স্তম্ভনী, প্লাবনী, দহনী, ভ্রামণী আর শমনী। পাঁচ দণ্ড পরিমিত কাল চিত্তের স্থিরতায় ধারণা জন্মায়। আকাশতত্ত্বে প্রাণবায়ুকে পাঁচ ঘণ্টা নিরুদ্ধ রাখলে যে ধারণা জন্মায়, তাতে মোক্ষলাভ ত্বরান্বিত হয়। ষাট দণ্ড পরিমিত চিত্তের স্থিরতার নাম 'ধ্যান'।

স্থিরাসনযোগী একটি ধ্যানে অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। সুখাসনে সমাসীন হয়ে চিত্তকে অন্তরে আর চক্ষুকে বাইরে অবস্থাপিত করে শরীরের সমতা সম্পাদন, সিদ্ধিপ্রদ ধ্যানমুদ্রা। চিত্তের দ্বাদশ-দিন স্থিরতা হল 'সমাধি'। দ্বাদশটি প্রাণায়ামে একটি প্রত্যাহার ; দ্বাদশটি প্রত্যাহারে একটি ধারণা ; দ্বাদশটি ধারণায় একটি ধ্যান আর দ্বাদশটি ধ্যানে হয় সমাধি। সমাধিকালে জীবাত্মা পরমাত্মায় একীভূত হয়ে সঙ্কল্পরহিত হয়, লুপ্ত হয় বোধশক্তি, দর্শন হয় স্বপ্রকাশ সেই জ্যোতির যার দর্শনে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। যোগী এই ষড়ঙ্গযোগের অভ্যাস-বলে নিরালম্ব, নিরাতঙ্ক, নিরাময় জীবন নিয়ে পরমব্রহ্মে লীন হয়ে থাকেন। এবং মহামুদ্রা, নভো বা খেচরীমুদ্রা, উড্ডীয়মান, জলন্ধর আর মূলবন্ধ মুদ্রা, যে যোগীর আয়ত্তাধীনে, তিনিই যোগসিদ্ধ।

স্কন্দ বললেন, হে কলসোদ্ভব! যে পদলাভ করে পুনরায় সংসারে আগমন করতে হয় না এবং যে পদ লাভ করলে কোন শোক পেতে হয় না, তা একমাত্র ষড়ঙ্গযোগ বলেই পাওয়া যায়। কিন্তু কলিতে স্বল্পায়ু, মলিন এবং চঞ্চলচিত্ত মানবগণের এতদৃশ নির্বানপ্রদ যোগসিদ্ধি কোথায়?

ষড়ঙ্গ যোগ ব্যতিরেকে মুক্তি নেই। মানুষ যাতে অল্প আয়াসেই সেই যোগে যোগী হয়ে মুক্তি লাভ করতে পারে, তারই জন্য কাশীক্ষেত্র এবং ভূতভাবন ভগবান বিশ্বেশ্বরের সেখানে অবস্থান।

"কাশ্যাং স্বদেহসংযোগঃ সম্যগ যোগ উদাহৃতঃ।
মুচ্যতে নেহঁ যোগেন ক্ষিপ্রমন্যেন কেনচিৎ॥" (৪১/১৭১)

—কাশীতে দেহ সংযোগই যথার্থ যোগ বলে কথিত। এই যোগবলে যেমন সত্বর মুক্তি লাভ হয়, অন্য যোগে তা হয় না।

বিশ্বেশ্বর, বিশালাক্ষী, উত্তরবাহিণী গঙ্গা, কালভৈরব, ঢুণ্ডিরাজ, দণ্ডপাণি কাশীতে এই ষড়ঙ্গ ছাড়াও ওঙ্কারেশ্বর, কৃত্তিবাসেশ্বর, কেদারেশ্বর, ত্রিবিষ্টপেশ্বর, বীরেশ্বর এবং বিশ্বেশ্বর অপর ষড়ঙ্গ এবং অসি ও বরণাসঙ্গম, জ্ঞানবাপী, মণিকর্ণিকা, ব্রহ্মহ্রদ ও ধর্মকূপ অন্যবিধ ষড়ঙ্গ যোগ আর সেবা মোক্ষপ্রদ। যোগশাস্ত্রের যে মহামুদ্রা সর্বব্যাধি

এবং সর্বপাপবিনাশিনী, কাশীতে গঙ্গাস্নানই হল সেই মহামুদ্রা। যে খেচরীমুদ্রা দেহমধ্যস্থ বিন্দুকে স্তম্ভিত রেখে অমৃত পান করায়, কাশীর পথসমূহে পরিভ্রমণই হল সেই খেচরীমুদ্রা। নানা দেশ হতে বারাণসীতে উড্ডীন হয়ে গমনের নামই উড্ডীয়ানবন্ধ। বিশ্বেশ্বরের স্নানকালে দেবদুর্লভ স্নানজল মস্তকে ধারণের নামই জলন্ধর-বন্ধ। সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে কাশী পরিত্যাগ না করার নামই হল মূল-নাশক মূলবন্ধ মুদ্রা।

হে কালসোদ্ভব! দুই প্রকারের যোগই অবিমুক্তক্ষেত্র প্রাপ্তির সহায়ক সন্দেহ নেই। তার মধ্যে কাশীযোগই শ্রেয়।

"উভয়োর্যোগয়োর্মধ্যে কাশীযোগোঽয়মুত্তমঃ।
কাশীযোগং সমভ্যস্য প্রাপ্নুয়াদযোগমুত্তমম্॥" (৪১/১৮৪)

—এই দুই প্রকার যোগের মধ্যে কাশীযোগই উত্তম, কাশীযোগ অভ্যাস করলে পরমযোগ (জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য) লাভ করতে পারা যায়।

[অধ্যায় ৪২]

অগস্ত্য জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"কথং নিকটতঃ কালো জ্ঞায়তে হরনন্দন।"—হে হরনন্দন! কাল (মৃত্যু) নিকটবর্তী হয়েছে, তা কিভাবে জানা যাবে?

আর সেই কালকে প্রতিরোধের উপায়ই বা কি?

স্কন্দ বললেন, হে কালসোদ্ভব! কাল চিহ্ন বা মৃত্যুর লক্ষণ বহুবিধ তার মধ্যে জরাই কালের প্রথম লক্ষণ।

"ন জরাসদৃশো ব্যাধির্ন দুঃখং জরয়া সমম্।
কারয়িত্র্যপমানস্য জরৈব মরণং নৃণাম্॥" (৪২/৫১)

—জরার তুল্য ব্যাধি বা দুঃখ আর কিছু নেই। জরা মানবগণের অপমানকারী, জরাই মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী কারণ।

জরাই কালস্বরূপ। তাই যে পর্যন্ত জরা আক্রমণ না করে, ইন্দ্রিয়গণ বিকল না হয় তার মধ্যেই বুদ্ধিমানের উচিত তুচ্ছ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে কাশীক্ষেত্রে বাস, উত্তরবাহিনী গঙ্গার জলপান এবং বিশ্বেশ্বর লিঙ্গকে স্পর্শ করে কাশীতে অনন্যচিত্ত হওয়া।

কাশীকে আশ্রয় না করলে কলি বিঘ্ন উৎপাদন করে, কাল গ্রাস করে, পাপরাশি ক্লেশ প্রদান করে।

তাই—

"কঃ কলিঃ কোঽথবা কালঃ কা জরা কিঞ্চ দুষ্কৃতম্।
কা রুজঃ কেঽন্তরায়া বা শ্রিতা বারাণসী যদি॥" (৪২/৫৫)

—বারাণসীকে আশ্রয় করলে কলিই বা কে, কালই বা কে, জরাই বা কে, দুষ্কৃতই বা কি, রোগই বা কে, বিঘ্নই বা কারা?

কাশীতে যথাবিধি বাস স্বর্গবাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, পরম তৃপ্তিদায়ক। ভগবান মহেশ্বরও তাই নৃপতি দিবোদাস-প্রতিপালিতা কাশী পরিত্যাগ করে মন্দর পর্বতের মনোরম গুহাতে অবস্থান করেও প্রীতিলাভ করতে পারেন নি।

[অধ্যায় ৪৩]

অগস্ত্য অতঃপর কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন—কাশীকে দেব ত্রিলোচন কিভাবে দিবোদাস মুক্ত করে মন্দর পর্বত হ'তে কাশীতে প্রত্যাগমন করেছিলেন।

স্কন্দ বললেন, দিবোদাসের প্রতি ব্রহ্মার বরদানকে সার্থক করার জন্যে এবং মন্দরের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবদেব মহাদেব গিরিসুন্দর মন্দয় পর্বতে গমন করলে, সূর্য, বিষ্ণু, ষড়ানন, গনেশ প্রভৃতি অন্যান্য দেবতারাও পৃথিবী পরিত্যাগ করে মন্দরে প্রস্থান করলেন। আর মহামতি দিবোদাসও বারাণসীতে রাজধানী স্থাপন করে ধর্মানুসারে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে লাগলেন, যেন স্বয়ং ধর্মরাজ। দুষ্টের

দমন, শিষ্টের পালনে সুনিপুণ দিবোদাসের রাজত্ব সবদিক থেকে এমনি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, যা ছিল স্বর্গেও দুর্লভ। দেখতে-দেখতে যেন একটা দিনের মত যখন কেটে গেল আশীহাজার বছর নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে, তখন দেবতারা আর স্থির থাকতে না পেরে দিবোদাসের পতন ঘটানোর জন্য চক্রান্ত শুরু করলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে মন্ত্রনা করে দিবোদাসের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হলেন। ঘুরে ঘুরে দেখলেন, ব্রহ্মচারীরা অস্খলিত ব্রহ্মচর্যে, গৃহস্থরা যথাবিধি গার্হস্থ্যধর্মে, বানপ্রস্থীরা বেদবিহিত বানপ্রস্থাশ্রমে অনন্য। এমনকি অনুলোম এবং প্রতিলোম জাত ব্যক্তিগণও কুলমার্গ অনুসরণে রত। সর্বত্র বেদধ্বনি, পদে পদে শাস্ত্রালাপ, সর্বত্রই সদালাপ ও মঙ্গল-গীত, বীণা-বেণু মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যের সুমধুর শব্দ রাজ্যের সর্বত্র নিনাদিত হচ্ছে। কোথাও এমন কোন অধর্মাচার তাঁরা খুঁজে পেলেন না, যার ছিদ্রপথে প্রবেশ করে তাঁরা দিবোদাসকে হীনবল এবং বিনষ্ট করতে পারেন।

অতঃপর দেবগুরু বললেন, সাম-দাম-দণ্ড ও ভেদনীতিতে সুনিপুণ রাজা। তবুও কার্যসিদ্ধির উপায় হিসেবে একমাত্র ভেদ-নীতিকেই গ্রহণ করা যেতে পারে, যদিও সাফল্য সংশয়াধীন। সমস্ত দেবগণকে পৃথিবী থেকে নির্বাসিত করলেও দেবতাদের পক্ষপাতী অনেকেই অন্তশ্চর এবং বহিশ্চর-রূপে সেখানে অবস্থান করছেন। 'সমাগতেষু তেষ্বত্র সর্ব্বং নঃ সেৎস্যতি প্রিয়ম্।'—তাঁরা সকলে এখানে আগমন করলে তোমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হ'তে পারে। বৃহস্পতির পরামর্শে দেবরাজ ইন্দ্র অনলকে আহ্বান করে বললেন :

হব্যবাহন যা মূর্ত্তিস্তব তত্র প্রতিষ্ঠিতা।
তামুপাসংহর ক্ষিপ্রং বিষয়াত্তস্য ভূপতেঃ॥" (৪৩/৭৪)

—হে হব্যবাহন! আপনার যে মূর্তি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত আছে, আপনি সত্বর সেই মূর্তি ভূপতির রাজ্য হতে অপসৃত করুন।

আপনি অপসৃত হলে প্রজাগণ অগ্নিবিহীন হয়ে বিক্ষুব্ধ হবে। ফলে মহীপতির অর্জিত ত্রিবর্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে।

ইন্দ্রের অনুরোধে অগ্নি তৎক্ষণাৎ অহ্বনীয়, গার্হপত্য এবং দক্ষিণাগ্নিরূপ ত্রিবিধ মূর্তিকেই শুধু যোগবলে উপসংহার করে ক্ষান্ত হলেন না, স্বীয়দাহিকা শক্তির সঙ্গে জঠরাগ্নিকেও আকর্ষণ করে স্বলোকে গমন করলেন।

এদিকে মধ্যাহ্নকালীন উপাসনা শেষে ক্ষুধার্ত নৃপতি দিবোদাস যখন ভোজন মণ্ডপে প্রবেশ করলেন, শুরু হয়ে গেল পাচকগণের হৃৎকম্প। নৃপতির অভয় নিয়ে তারা জানাল, অনলের অভাবে আজ তারা কিছুই রাঁধতে পারেনি, সূর্যতাপে সামান্য কিছু পাক করতে পেরেছে, অনুমতি পেলে সেটুকুই তারা এনে দিতে পারে।

পাচকদের কথা শুনে মহাসত্ত্ব নরপতি অনায়াসেই বুঝতে পারলেন, এ দেবগণের কাজ। তারপর ক্ষণকাল চিন্তা করে তপোবলে দেখলেন, অগ্নি কেবল পাকশালা এবং জঠরগুহাই পরিত্যাগ করেন নি, পৃথিবী থেকেই অন্তর্হিত হয়েছেন। হতোদ্যম হলেন না নরপতি। ভাবলেন, অগ্নির প্রসাদে নয়, স্বয়ং ব্রহ্মার অনুরোধেই তাঁর এই রাজ্যভার গ্রহণ।

রাজপ্রাসাদে রাজা দিবোদাস যখন দেবতাদের পরাভবকে অস্বীকার করে আত্মপ্রত্যয়ে স্থির হচ্ছেন, পুরবাসিগণ এল প্রাসাদদ্বারে। দ্বারপাল রাজার অনুমতি নিয়ে তাদের নিয়ে এল রাজ-সমীপে। রাজাও আসন ত্যাগ করে তাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা জানিয়ে আবার রাজছত্রতলে উপবেশন করলেন। কোন প্রশ্নের অবকাশ রাখে নি পুরবাসিগণের আগমনের কারণ। তিনি তাঁদের অভয় দিয়ে বললেন, হে পুরবাসিগণ! পূর্বেই এসবের একটা বিহিত করা আমার উচিত ছিল, কিন্তু আমি উপেক্ষা করেছিলাম, বহুদিন পর দেবগণ তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভালই করেছেন। অনল গমন করেছেন, ক্ষতি নেই, বায়ুও এস্থান ত্যাগ করুক; চন্দ্র, সূর্যের সঙ্গে বরুণও এখান থেকে প্রস্থান করুক। আমার রাজ্যে ঐ সমস্ত জড় পদার্থের কোন প্রয়োজন নেই। কেবল থাকবেন এখানে, আমাদের কুলের আদি পুরুষ, কুলদেবতা, পরোপকারই যাঁর একমাত্র ব্রত, সেই জগতাত্মা ভাস্কর।

কাশী—৮

আপনারা নিশ্চিন্ত হোন, আমিই তপোযোগবলে নিজেকে বহ্নিরূপে ত্রিধা বিভক্ত করে পাক, যজ্ঞ ও দাহক্রিয়া নিষ্পন্ন করব। অন্তর্বহিশ্চর বায়ুরূপ ধারণ করে সকলের জীবন রক্ষা করব, জলময়ী মূর্তি ধারণ করে প্রজাগণকে সঞ্জীবিত করব। জনপদসমূহের সুখের জন্য ইন্দ্র হয়ে আমি শস্য বৃদ্ধি করব। আমার জগতে ঐ ক্ষয়ী ও কলঙ্কী নিশাচরের কোন প্রয়োজন নেই। আমিই চান্দ্রমসী শোভা ধারণ করে প্রজাকুলের মন প্রফুল্ল করে তুলব।

স্থির বিশ্বাস নিয়েই প্রত্যাবর্তন করল পুরবাসিগণ। দিবোদাসও আপ্তবাক্যে তাদের সন্তুষ্ট করেন নি। তপোনিধি তপোবলে সেই সমস্ত মূর্তি ধারণ করে অধিকতর তেজে পৃথিবীর যাবতীয় অভাব এমনভাবে মোচন করলেন, যে দেবতারা নিতান্তই নিরুপায় হয়ে পড়লেন।

[অধ্যায় ৪৪—৪৫]

মন্দর পর্বতের গুহামধ্যস্থ অত্যুজ্জ্বল কান্তিময়ী রত্নরাজির অসাধারণ রশ্মিনিকরে সমুদ্ভাসিত মন্দিরে অনন্ত সুরগণ-সেবিত মনোহর ক্ষীণ শশীকলাভাসিত জগদীশ্বর কাশীবিরহে এবং কাশী বিয়োগ জ্বরে অতিমাত্রায় সন্তাপিত হয়ে উঠলেন। সর্বাঙ্গে চন্দন-লেপন, মৃণাল-বলয় ধারণও তাঁর প্রদাহ প্রশমিত করতে পারল না। যিনি জগতের বিভ্রম-হন্তা, যিনি ত্রিতাপ-ক্ষয়কারী, কাশীবিরহে তিনি নিজেই অতিশয় বিভ্রান্ত হয়ে অস্ফুট বিলাপ শুরু করে দিলেন; নিতান্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

লক্ষ্য পড়ল হিমাদ্রি-তনয়া পার্বতীর। দেবদেবের সন্তাপের কারণ তিনিও অনুধাবন করে সর্ববিধ মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত কাশীপুরী লাভে নিজেও উৎকণ্ঠিতা হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন:

"ন কেবলং কাশীবিয়োগজো জ্বরঃ প্রবাধতে ত্বাং তু যথাত্র মাম্।

উপায় এষোঽত্র নিদঘেশাস্তয়ে পুরী তু সা বা মম জন্মভূরথঃ॥" (৪৪/৩৪)

—হে নাথ! কাশীবিরহ-জাত জ্বর কেবল আপনাকেই পীড়া দিচ্ছে না, আমাকেও পীড়িত করছে। আমার এই তাপ-শান্তির উপায় সেই পুরী অথবা আমার জন্মভূমি।

সর্বসিদ্ধিপ্রদ সেই কাশীপুরীতে যাতে পুনরায় যাওয়া যায়, অপর্ণা পিনাকীকে তা বারবার অনুরোধ করলেন।

মহাদেব বললেন, পার্বতী তুমি জান আমার সেই মহৎ ব্রতের কথা—অন্য ব্যক্তি কর্তৃক অভুক্ত বস্তুই আমি উপভোগ করি। ব্রহ্মার বরে মহীপতি দিবোদাস ধর্মানুসারে সেই পুরীকে পালন করছে। তুমি জান, যারা ধর্মমার্গানুসারী ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, আমি তাদের রক্ষা করে থাকি। যারা তাদের বিরোধিতা করে, আমি তাদের বিনাশ করি। ধর্মিষ্ঠ এবং প্রজাপালনে তৎপর রাজা দিবোদাস। কাশী থেকে কিভাবে তাকে বহিষ্কার করি যদি অধর্মপরায়ণতার লেশমাত্র তার না থাকে? তার ছিদ্র অন্বেষণ করার জন্য কাকে পাঠাব?

এমন সময়ে তিনি তাঁর সামনে দেখতে পেলেন অসাধ্য-সাধনক্ষম যোগিনীগণকে। দেবী পার্বতীর সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যোমকেশ আহ্বান জানালেন যোগিনীদের।

বললেন ঃ

"সত্বরং যাত যোগিন্যো মম বারাণসীং পুরীম্।
যত্র রাজা দিবোদাসো রাজ্যং ধর্ম্মেন শাস্ত্যলম্॥
স্বধর্ম্মবিচ্যুতঃ কাশীং যথা তূর্ণং ত্যজেন্নৃপঃ।
তথোপচরত প্রাজ্ঞা যোগমায়াবলাম্বিতা॥" (৪১/৬১-৬২)

—হে যেগিনীগণ! যেখানে রাজা দিবোদাস ধর্মানুসারে রাজ্য-পালন করছে, তোমরা আমার সেই বারাণসী পুরীতে গিয়ে যাতে রাজা স্বধর্মবিচ্যুত হয়ে কাশী থেকে বহিষ্কৃত হতে পারে যোগমায়া অবলম্বন করে তার উপায় কর!

আদেশমাত্র যোগিনীগণ মন্দরকুঞ্জ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সহর্ষে নভোমার্গ অবলম্বন করে দেবদেবের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনোবেগে

আনন্দকানন বারাণসী অভিমুখে প্রস্থান করল।

কাশী সন্নিকট হতেই তারা দেবমূর্তি পরিহার করে ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রবেশ করল কাশীতে। এক এক যোগিনীর এক এক বেশ; কেউ মালিনী, কেউ সুন্দরী নাপিত পত্নী, কেউ ভেষজশাস্ত্রাজ্ঞা, কেউ বেদেনী, কেউ মৃদঙ্গবাদনজ্ঞা, কেউ গণকপত্নী, কেউ বশীকরণ উচাটনে নিপুণা, কেউ যুবজনের চিত্ত-বিমোহিনী বিলাসিনী। এইভাবে নানা বেশ ধারণ করে, নানা ভাষায় বাক্য বিস্তার করে তারা কাশীপুরীর প্রতি গৃহাঙ্গণে একবৎসর দিবানিশি বিচরণ করেও ভগ্ন-মনোরথ হল। বিঘ্ন উপযোগী কোন ছিদ্রই তারা খুঁজে পেল না।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় চিন্তান্বিতা হল যোগিনীগণ। প্রভুর কার্য সমাধা না করে প্রত্যাগমন করাও বিধেয় নয়। আরও ভাবলে, প্রভু ব্যতিরেকে জীবনধারণ সম্ভব কিন্তু কাশী ছাড়া জীবন-ধারণ কঠিন।

"শম্ভোঃ শক্তিরিয়ং কাশী কাচিৎ সর্ব্বেরগোচরা।
শম্ভুরেব হি জানীয়াদেতস্যাঃ পরমং সুখম্॥"—

কাশী শম্ভুরই কোন শক্তি, সকলের অগোচর, কেবল মহেশ্বরই এর পরম সুখ জানেন।

সেই মহেশ্বর অনতিবিলম্বেই কাশী অবশ্যই প্রত্যাগমন করবেন। সুতরাং মন্দরে ফিরে না গিয়ে যোগিনীরা কাশীতে থাকাই মনস্থ করে, ত্রিভুবন-সঞ্চারিণী হয়েও সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত কাশীতেই অবস্থান করছে।

অগস্ত্য এই যোগিনীদের পরিচয় পেতে উৎসুক হলে ষড়ানন বললেন—"গজাননা সিংহমুখী গৃধ্রাস্যা কাকতুণ্ডিকা। উষ্ট্রগ্রীবা হয়গ্রীবা বারাহী শরভাননা॥/উলূকিকা শিবারাবা ময়ূরী বিকটাননা। অষ্টবক্রা কোটরাক্ষী কুব্জা বিকটলোচনা॥/শুষ্কোদরী ললজ্জিহ্বা শ্বদংষ্ট্রা বানরাননা। ঋক্ষাক্ষী কেকরাক্ষী চ বৃহত্তুণ্ডা সুরাপ্রিয়া॥/কপালহস্তা রক্তাক্ষী শুকী শ্যেনী কপোতিকা। পাশহস্তা দণ্ডহস্তা প্রচণ্ডা চণ্ডবিক্রমা॥/শিশুঘ্নী পাপহন্ত্রী চ কালী রুধিরপায়িনী। বসাধয়া

গর্ভভক্ষা শবহস্তান্ত্রমালিনী॥/স্থূলকেশী বৃহৎকুক্ষিঃ সর্পাস্যা প্রেতবাহনা। দন্দশূককরা ক্রৌঞ্চী মৃগশীর্ষা বৃষাননা॥/ব্যাত্তাস্যা ধূমনিঃশ্বাসা ব্যোমৈকচরণ উর্দ্ধদৃক। তাপনী শোষনীদৃষ্টিঃ কোটরী স্থূলনাসিকা॥/ বিদ্যুৎপ্রভা বলাকাস্যা মার্জ্জারী কটপূতনা। অট্টাট্টহাসা কামাক্ষী মৃগাক্ষী মৃগলোচনা॥" /(৪৫/৩৪-৪১)

মণিকর্ণিকাকে সামনে রেখে কাশীতে অবস্থিত এই চৌষট্টি যোগিনীর নাম ত্রিসন্ধ্যা জপে সর্ববাধা দূর হয়ে অভীষ্টসিদ্ধি লাভ হয়।

[অধ্যায় ৪৬—৫১]

যোগিনীগণ প্রত্যাগমন করল না দেখে দেবদেব সূর্যকে আবাহণ করে, তাকে পাঠালেন ধর্মমূর্তি মহীপতি দিবোদাসকে কোনরূপ অবমাননা না করে তাঁর জন্যে সেই ক্ষেত্র উদ্ধার করতে। বললেন ঃ

"তব বুদ্ধিবিকাসেন চ্যবতে চেৎ স ধর্ম্মতঃ।

তদা সা নগরী ভানো ত্বয়োদ্বাস্যাসহৈঃ করৈঃ॥" (৪৬/৫)

—তোমার বুদ্ধিবলে তিনি যদি ধর্মচ্যুত হন, তাহলে তোমার দুঃসহ কিরণজালে নগরীকে সন্তাপিত করে তুলবে।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য এবং অহঙ্কার-রূপ ষড়রিপু বিবর্জিত সেই পুরী জয় যদিও দুঃসাধ্য তবুও মহাদেবের আদেশে উৎফুল্ল হৃদয়ে সূর্য নভোমার্গ অবলম্বন করে চললেন কাশী অভিমুখে।

অন্তর্বহিশ্চর রবি কাশীক্ষেত্রে গমন করে এক বৎসরকাল বিভিন্ন বেশে কাশী পরিভ্রমণ করলেন। অতিথির বেশে কখনো কোন দুর্লভ বস্তু প্রার্থনায়, কখনো গণকবেশে, কখনো বা জটাধারী, দিগম্বর-রূপে, কখনো বা বিপ্র, রাজপুত্র, বৈশ্য, ব্রহ্মচারী যতিরূপে ঘুরে ঘুরেও এমন কোন অধর্মাচার দেখতে পেলেন না, যার ছিদ্র পথে দিবোদাসকে অবমাননা না করে দেবদেবের কার্য সাধন করা যেতে পারে।

ব্যর্থ মনোরথ বিভাবসু তখন স্থির করলেন, প্রত্যাগমন করে হর-

কোপানলে অনঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হওয়ার চেয়ে ক্ষেত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে বারাণসীতেই অবস্থান করে থাকবেন। মহাদেব রুষ্ট হয়ে আমার তেজের হানি করলে পিতামহ ব্রহ্মারও কিছু করায় থাকবে না কিন্তু কাশীতে বাস করে আত্মজ্ঞান জনিত বিমল তেজের আমি অধিকারী হয়ে থাকতে পারব। তম-অপনয়নকারী, জগচ্চক্ষু সূর্য এই ভেবে নিজেকে বারোটি রূপে বিভক্ত করে, সেই অবধি কাশীতেই থেকে গেলেন। কাশীপুরীতে সেই ক্ষেত্র-রক্ষক দ্বাদশ-আদিত্য হলেন—লোলার্ক, উত্তরার্ক, সাম্বাদিত্য, দ্রুপদাদিত্য, খখোল্কাদিত্য, ময়ুখাদিত্য, অরুণাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য, গঙ্গাদিত্য আর যমাদিত্য।

"তস্যার্কস্য মনো লোলং যদাসীৎ কাশিদর্শনে।

অত লোলার্ক ইত্যাখ্যা কাশ্যাং জাতা বিবস্বতঃ॥" (৪৬/৪৮)

—কাশী দর্শনে অর্ক (সূর্য) দেবের মন লোল (লোলুপ) হয়ে উঠেছিল তাই কাশীতে বিবস্বত লোলার্ক নামে আখ্যাত।

অসি-সঙ্গমের দক্ষিণে লোলার্কদেব অবস্থান করে কাশীবাসিজনের সর্বদাই যোগ মঙ্গল করে চলেছেন।

বারাণসীর উত্তরদিকে অর্ক-নামে এক কুণ্ডসমীপে মহাতেজা উত্তরার্কের অধিষ্ঠান। অগস্ত্য! এই প্রসঙ্গে যে পুরা কাহিনী আছে বলি শোন।

কাশীতে সদা-অতিথিপরায়ণ আত্রেয় বংশজ প্রিয়ব্রত নামে এক ব্রাহ্মণের ঔরসে পতিসেবা পরায়ণা পত্নী শুভব্রতার গর্ভে সর্ব-সুলক্ষণ-যুক্তা একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পিতৃগৃহে সেই গৃহকর্মনিপুণা, বিনয়ব্রতাচারী কন্যা দিনে দিনে চন্দ্রকলার মত যতই বাড়তে থাকে, ততই তাকে সৎপাত্রস্থ করার চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠতে থাকেন তার পিতা। শেষে নিদারুণ চিন্তাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করলেন প্রিয়ব্রত। শুভব্রতাও কন্যাকে রেখে স্বামীর অনুগমন করে সহধর্মিনীর ব্রত পালন করলেন। পিতা-মাতা কন্যার সামনেই

বিগতদেহ হলে অদত্তা সেই কন্যা নানাবিধ অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা-ভাবনা করে দেহের অনিত্যতা-নিবন্ধন জিতেন্দ্রিয়া এবং জিতহৃদয়া হয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে উত্তরার্ক সূর্যের কাছের স্থির মানসে উগ্র তপস্যায় নিরতা হল। তপস্যায় প্রবৃত্ত হলে প্রতিদিনই ছোট একটা ছাগী সেখানে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত, কিছু তৃণ-পর্ণ খেয়ে সন্ধ্যা হলে সেই অর্ককুণ্ড থেকে জল পান করে স্বগৃহে প্রস্থান করত।

এইভাবে কেটে গেল পাঁচ-ছ' বৎসর।

একদিন স্বেচ্ছাবিহারে বেড়িয়েছেন পার্বতীকে নিয়ে মহাদেব। ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে তপস্যায় কৃশাঙ্গী, সমাধিযোগে নিমী-লিতাক্ষী সেই কন্যাকে দেখে পার্বতীর হৃদয়ে অনুকম্পার সঞ্চার হল। তিনি মহাদেবকে অনুরোধ জানালেন কন্যাকে বর দান করতে। মহাদেবও গিরিজার অনুরোধ রক্ষা করতে সেই কন্যা সমীপে গিয়ে বর প্রার্থনা করতে বললেন। কন্যা নিজের জন্য কোন বর প্রার্থনা না করে তার তপস্যার সাক্ষীস্বরূপ ছাগসূতার পশুত্ব মুক্তির জন্যে ত্রিলোচনের কাছে অনুরোধ জানাতে দেবদেব তার পরহিতৈষণায় চমৎকৃত এবং মুগ্ধ হয়ে পার্বতীকে বললেন—এই কন্যা বরগ্রহণের যথার্থ পাত্রী। তুমি বল এই সুলক্ষণা আর ছাগসূতাকে কি বর দিলে তুমি তৃপ্ত হবে?

পার্বতী বললেন—এই কন্যা আবাল্য ব্রহ্মচারিণী। এই কারণে এই শরীরেই দিব্যায়বভূষণা, দিব্যবস্ত্রা, দিব্যগন্ধা, দিব্যমাল্যা, দিব্যজ্ঞান-সমন্বিতা এবং চামরধারিণী হয়ে আমার সঙ্গে আমার জয়া, বিজয়া, জয়ন্তিকা প্রভৃতি সখীদের সঙ্গে সর্বদা অবস্থান করুক। আর এই ছাগী যেহেতু শীততাপ উপেক্ষা করে সূর্যোদয়ের পূর্বে এই অর্ককুণ্ডে প্রত্যহ স্নান করেছে, সেই অর্জিত পুণ্যবলে কাশীরাজের শুভলোচনা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্য জন্ম উপভোগ করুক। আর, হে প্রভো! আজ থেকে এই কুণ্ড ভূমণ্ডলে 'বর্করী কুণ্ড' নামে পরিচিত হোক।

মহাদেবও পার্বতীর অভিপ্রেত বর প্রদান করে গিরিজাকে নিয়ে স্থানান্তরে গমন করেছিলেন।

স্কন্দ অতঃপর মহামুনি অগস্ত্যকে বললেন সাম্বাদিত্যের কাহিনী।

পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য যদুকুলে দেবকীর গর্ভে স্বয়ং ভগবান বাসুদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই ভগবান বাসুদেবের রূপগুণসম্পন্ন, বলশালী, বহুশাস্ত্রতত্ত্বগত আশী লক্ষ পুত্র ছিলেন। একদিন ব্রহ্মার মানসপুত্র মৌঞ্জীমেখলাধারী, গোপীচন্দনচর্চিত-দেহ গগনবিহারী দেবর্ষি নারদ সেই পুত্রদের দর্শনাভিলাষে এলেন দ্বারকা-পুরীতে। দেবর্ষিকে দেখে বিনয়াবনত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন কিন্তু জাম্ববতী-তনয় সাম্ব আপন রূপযৌবনের গর্বে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করলেন নারদকে ' মহামুনি নারদ সাম্বের এই উদ্ধত আচরণে এবং আচরণের কারণ অনুধাবন করে কৃষ্ণসমীপে গিয়ে বললেন—হে কৃষ্ণ! আপনি বোধ হয় অবগত নন যে, আপনার আটজন মহিষী ব্যতিরেকে আর সব মহিষীই এই রূপযৌবন মদমত্ত সাম্বের প্রতি আসক্ত।

বিভ্রান্তি জাগল বাসুদেবের মনে। পূর্বে সাম্বের মধ্যে কোন প্রকার কার্য-বিকার তিনি দেখেন নি। এবার দিবারাত্র তিনি পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন সাম্বকে।

কিছুকাল গত হলে আবার হঠাৎই দেবর্ষি নারদ এমনিই এক সময়ে দ্বারকায় কৃষ্ণ-সন্দর্শনে এলেন, যখন তিনি লীলাবতী গোপিনীদের নিয়ে আপন মন্দিরে লীলারত। নারদ এসেই সাম্বকে ডেকে বললেন কৃষ্ণ-সমীপে তাঁর আগমন-বার্তা জানাতে। সাম্ব পড়লেন মহা দ্বন্দ্বের মধ্যে। একদিকে, অন্তঃপুরে জননীগণ-বেষ্টিত পিতৃদেবের কাছে যাওয়া যেমন এখন শ্লাঘনীয় নয়, অপরদিকে আবার, একবার নারদকে প্রণাম না-করার অপরাধ তদুপরি বর্তমান আজ্ঞা পালন না করার অপরাধে নিদারুণ ব্রহ্মচর্য কোপানলে পড়তে হতে পারে। পিতৃ-কোপ প্রশমিত হতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম-কোপাগ্নি দাবানল সমান।

শেষ পর্যন্ত সাম্ব অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। স্ত্রী-মণ্ডল পরিবেষ্টিত

কৃষ্ণকে প্রণাম করে যে মুহূর্তে নারদের আগমন-বার্তা তাঁর গোচরে আনতে যাবেন, ঠিক তখনি স্বীয় কার্যসিদ্ধির অভিলাষে নারদ এসে দাঁড়ালেন সাম্বের পিছনে। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ, সাম্ব-সহ দেবর্ষিকে দেখে পীতকৌশেয়-বসন সুসংযত করে মুনিকে সসম্ভ্রমে নিয়ে গিয়ে বসালেন আপন শয্যায়। কৃষ্ণলীলায় শ্লথবাসা দ্রবীভূতাবয়বা লীলা-সঙ্গিনী গোপকন্যারাও সলজ্জে শ্লথ-বসন সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সাম্ব-ও তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেন সেখান থেকে।

তদবস্থায় একান্তে কৃষ্ণকে পেয়ে নারদ বললেন ঃ

"পশ্য পশ্য মহাবুদ্ধে দৃষ্ট্বা জাম্ববতীসুতম্।
ইমাঃ স্খলিতমাপন্নাস্তদ্রূপক্ষুব্ধচেতসঃ॥" (৪৮/৩৫)

—হে মহাবুদ্ধে ? দেখুন জাম্ববতী-তনয়কে দেখে এঁদের সকলেরই বসন স্খলিত, বদন ও চিত্ত ক্ষোভিত হয়েছে।

যদিও সাম্ব প্রতি মহিষীকেই জাম্ববতী সমান শ্রদ্ধা করতেন, কৃষ্ণের তা অগোচর ছিল না, তবুও এই মুহূর্তে বিভ্রান্তি তাঁকে গ্রাস করল এবং পুত্র সাম্বকে ডেকে অভিশম্পাত দিলেন ঃ

"যস্মাত্ত্বদ্রূপমালোক্য গোপাল্যঃ স্খলিতা ইমাঃ।
তস্মাৎ কুষ্ঠী ভব ক্ষিপ্রমকাণ্ডাগমনেন চ॥" (৪৮/৩৭)—

—তোমার রূপ বিলোকন করে এই গোপিনীরা স্খলিত-ভাব প্রাপ্ত হয়েছে, সেই কারণে তুমি অবিলম্বে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হও।

মহাব্যাধি ভয়ে কম্পমান সাম্ব শাপ-শান্তির আবেদন নিয়ে লুটিয়ে পড়লেন পিতৃচরণে। নিরপরাধ সাম্বের প্রতি পিতৃ-হৃদয়ও দ্রবীভূত হল। বললেন, হে সাম্ব ! মহাদেবের আনন্দকানন বারাণসীতে গিয়ে সূর্যের উপাসনা ছাড়া তোমার পাপশান্তি এবং ব্যাধিমুক্তি হবে না। তুমি সত্বর সেখানে যাও।

অতঃপর নারদ কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে আকাশমার্গে প্রস্থান করলেন আর সাম্বও বারাণসীতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমদিকে কুণ্ড নির্মাণ করে যে আদিত্যমূর্তির উপাসনা করে নীরোগ এবং পূর্বদেহকান্তি লাভ করেছিলেন। তিনিই হলেন সাম্বাদিত্য।

হে অগস্ত্য! পুরাকালে জগতের হিত-কামনায় স্বয়ং পঞ্চানন পাঁচটি রূপে বিভক্ত হয়ে পাণ্ডুতনয়রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণও সেই সময় তাঁদের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জগদ্ধাত্রী উমাও যজ্ঞশীল দ্রুপদ মহীপতির যজ্ঞকুণ্ড হতে উৎপন্ন হয়ে দ্রৌপদীরূপে পঞ্চ-পাণ্ডবের সহধর্মিণী হয়েছিলেন। জ্ঞাতি ভ্রাতাদের বিরূপতায় এই পঞ্চ-পাণ্ডবকে অনেক ক্লেশ পেতে হয়েছিল। একবার যখন বনবাসে জীবন-যাপন করছিলেন পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী বারাণসীতে গিয়ে সূর্যের আরাধনায় রতা হয়েছিলেন। শিব-বরে বলীয়ান যাবতীয় দুঃখ-তিমির-বিদারী সেই আদিত্য দ্রৌপদীর আরাধনায় তৃপ্ত হয়ে তাঁকে একটি হাতা, ঢাকনা আর রন্ধনপাত্র দিয়ে বলেছিলেন— ইচ্ছাপ্রসূতা এই স্থালী সব সময়েই প্রার্থিত অন্ন-ব্যঞ্জন দানে অতিথিকে তৃপ্ত করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রৌপদী স্বয়ং অন্নগ্রহণ না করছেন। সেই সঙ্গে সেই আদিত্য দ্রৌপদীকে আরও একটি বর দিয়েছিলেন।

"বিশ্বেশ্বাদ্দক্ষিণে ভাগে যো মাং তৎপুরতঃ স্থিতিম্।
আরাধয়িষ্যতি নরঃ ক্ষুদ্বাধা তস্য নশ্যতি॥" (৪৯/১৫)

—বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে তোমার সামনে অবস্থিত আমার যে আরাধনা করবে, তার ক্ষুধাজনিত অবসাদ দূর হবে।

সাধুগণের সর্বাভিলাষ-প্রদাতা আদিত্য দ্রৌপদীকে এই বরপ্রদান করে শম্ভুর আরাধনায় নিযুক্ত হলেন আর দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠির-সমীপে প্রত্যাবর্তন করলেন। দ্রৌপদী-কর্তৃক আরাধিত এই আদিত্যই হলেন দ্রৌপদাদিত্য।

স্কন্দ বললেন, হে ঘটোদ্ভব! এবার ময়ূখাদিত্যের মাহাত্ম্য শোন।

পুরাকালে একবার ভগবান সহস্রমালি ত্রিলোক-বিখ্যাত পঞ্চনদতীর্থে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে স্বর্ণকমলকান্তি গভস্তিমাল্যের দ্বারা তার পূজা এবং মঙ্গলদায়িনী মঙ্গলগৌরী প্রতিষ্ঠা করে তার আরাধনায় রত হলেন। দিব্য শতসহস্র বৎসর সেই নিশ্চল আরাধনায় অতিক্রান্ত হল সূর্যদেবের। তপস্যাতেজে অধিকতর

তেজস্বী হয়ে সূর্যদেব ত্রৈলোক্যদহনক্ষম ময়ুখ (কিরণ) মালায় পরিব্যাপ্ত হলেন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যভাগে। তাঁর সেই তীব্র তেজোরাশিতে চরাচর ত্রিভুবন কম্পিত হয়ে উঠল। বিশ্বাত্রতা বিশ্বেশ্বর লোকসমূহের ব্যাকুলতায় সূর্যকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে বরপ্রদান করতে গেলেন। সূর্যদেব সমাধিযোগে এমনি মগ্ন যে মহাদেবের আহ্বান তার কর্ণগোচর হল না। অতঃপর মহাদেব তাঁকে স্পর্শ করতেই সূর্যদেবের সমাধি ভঙ্গ হল। তিনি নয়ন উন্মীলন করে সামনেই পার্বতীসহ মহাদেবকে দেখে চৌষট্টিনাম সংযুক্ত অষ্টক-স্তোত্রে এবং মঙ্গলাষ্টক স্তোত্রে মঙ্গলাগৌরী পার্বতীর স্তব করলেন। পরিতুষ্ট হলেন মহাদেব। বর দিলেন, তোমার রচিত এই স্তোত্রদ্বয় সর্বসিদ্ধিপ্রদাতা হোক, তোমার স্থাপিত 'গভস্তীশ্বর' লিঙ্গ মোক্ষদাতা হোক, আর ঃ

"ময়ুখা এব খে দৃষ্টা ন চ দৃষ্টং কলেবরম্।
ময়ুখাদিত্য ইত্যাখ্যা ততস্তেঽদিতিনন্দন ॥" (৪৯/৯৩)

হে অদিতিনন্দন! তপস্যাকালে যেহেতু আকাশমার্গে তোমার ময়ুখ (কিরণ)-সমূহই দৃষ্ট হয়েছে, কলেবর দৃষ্ট হয়নি, সেই হেতু, তুমি 'ময়ুখাদিত্য' নামেই পরিচিত হবে।

হে কলসোদ্ভব! বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের উত্তরভাগে পৈশঙ্গিল (পিলি-পিলা) তীর্থে 'খখোল্ক' নামে যে ভগবান আদিত্য বিরাজমান, অতঃপর তার কাহিনী বলি শোন।

পুরাকালে মরীচিতনয় কশ্যপের দুই পত্নী, দক্ষ-প্রজাপতির দুই কন্যা কদ্রু আর বিনতার মধ্যে সবিতার রথাশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার গাত্রবর্ণ বিচিত্র না ধবল, এর ওপর পণক্রীড়া হয়েছিল। সপত্নীর উপর বিদ্বিষ্টমনা কদ্রু পণ রেখেছিলেন, যার কথা ঠিক না হবে সে অপরের দাসী হবে। এই জাতীয় পণক্রীড়ায় অনিচ্ছুক বিনতা বাধ্য হয়েই সম্মতি জানিয়েছিলেন। কদ্রু হলেন সর্পিনী এবং সর্পকুলের জননী আর পক্ষিনী বিনতা হলেন গরুড়-জননী। নির্মলমনা বিনতা কদ্রুর

শর্তে সম্মতি জানাতেই কুটীলমনা কদ্রু তার সন্তানদের ডেকে বললেন, মন্দর পর্বত দিয়ে দেবাসুরের দ্বারা মথ্যমান ক্ষীরসমুদ্র হতে উত্থিত উচ্চৈঃশ্রবার সন্নিকটে এখনি গিয়ে তোমরা কৃষ্ণবর্ণ কুণ্ডলের মত তার পুচ্ছমধ্যে অবস্থান কর আর তোমাদের বিষনিঃশ্বাসে ঐ অশ্বের সর্বদেহ কৃষ্ণবর্ণ করে ফেল। মাতৃ-আজ্ঞা শুনে ক্ষুব্ধ হল নাগগণ। জানাল, এমনতর কুটীল আদেশ তারা পালন করতে পারবে না। ক্রুদ্ধা নাগমাতা কদ্রু শাপ দিলেন তাদের—অবাধ্য সন্তানেরা তার গরুড়ের ভক্ষ্য হবে আর সর্পিনীরা জাতমাত্র স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে ভক্ষণ করবে। শাপানলে ভীত হয়ে কেউ কেউ পাতালে পলায়ন করল; কেউ কেউ শাপমুক্তির আশায় জননীর আদেশ পালনে ব্রতী হল। তারা সূর্যের প্রখর কিরণকেও অগ্রাহ্য করে উচ্চৈঃশ্রবার আশ্রয় গ্রহণ করে মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করল।

অনন্তর কদ্রু বিনতার পৃষ্ঠে আরোহণ করে গগন-মার্গে যেতে যেতে সূর্য কিরণে এতই সন্তাপিত হয়ে উঠলেন যে, বারবার বিহঙ্গী বিনতাকে অনুরোধ জানাতে লাগলেন একটু বিশ্রামের জন্যে। এই সময়েই কদ্রুর মুখ থেকে বেড়িয়েছিল 'খখোল্কা পড়ছে' (খ-অর্থে আকাশ; আকাশ থেকে উল্কা পড়ছে।) এই কথা বলতে বলতেই কদ্রু মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল দেখে বিনতা কোনরকমে তাঁর পক্ষপুটে তাঁকে সামলে নিয়ে খখোল্ক আদিত্যের স্তুতি করলেন। বিনতার স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে দিবাকর স্বীয় প্রখর কিরণ কিয়ৎকালের জন্য সংযত করলে তাঁরা উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখলেন ধবলের পরিবর্তে বিচিত্র বর্ণ। শর্ত-সাপেক্ষে বিনতাকে কদ্রুর দাসী হতে হল।

গরুড় একদিন অশ্রুপূর্ণলোচনা, দীনা, মলিনকান্তি জননী বিনতাকে দেখে জানতে চাইলেন,—মা, প্রতিদিন সকাল হতেই আপনি কোথায় যান আর সন্ধ্যাকালে মলিনবেশে প্রত্যাগমন করেন? বিনতা বাধ্য হয়েই পুত্রের কাছে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বললেন—হে পুত্র! দাসীত্ব-নিবন্ধন আমি পরাধীনা। তাই তোমার বিমাতা কদ্রুর আদেশ মত তাকে আর তার সন্তানদের কখনো মলয়, কখনো মন্দর

পর্বতে, কখনো সমুদ্রে, কখনো কোন অন্তরীপে, পৃষ্ঠে বহন করে নিয়ে যেতে হয়। শুনে, গরুড় খুবই মর্মাহত হলেন এই ভেবে যে তাঁর মত পরাক্রমশালী পুত্র থাকতে মায়ের এই দশা! তিনি মাকে বললেন—আপনি ওদের জিজ্ঞাসা করুন মা, তুর্লভ এমন কি বস্তু আছে, যা পেলে, ওরা আপনাকে মুক্তি দেবে, আমি তাই এনে দেব। বিনতা কদ্রুকে জিজ্ঞেস করতে, কদ্রু চেয়ে বসলেন অমৃত। বিনতা এসে গরুড়কে বলতে, গরুড় মাকে নিশ্চিন্ত আশ্বাস দিয়ে বললেন—সেই দেবতুর্লভ অমৃতই আমি ওদের এনে দেব।

নভোমণ্ডল বিক্ষোভিত করে প্রলয়কালীন প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় গরুড় চললেন অমৃত আহরণে। পথিমধ্যে সমুদ্রতীরে মৎস্যঘাতী নিষাদ আর তুর্বৃত্তদের ভক্ষণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন। না দৈত্য, না দানব এমনি এক অজ্ঞাত পরিচয় বস্তুকে সবেগে স্বর্গাভিমুখী হয়ে আসতে দেখে ত্রস্ত হয়ে উঠলেন দেবগণ। অস্ত্র ধারণ করে, বর্মাচ্ছাদিত হয়ে স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করে তার গতিরোধ করার জন্য এগিয়ে এলেন তাঁরা। কিন্তু পক্ষীরাজের পক্ষকম্পন-সঞ্জাত বায়ুবেগে সশস্ত্র সবাহন দেবগণ ইতস্তত তৃণপত্রের ন্যায় বিতাড়িত হয়ে গেলেন। সেই সুযোগে অমৃতাগারে ঢুকলেন গরুড়। সেখানে সশস্ত্র অমৃতরক্ষকদের পরাজিত করে দেখলেন, অমৃত ভাণ্ডের উপর একটি চাকা, মন ও পবনের তুল্য এমনি বেগে ঘুরছে যে একটি মশকেরও জীবন বিনিময় ছাড়া প্রবেশ অসাধ্য। দেবদেব শঙ্করকে স্মরণ করে মাতৃভক্ত গরুড় পরমাণু হতেও সূক্ষ্ম শরীর পরিগ্রহ করে অমৃতভাণ্ড নিয়ে গমনোদ্যত হতেই চতুর্দিক হতে দেবগণ তাঁকে আক্রমণ করলেন। গরুড়ও চৌষট্টিদণ্ড (সাড়ে পঁচিশ ঘণ্টা) ধরে তাঁদের সাথে ঘোর সংগ্রাম করে তাঁদের পরাজিত করলে, বিষ্ণু বললেন—হে খগেশ্বর! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি; তুমি বর প্রার্থনা কর। শুনে গরুড় সহাস্যে জনার্দনকে বললেন :

"অহমেব প্রসন্নোহস্মি ত্বং প্রার্থয় বরদ্বয়ম্" (১০৯)—

—আমিও আপনার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। আপনি তুটি বর

প্রার্থনা করুন।

বিষ্ণু বললেন—বেশ, তাহলে এক বরে তুমি আমার বাহন হও। আর দ্বিতীয় বরে এই অমৃত দেখিয়ে তুমি তোমার মায়ের দাসীত্ব মোচন কর। কিন্তু সর্পদের অমৃত খাবার সুযোগ না দিয়ে, তুমি তা দেবগণকে প্রত্যার্পণ কর।

গরুড় সম্মতি জানিয়ে স্বর্গ হতে নির্গত হয়ে অমৃতভাণ্ড এনে রাখলেন নাগগণের কাছে। বিনতার দাসীত্ব মোচন হল। নাগগণ অমৃতপানে সমুৎসুক হলে গরুড় তাদের স্নানান্তে অশুচিত্ব পরিত্যাগ করে অমৃত গ্রহণের পরামর্শ দিলেন এবং কুশাসনে অমৃতভাণ্ড রেখে জননীকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

গরুড়ের পরামর্শে সর্পগণ নদীতে স্নান করতে গেলে সেই অবকাশে বিষ্ণু অমৃতভাণ্ড হরণ করে দেবতাদের প্রত্যার্পণ করলেন। নাগেরা ফিরে এসে ভাণ্ড না দেখতে পেয়ে কুশ লেহন করার ফলে তাদের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

অতঃপর দাসীত্ব-নিবন্ধন পাপশান্তির নিমিত্ত বিনতা পুত্র গরুড়কে নিয়ে, গেলেন কাশীধামে। সেখানে গিয়ে জিতেন্দ্রিয় পক্ষীন্দ্র একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করে আর বিনতা খখোল্ক নামক মঙ্গলময় আদিত্য-মূর্তির সামনে বসে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তপস্যায় তুষ্ট উমাপতি গরুড়-প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ হতে আবির্ভূত হয়ে বললেন ঃ

> "বেৎস্যসি ত্বং রহস্যং মে যন্ন জ্ঞাতং সুরৈরপি।
> ত্বয়ৈতৎ স্থাপিতং লিঙ্গং গরুড়েশ্বরসংজ্ঞিতম্॥
> পরমজ্ঞানদং পুংসাং দৃষ্টং স্পৃষ্টং সমর্চ্চিতম্।" (৫০/১৪২-৪৩)

—দেবগণও যা জ্ঞাত নন, হে খগেন্দ্র, তুমি অনায়াসে আমার সেই তত্ত্ব অবগত হবে। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই 'গরুড়েশ্বর' লিঙ্গ দর্শনে, স্পর্শনে এবং অর্চনায় মানবগণ পরম জ্ঞান লাভ করবে।

এছাড়াও, হে পক্ষীন্দ্র! আমিই বিষ্ণু। তাঁর আর আমার মধ্যে তোমার যেন কোনরূপ ভেদদৃষ্টি না জন্মায়। তুমি বিষ্ণুর বাহন হয়ে সকলের পূজনীয় হবে।

আর এদিকে মহাদেবেরই পরামূর্তি খখোল্ক-নামক ভাস্কর বিনতাকে শিবজ্ঞান-সমন্বিত পাপহারী বর প্রদান করে 'বিনতাদিত্য' নামে বিখ্যাত হলেন। সেই বিনতাদিত্যই কাশীতে খখোল্কাদিত্য নামে বিরাজিত।

অগস্ত্য শিবতনয় ষড়াননের কাছে জানতে চাইলেন, গরুড় জননী সাধ্বী বিনতার দাসীত্ব-প্রাপ্তির গূঢ় কারণ কি?

স্কন্দ বললেন, মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর হয়েছিল শত পুত্র আর বিনতার উলুক, অরুণ আর গরুড় নামে তিনটি তনয়। বিনতার সেই তিনপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন কৌশিক হয়েছিল পক্ষীকুলের রাজা। কিন্তু ক্রুরাক্ষ, দিবান্ধ এবং বক্রনখ এই কৌশিকের কোন গুণ না থাকায় সকলে মিলে তাকে রাজ্যচ্যুত করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠল। তাই দেখে বিনতা পুত্রদর্শন লালসায় হাজার বছর অতিক্রান্ত হতে তখনো দুশো বছর বাকি দ্বিতীয় অণ্ডটি বিদীর্ণ করলেন। অণ্ডমধ্যস্থ শিশুটি তখনও সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয়নি। অর্ধনিষ্পন্নদেহ সেই তেজোময় শিশু অণ্ড হতে নির্গত হয়েই ক্রোধারুণ লোচনে মাকে অভিশাপ দিয়েছিল এ বলে যে, সপত্নী তনয়দের দেখে ঈর্ষাবশে তুমি অণ্ড দ্বিখণ্ডিত করায় আমার অবয়ব পূর্ণ হতে পেল না। তার জন্যে তোমাকে সপত্নী পুত্রগণের দাসী হয়ে থাকতে হবে। শাপভয়ে কম্পিতা বিনতা পুত্রের কাছে শাপমোচনের উপায় জানতে চাইলে অরুণ আকাশমার্গে আনন্দকাননে গমনের পূর্বে জননীকে বলে গিয়েছিল ঃ

"অণ্ডং তৃতীয়ং মা ভিন্ধি হ্যনিষ্পন্নং মমেব হি।
অস্মিন্নণ্ডে ভবিষ্যো যঃ স তে দাস্যং হরিষ্যতি॥" (৫১/১৫)

—আমাকে যেমন করেছ, তেমনিভাবে অপুষ্টাবস্থায় তৃতীয় অণ্ডটি প্রস্ফুটিত কোরো না। তাহলেই, এতে যে সন্তান হবে, সেই তোমার দাসীত্ব মোচন করবে।

অতঃপর দেব স্কন্দ অরুণাদিত্যের উপাখ্যান বললেন মুনি

অগস্ত্যকে।

বিনতার দ্বিতীয় তনয় উরুহীন হয়ে অণ্ড হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল বলে, তার নাম "অনূরু" হয়েছিল আর মাতৃশাপোদ্ধত হওয়ার সময় তাঁর মুখমণ্ডল ক্রোধে অরুণবর্ণ হয়েছিল বলে সে 'অরুণ' নামেও প্রখ্যাত হয়েছিল। এই অরুণ কাশীতে সূর্যদেবের তপস্যা করেছিল এবং সূর্যও প্রীত হয়ে তাকে বরদান করে 'অরুণাদিত্য' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই অরুণাদিত্য অরুণকে এই বলে বর দিয়েছিলেন ঃ

"তিষ্ঠানূরো মম রথে সদৈব বিনতাত্মজ।
জগতাঞ্চ হিতার্থায় ধ্বান্তং বিধ্বংসয়ন্ পুরঃ॥" (৫১/২০)

—হে অনূরু! জগতের হিতের জন্য তুমি আমার রথে সতত অবস্থান করে সর্বাগ্রে অন্ধকাররাশি বিধ্বংস কর।

সেই থেকে অরুণ প্রাতঃকালে সূর্যরথে সমাসীন আর বিশ্বেশ্বরের উত্তরে প্রতিষ্ঠিত অরুণাদিত্য দুঃখ, দারিদ্র এবং পাপ-বিমোচনরূপে বিদ্যমান।

এবার শোন জরা-ব্যাধি পরিত্রাতা বৃদ্ধাদিত্যের কাহিনী।

বারাণসী ক্ষেত্রে বৃদ্ধহারীত নামে এক মহা-তপস্বী বিশালাক্ষী-দেবীর দক্ষিণে সূর্যের এক শুভদ এবং শুভলক্ষণযুক্ত মূর্তি স্থাপন করে আরাধনায় রত হয়েছিলেন। তুষ্ট আদিত্য বরদানে উদ্যত হলে বৃদ্ধহারীত এই বর চাইলেন ঃ

"যদি প্রসন্নো ভগবান্ যুবত্বং দেহি মে পুনঃ॥
তপঃকরণসামর্থ্যং স্থবিরস্য ন মে যতঃ।
পুনস্তারুণ্যমাপ্তোঽহং চরিষ্যাম্যুত্তমং তপঃ॥" (৫১/৩১-৩২)

—হে ভগবন্! যদি প্রসন্নই হয়ে থাকেন, তবে আমাকে যুবত্ব দিন, আমি যেন যুবা হই। স্থবিরত্বের কারণে আমার তপঃসামর্থ্য বিলুপ্ত হয়েছে। তারুণ্য লাভ করে আমি যেন আবার কঠোর তপস্যায় ব্রতী হতে পারি।

জরা-দুর্গতিহরা আদিত্য বৃদ্ধহারীতকে প্রার্থিত বর প্রদান করে

বার্ধক্য হরণ করেছিলেন—তাই তিনি 'বৃদ্ধাদিত্য' নামে প্রসিদ্ধ।

জগচ্চক্ষু আদিত্য কিভাবে কেশবাদিত্য হয়েছিলেন, শোন।

কোন একসময়ে সূর্যদেব গগনমার্গে গমন করতে করতে দেখতে পেলেন ভগবান আদিকেশব শ্রীহরি নারায়ণ মহাদেবের লিঙ্গপূজায় নিবিষ্ট। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আকাশমার্গ হতে অবতরণ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন নিঃশব্দ নিশ্চল শ্রীহরির সামনে। অর্চনা শেষ হলে সূর্যদেব তাঁকে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করলেন, শ্রীহরিও সসম্মানে তাঁকে সামনে বসাতে, আদিত্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"অন্তরাত্মাসি জগতাং বিশ্বম্ভরজগৎপতে।
তবাপি পূজ্যঃ কোঽপ্যস্তি জগৎপূজ্যাত্র মাধব॥" (৫১/৫০)

—হে বিশ্বম্ভর, জগৎপতে! হে মাধব! আপনিই জগৎপূজ্য এবং নিখিল বিশ্বের অন্তরাত্মা। কে এখানে থাকতে পারেন, যিনি আপনারও অর্চনীয়!

শ্রীহরি বললেন—ত্রিভুবনবিজয়ী, সমস্ত কারণের কারণ মৃত্যুঞ্জয়, যাঁর আরাধনা করে শ্বেতকেতু আর শিলাদতনয় মৃত্যুকে জয় করেছিল; কালেরও কালস্বরূপ স্মরহর, যাঁর আরাধনা করে ভৃঙ্গী কালকে জয় করেছিল; যাঁর হেলায় নিক্ষিপ্ত একটি বানে ত্রিপুরাসুর নিহত হয়েছিল; যাঁর পূজা করেই আমি নিজে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য-সম্পত্তি লাভ করেছি; সেই দেবদেব মহাদেবই আমার অর্চনীয়। মহাদেবের লিঙ্গপূজাই পরম যোগ, পরম তপস্যা, পরম জ্ঞান আর পুরুষার্থ-চতুষ্টয় লাভের একমাত্র সহায়ক।

তবে সবাই লিঙ্গপূজার অধিকারী হতে পারে না। মহেশ্বর যাদের সংসার-বন্ধন ছেদন করতে ইচ্ছা করেন, তাঁদেরই একমাত্র বারাণসীতে শিবলিঙ্গপূজায় মতি হয়ে থাকে। হে অর্ক! পরম তেজোময় সৌন্দর্য লাভ করার জন্য তুমিও মহেশ্বরের লিঙ্গপূজা কর।

বিষ্ণুর এইসব কথা শুনে সূর্যদেব স্ফটিকময় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, আদিকেশবকে গুরুপদে বরণ করে, তাঁর উত্তরে অবস্থিত হয়ে

আজও সেই লিঙ্গের পূজা করে থাকেন। এই আদিত্যই কাশীতে সপ্তজন্মার্জিত পাপশান্তিরূপ 'কেশবাদিত্য'।

স্কন্দ বললেন, হে মুনে! অতঃপর বারাণসীতে হরিকেশ বনে অবস্থিত বিমলাদিত্যের কাহিনী শোন :

পুরাকালে পার্বত্য প্রদেশে বিমল নামে এক ক্ষত্রিয় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে দারা-পুত্র-পরিজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে বারাণসীতে গিয়ে অনন্যচিত্তে, করবী, জবা, অশোক, কর্পূর-মিশ্রিত রক্তচন্দনে সূর্যদেবের নিত্য আরাধনায় রত হল। সূর্য সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রোগমুক্ত এবং সবল করে বললেন,—তুমি আর কি বর চাও বল। তখন বিমল প্রার্থনা জানালে :

"যদি প্রসন্নো ভগবন্ যদি দেয়ো বরো মম।
তদা তদ্ভক্তিনিষ্ঠা যে কুষ্ঠং মাস্তু তদন্বয়ে॥
অন্যেঽপি রোগা মা সন্তু মাস্তু তেষাং দরিদ্রতা।
মাস্তু কশ্চন সন্তাপস্ত্বদ্ভক্তানাং সহস্রগো॥ (৫১/৯৩-৯৪)

—হে ভগবন্! প্রসন্ন হয়ে যদি বরই দেবেন, তাহলে এই বর দিন, যারা আপনার ভক্ত তাদের কুলে যেন কুষ্ঠ বা অন্য কোন রোগ না হয়। আর আপনার ভক্তগণ যেন দরিদ্র কিংবা সন্তাপযুক্ত না হয়।

আদিত্য, প্রার্থিত বরই প্রদান করে বিমল যে আদিত্যদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল, তারই সান্নিধ্যে থেকে গেলেন। সেই থেকে বারাণসীতে 'বিমলাদিত্যে'র আবির্ভাব।

বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত গঙ্গাভক্তগণের অভয়-প্রদাতা যে আদিত্যমূর্তি বিরাজিত, ইনিই হলেন 'গঙ্গাদিত্য'। ভগীরথকে অনুসরণ করে গঙ্গাদেবী যখন আগমন করছিলেন আদিত্যদেব তখন এই স্থানে গঙ্গার স্তব করেছিলেন।

হে মহাভাগ! যমতীর্থে স্নান করে যাঁকে দর্শন এবং প্রণাম করলে

আর যমলোক দর্শন করতে হয় না, এবার সেই যমাদিত্যের উৎপত্তির বিবরণ শোন :

পুরাকালে একবার ধর্মরাজ যম, যমতীর্থে বহুতর তপস্যা করে ভক্তগণের সিদ্ধিপ্রদ 'যমেশ্বর' শিবলিঙ্গ আর এক আদিত্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। এই আদিত্যমূর্তি যম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 'যমাদিত্য' নামে পরিচিত।

হে অগস্ত্য! গুহ্যকার্ক প্রভৃতি আরও অনেক আদিত্যমূর্তি সূর্যদেবের ভক্তগণ কাশীতে প্রতিষ্ঠিত করলেও এই দ্বাদশ আদিত্যই প্রধান।

[অধ্যায় ৫২]

যোগিনীরা প্রত্যাবৃত্ত না হওয়ায় দেবদেব কাশীতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য সূর্যদেবকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও প্রত্যাগমন না করায় কন্দর্পহারী মহাদেবের চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠল। দিবোদাস বর্তমানে কাশী-প্রবেশে পরাঙ্মুখ দেবদেব, কাশীতত্ত্ব সংগ্রহে অধীর হয়ে অবশেষে চতুরানন ব্রহ্মাকে ডেকে, সেখানে পাঠাবার মনস্থ করলেন, কাশী পরিত্যাগের সমুদায় কারণই ব্রহ্মার জ্ঞাত। সুতরাং তিনি সচেষ্ট হলে, দেবদেবের কাশী-প্রবেশের দুর্ঘট বাধা হয়ত অপসারিত হতে পারে। এই ভেবে তিনি সমস্ত কার্যের বিধানকর্তা ব্রহ্মাকে ডেকে বললেন : কাশীবিরহ-জনিত সন্তাপে আমি এতই সন্তাপিত হয়ে উঠেছি যে, আমার মস্তকস্থিত চন্দ্রমার শৈত্য-ও তা বিদূরিত করতে পারছে না।

"নাবাধিষ্ট তথা মাং স তাপো হলাহলোদ্ভবঃ।
কাশী বিরহজন্মাত্র যথা মামতিবাধতে॥" (৫২/১০)

—কাশী-বিরহ জনিত এই তীব্র সন্তাপ পূর্বে হলাহল ভক্ষণ করেও

ভোগ করিনি। হে ব্রহ্মা! সত্বর কাশীতে গিয়ে স্বধর্মনিরত দিবোদাসকে কাশীচ্যুত আর আমার কাশী-প্রবেশের পথ যথাবিধি সুগম কর।

হংসারোহণে হংসবাহন কালবিলম্ব না করে বিশ্বেশ্বরের আনন্দ-নিকেতন, সুর-তরঙ্গিনী-সেবিত, সর্বপাপহর অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীধামে এসে অবতীর্ণ হলেন।

কাশীতে এসে ব্রহ্মা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হলেন দিবোদাস সকাশে। নৃপতিও যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন সহকারে আহ্বান এবং আসন দান করলে ব্রাহ্মণ তাতে উপবেশন করে বললেন,—আমি তোমারই রাজ্যে বহুকাল বাস করছি। তুমি আমাকে না জানলেও আমি তোমাকে সবিশেষ অবগত আছি। তোমার মত জিতেন্দ্রিয়, বিজিত-ষড়বর্গ, তত্ত্বশালী, রাজনীতি-বিচক্ষণ দয়া-দাক্ষিণ্যে নিপুণ, সত্যব্রত-পরায়ণ, জিতক্রোধ নৃপতি খুবই বিরল। তাই তোমার কাছে, আমি যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, তা শোন ঃ

ত্রিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, বেদত্রয়ের সারস্বরূপা এই কাশী-পুরী যার মাহাত্ম্য সর্বজ্ঞান-প্রদাতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সুর্য প্রভৃতি দেব-গণেরও নির্মাতা একমাত্র মহেশ্বর ছাড়া আর কেউ অবগত নন, পূর্বজন্মের পুণ্যবলে দ্বিতীয় মহেশ্বর-রূপে তুমি সেই কাশীর রক্ষক যেখানে কোন কর্মই বিনষ্ট হয় না, সেখানে আমি যজ্ঞ করতে অভিলাষী হয়েছি আর সেই যজ্ঞে তোমার সাহায্য চাই।

আরও একটা কথা, রাজাকে যথাসময়ে সদ্বিষয় শিক্ষা প্রদান কর্তব্য বোধেই আমি তোমাকে তোমার হিতকর একটি উপদেশ দিই —ত্রিজগদীশ্বর মহাদেবকে সাধারণ কোন দেবতা জ্ঞান না করে তাঁর প্রসন্নকর অনুষ্ঠান করা, তোমারও কর্তব্য।

একাগ্রচিত্তে দিবোদাস ব্রাহ্মণের কথা অনুধাবন করে বললেন ঃ হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আপনার যজ্ঞ কর্মে আপনি আমাকে আপনার দাস-রূপে গ্রহণ করুন। আমার সপ্তাঙ্গ রাজ্য মধ্যে যা কিছু আছে, সেই সমুদয়ই আপনার নিজস্ব-বোধে যজ্ঞ কর্মে নিয়োগ করুন। আমার

কোষাগার আপনার যজ্ঞ কর্মের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। হে বিপ্র! আমি রাজ্য পালন করলেও এতে আমার কোন স্বার্থ নেই। আমার পুত্র কলত্র এমনকি নিজ শরীর পরার্থে উৎসর্গ করতে উন্মুখ। এতদিন আমি তেমনি কোন যাচকের অপেক্ষায় ছিলাম; আপনি আমাকে আজ সেই সুযোগ দান করলেন।

রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত যেহেতু আমি রাজা, তাই বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং তীর্থসেবা থেকে প্রজাপালনই আমার কাছে পরম ধর্ম। প্রজাগণের সন্তাপ-অনল, বজ্রানল হতেও কঠোর।

ধর্মশীল নৃপতি দিবোদাসের এই আশ্বাসে সন্তুষ্ট-চিত্ত ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্ভার আহরণে প্রবৃত্ত হলেন। অতঃপর রাজর্ষির অকৃপণ সাহচর্যে ব্রাহ্মণ কাশীতে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞীয় হোমের ধূমরাশি ব্যাপ্ত হয়ে গগনতল সে-সময় যে নীলিমা ধারণ করেছিল, আজও তা বিদ্যমান। বারাণসীতে যে স্থানে ব্রহ্মা এই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, পৃথিবীতে তা শুভপ্রদ তীর্থ 'দশাশ্বমেধ' নামে বিখ্যাত। অনন্তর ভগীরথের সঙ্গে সুরধনী সেখানে এসে তীর্থক্ষেত্রটিকে অতীব পুণ্যপ্রদ করে তুলেছে।

"পুরা রুদ্রসরো নাম তত্তীর্থং কলশোদ্ভব।
দশাশ্বমেধিকং পশ্চাজ্জাতং বিধিপরিগ্রহাৎ॥" (৫২/৬৯)

—হে কলসোদ্ভব! পুরাকালে এই তীর্থ 'রুদ্র সরোবর' নামে বিখ্যাত ছিল। ব্রহ্মার অশ্বমেধ যজ্ঞের পর থেকে 'দশাশ্বমেধ' নামে প্রখ্যাত হয়েছে।

যজ্ঞশেষে ব্রহ্মা বিশ্বসন্তাপহর বিশ্বপতি মহাদেবের কাশীতেই থেকে গেলেন ব্রাহ্মণ বেশে, দশাশ্বমেধের কাছে 'দশাশ্বমেধেশ্বর' শিবলিঙ্গ তদুপরি কাশীর যে স্থানকে অন্তর্গৃহ বলা যায়, সেখানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির সহায়ক 'ব্রহ্মেশ্বর' লিঙ্গ স্থাপন করে। মহাদেবের কার্য সাধনে অপারগ হলেও তিনি কাশীতেই নির্ভয়ে থেকে গেলেন এই ভেবে:

"পরাতনুরিয়ং কাশী বিশ্বেশস্তেতি নিশ্চিতম্।
অস্যাঃ সংসেবনাচ্ছম্ভুর্ন কুপ্যতি পুরো ময়ি॥" (৫২/৭৪)

—এই কাশী যে বিশ্বেশ্বরের পুরাতন এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত. সুতরাং এখানে আশ্রয় গ্রহণ করলে মহেশ্বর কখনই আমার ওপর কুপিত হবেন না।

নৃপতি দিবোদাসও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশধারী ব্রহ্মার জন্যে একটা ব্রহ্মশালা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মহাদেবের আগমন প্রতীক্ষায় ব্রহ্মা সেখানেই অবস্থান করে বেদধ্বনিতে গগনতল নিনাদিত করে চললেন।

[অধ্যায় ৫৩—৫৫]

ব্রহ্মাও প্রত্যাবর্তন না করলে বিস্মিত এবং অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত মহাদেব অতঃপর নাম করে করে আহ্বান জানালেন তাঁর গণদের।

শঙ্কুকর্ণ, মহাকাল, ঘণ্টাকর্ণ, মহোদর, সোম, নন্দিন্, নন্দিষেণ, কাল, পিঙ্গল, কুক্কুট, কুণ্ডোদর, ময়ুরাক্ষ, বাণ, গোকর্ণ, তারক; তিলপর্ণ, স্থূলকর্ণ, দৃমিচণ্ড, প্রভাময়, সুকেশ, বিন্দতে, ছাগ, কপর্দিন, পিঙ্গলাক্ষ, বীরভদ্র, কিরাত, চতুর্মুখ, নিকুম্ভ, পঞ্চাক্ষ, ভারভূত, ত্র্যক্ষ, ক্ষেমক, লাঙ্গলি, বিরাধ, সুমুখ, আষাঢ় প্রভৃতি ছত্রিশ গণ উপস্থিত হল মহাদেবের সামনে। মহাদেব তাদের বললেন, স্কন্দ এবং হেরম্বের মত তোমরাও আমার সন্তান। নৈগমেয়, শাখ, বিশাখ, নন্দী, ভৃঙ্গীর মত তোমরাও আমার প্রিয়। তোমরা সকলে বিদ্যমান থাকতে আমি কাশীর, নৃপতি দিবোদাসের, যোগিনীগণের, সূর্যের, ব্রহ্মার কোন সংবাদ জানতে পারব না?

এই বলে, তিনি প্রথমে কালজয়ী দুই গণ শঙ্কুকর্ণ এবং মহাকালকে পাঠালেন কাশীতে যেন সংবাদ সংগ্রহ করে তারা সত্বর প্রত্যাগমন করে। ❀

শঙ্কুকর্ণ এবং মহাকাল কাশীতে প্রবেশ করা মাত্রই পুরীর বিমোহিনী মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়ল। পুণ্যক্ষেত্র কাশীতে এসেই তারা তাদের সঙ্কল্প ভুলে গেল এবং শঙ্কু বিশ্বেশ্বরের নৈঋতে 'শঙ্কুকর্ণেশ্বর' এবং মহাকাল 'মহাকালেশ্বর' শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে তার পূজার্চনায় অভিনিবিষ্ট হল।

গণদ্বয়ের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখে মহেশ্বর এবার ঘন্টাকর্ণ এবং মহোদরকে পাঠালেন। তারাও কাশীতে গিয়ে আর প্রত্যাবর্তন করল না। ঘণ্টাকর্ণ 'ঘণ্টাকর্ণেশ্বর' শিবলিঙ্গ আর একটা কুণ্ড পিতৃ-লোকতৃপ্তিকারী ঘণ্টাকর্ণ হ্রদ এবং তার পূর্বদিকে মহোদর 'মহোদরেশ্বর' লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই থেকে গেল।

ব্যাপার দেখে বিস্মিত স্মরহর-মনে মনে বললেন ঃ

"পুরাবিদঃ প্রশংসন্তি ত্বাং মহামোহহারিণীম্।
কাশী ত্বিতি জানন্তি মহামোহনভূরিয়ম্॥" (৫৩/৪৪)

—হে কাশী! পুরাবিদ্‌গণ তোমাকে মহামোহ-হারিণী বলে প্রশংসা করে থাকেন, কিন্তু তারা জানে না, তুমি কতবড় মহামোহনভূমি।

আমি যাকে পাঠাব, তুমি তাকেই মোহিত করে রাখবে, জানি, তবু আমি উদ্যম থেকে বিরত হব না।

এবার তিনি আরও পাঁচজন মহাবেগশালীগণ সোমনন্দী, নন্দিষেণ, কাল, পিঙ্গল আর কুক্কুটকে পাঠালেন কাশীতে একই সঙ্কল্পে। তারাও আর প্রত্যাবর্তন করল না। সোমনন্দী আনন্দবনে, তার উত্তরে নন্দিষেণ স্ব-স্ব নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে তার অর্চনায় রত হল। গঙ্গার পশ্চিম-উত্তরে কাল, তার কিছু উত্তরে পিঙ্গল আর কুক্কুটও নিজ নিজ নামে লিঙ্গ স্থাপন করে তন্ময় হয়ে গেল।

এই পাঁচজন যখন ফিরল না, তখন মহেশ্বর নতুনভাবে ব্যাপারটা ভাবলেন।

"কার্য্যমস্মাকমেবৈতদ্ যদি সম্যগ্বিমৃশ্যতে।
অনেনোপাধিনাপ্যেতে তত্র তিষ্ঠন্তু মামকাঃ॥

প্রথমেষু প্রবিষ্টেষু মায়াবীর্য্যমহৎস্বপি।
অহমেব প্রবিষ্টোঽস্মি বারাণস্যাং ন সংশয়ঃ॥
ক্রমেণ প্রেষয়িষ্যামি যোঽস্তি মে স্বপরিচ্ছদঃ।
তত্র সর্ব্বেষু যাতেষু ততো যাস্যামহং পুনঃ॥" (৫৩/৬১-৬৩)

—সম্যকরূপে বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে, এতে আমারই কার্যসিদ্ধি হচ্ছে। আমার পরিজনসমূহ গিয়ে কাশীতেই অবস্থান করুক। এতে সন্দেহ নেই যে মায়া এবং বীর্যপ্রধান প্রমথদের কাশীতে প্রবেশ, আমারই প্রবেশের সমতুল। যেখানে আমার যত আত্মীয় আছে, ক্রমে ক্রমে আমি তাদের সকলকেই সেখানে পাঠাব। তারা গেলে, পরে আমিও যাব।

এই স্থির করে এবার মহাদেব কুণ্ডোদর, ময়ূর, বাণ আর গোকর্ণ নামে আরও চারজন গণকে সেখানে পাঠালেন। তারা কাশীতে গিয়ে নানা মায়াজাল সৃষ্টি করে দিবোদাসের কোনরকম ভ্রান্তি উৎপাদনে সমর্থ না হয়ে কাশীতেই থেকে গেল এবং হরকোপানল থেকে রক্ষা পাবার আশায় নিশ্চিত হয়ে লোলার্কের কাছে কুণ্ডোদর তার পশ্চিমে অসির কাছে ময়ূর, তার পশ্চিমে বাণ আর অন্তর্গৃহের পশ্চিমে গোকর্ণ স্ব-স্বনামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে তার পূর্জাচনায় রত হয়ে গেল।

মহেশ্বর এবার তারক, তিলপর্ণ, স্থূলকর্ণ, দৃমিচণ্ড, প্রভাময়, সুকেশ, বিন্দ, ছাগ, কপর্দি, পিঙ্গলাক্ষ, বীরভদ্র, কিরাত, চতুর্মুখ, নিকুম্ভক, পঞ্চাক্ষ, ভারভূত, ত্র্যক্ষ, ক্ষেমক, লাঙ্গলি, বিরাধ, সুমুখ, আষাঢ়—গণদের ডেকে পৃথক-পৃথকভাবে কাশীতে নিজের কার্যসাধনের আদেশ দিলেন। অনুজ্ঞামাত্রই কুশলী গণেরা গেল কাশীতে। বহু রূপ ধারণ করে, বহু মায়া বিস্তার করেও একজন কাশীবাসীরও স্খলন ঘটাতে পারল না, তৈরী করতে পারল না প্রভুর অনুপ্রবেশের যোগ্য কোন ছিদ্রপথ। প্রভুর কার্যসাধনে বিফল হয়ে তারক মোক্ষ-জ্ঞানপ্রদ 'তারকেশ্বর' শিবলিঙ্গ, তিলপর্ণ তিলপ্রমাণ 'তিলপর্ণেশ্বর, স্থূলকর্ণ 'স্থূলকর্ণেশ্বর' তার পশ্চিমে দৃমিচণ্ড 'দৃমিচণ্ডেশ্বর', প্রভাময়

'প্রভাময়েশ্বর' হরিকেশ বনে সুকেশ 'সুকেশেশ্বর', ভীমচণ্ডীর কাছে বিন্দ 'বিন্দতীশ্বর' আর পিত্রীশ্বরের কাছে ছাগ 'ছাগেশ্বর' লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে কাশীতেই থেকে গেল।

গণশ্রেষ্ঠ কপর্দি পিত্রীশ লিঙ্গের উত্তরে কপর্দীশ শিবলিঙ্গ স্থাপন এবং চিত্ত-নির্মলকারী 'বিমলোদক' নামে এক কুণ্ড খনন করে সেখানেই থেকে গিয়েছিল।

হে মিত্রাবরুণতময় অগস্ত্য এ সম্বন্ধে ত্রেতাযুগের এক পাপ-বিমোচন কাহিনী শোন ঃ

এই কপর্দীশ লিঙ্গ কী পরিমান অশেষ মহিমায় মহিমান্বিত, সে বিষয়ে একটি পুরাকাহিনী আছে।

অগ্রহায়ণ মাস, হেমন্তকাল। পাশুপতশ্রেষ্ঠ মুনি বাল্মীকি একদিন মধ্যাহ্নে মহাতীর্থ বিমলোদক কুণ্ডে স্নান সেরে কপর্দীশ লিঙ্গের দক্ষিণে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার পর আপাদমস্তক ভস্মলেপন করে ষড়জ প্রভৃতি স্বরভেদ সমন্বিত গান আর সেই সঙ্গে মণ্ডলাকারে নৃত্যসহ লিঙ্গের অর্চনা শেষে উপবেশন করেছেন সরোবর তীরে। কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। দেখলেন মুনি, সামনে হঠাৎ এক বিকট দর্শন পিশাচ মূর্তি। শুকনো শাঁখের মত কপাল, পিঙ্গলবর্ণ নেত্র, বিস্তৃত নাসিকাদ্বয়, শুষ্ক ওষ্ঠ, প্রলম্বমান নিতম্বদয়, শুষ্ক মুস্ক, ক্ষুদ্র শিশ্ন। অস্থিচর্মসার কিন্তু রোমশবহুল। ভীষণদর্শন সেই পিশাচকে দেখে মুনিবর ভীত না হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি? কোথা থেকে আসছ? এ-দশাই বা তোমার কেন?

পিশাচ বললে, গোদাবরীর তীরে প্রতিষ্ঠান নগরের জনপদে পূর্বজন্মে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমার কাজ ছিল তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়ান আর প্রতিগ্রহ (দানগ্রহণ) করা। এতে আমার আসক্তিও ছিল প্রচুর। তীর্থে প্রতিগ্রহরূপ পাপকর্মের ফলে আমার এই গতি লাভ হয়েছে। এই অবস্থাতেই জলহীন, নিষ্পাদপ মরুদেশে শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে অনেক কাল কাটিয়েছি। আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারা, ঝটিকার তাণ্ডবতা।

এইভাবে বহুকাল অতিবাহিত হবার পর একদিন এক ব্রাহ্মণ তনয়কে দেখলাম। সেই ব্রাহ্মণ তনয়টি ছিল শৌচরহিত, সন্ধ্যাকর্ম বিবর্জিত, মুক্তকচ্ছ। আমি ভোগ বাসনায় তার শরীরে প্রবিষ্ট হলাম। সেই ব্রাহ্মণ তনয় অর্থলোভে কোন বণিকের সঙ্গে এই বারাণসী পুরীতে প্রবেশ করেছে। যে সময়ে সে এই অন্তঃপুরীতে প্রবেশ করল, তার সব পাপগুলোকে নিয়ে আমাকেও তার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে প্রমথগণের ভয়ে বারাণসীর এই প্রান্তসীমায় তার বহিরাগমণের প্রতীক্ষায় থাকতে হল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে আজও বিনিষ্ক্রান্ত হল না আর আমরাও তার আশা ত্যাগ করতে পারছি না।

আজ কিন্তু এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে গেল। প্রতিদিনই ক্ষুধায় কাতর হয়ে আমি প্রয়াগ পর্যন্ত ছুটোছুটি করি উদরপূর্তির আশায়। প্রতি দেশেই কানন আছে, আছে ফলভারবনত বৃক্ষ ; প্রতি ভূমিতেই জলপূর্ণ জলাশয় আছে। নানা প্রকার ভক্ষ্য, পেয় দ্রব্য এই স্থানেও আছে সুপ্রচুর। কিন্তু এমনি দুরদৃষ্ট, আমাদের নয়নগোচর হবামাত্রেই তারা দূরে সরে যায়। আজ হঠাৎ এক কার্পটিককে দেখতে পেলাম। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তাকেই জোর করে খাব এই ভেবে, তাকে যেমন ধরতে যাব, অমনি তার মুখ থেকে শিবনামময়ী বাণী নির্গত হল। শোনামাত্রই আমাদের পাপভার এতই লঘু হয়ে গেল যে, প্রথমগণের চোখে অদৃশ্য থেকেই আমরা বারাণসীপুরীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম। এবং তারই সঙ্গে এই অন্তর্গৃহের সীমায় আসতে পারলাম। কার্পটিক এখন অন্তঃপুরীর মধ্যে প্রবেশ করেছে, আমি বাইরে ভাগ্যবলে মুনিবর আপনার দর্শন পেলাম। দয়া করে আমাকে এই পিশাচযোনি থেকে মুক্ত করুন।

শুনে মুনিসত্তম বাল্মিকীর মনে অনুকম্পা জাগল। তিনি তাকে বিমলোদক তীর্থে স্নান করে কপর্দীশ লিঙ্গ দর্শন করতে বললেন।

পিশাচ বলল—হা মুনি! এই জলাশয় থেকে জলপান করাই আমাদের পক্ষে দুরূহ, স্নান তো দূরের কথা। জলদেবতারা আমাকে কাছেও ঘেঁষতে দেবে না। তখন বাল্মিকী মুনি তাকে ভস্ম দিয়ে

ললাটে বিভূতি ধারণ করতে বললেন—শিবমন্ত্রপূতঃ এই বিভূতি যাবতীয় অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে। তুমি এই বিভূতি ধারণ করলে যমকিঙ্কররাও দূরে পালাবে। এরপর নিজের ভস্মাধার থেকে বিভূতি নিয়ে পিশাচকে দিলেন। পিশাচ নির্দেশমত ললাটে বিভূতি ধারণ করে জলাশয়ে গিয়ে অবাধে পান, স্নান সারল। জলাশয় থেকে ওঠামাত্রই, ভীষণ ও কদর্যাকার দেহ তার, দিব্যকান্তি ধারণ করে স্বর্গে গমন করল।

পরমাশ্চর্যে বাল্মিকী মুনিও তা দেখলেন এবং বাকি জীবন কপর্দীশ লিঙ্গের অর্চনায় থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এই জন্যে এই তীর্থকে 'পিশাচমোচন' তীর্থও বলে।

এই কপর্দীশ্বরের উত্তরে পিঙ্গল 'পিঙ্গলেশ্বর'; বীরেশ্বর বীরসিদ্ধি-দাতা 'বীরভদ্রেশ্বর' কেদারেশ্বরের দক্ষিণে কিরাত 'কিরাতেশ্বর', বৃদ্ধকালেশ্বরের কাছে চতুর্মুখ 'চতুর্মুখেশ্বর' কুবেরেশ্বরের কাছে নিকুম্ভক 'নিকুম্ভকেশ্বর', বিশ্বনাথের দক্ষিণে জাতিস্মর শক্তিপ্রদাতা পঞ্চাখ্যের 'পঞ্চাক্ষেশ', অন্তর্গৃহের উত্তরে ভারভূত 'ভারভূতেশ্বর', ত্রিলোচনেশ্বরের পুরোভাগে ত্র্যক্ষ 'ত্র্যক্ষেশ্বর', 'ক্ষেমক' স্বয়ং মূর্তীধর হয়ে, লাঙ্গল 'লাঙ্গলীশ্বর', সুমুখ পশ্চিমমুখ 'সুমুখেশ্বর' মহালিঙ্গ আর আষাঢ় 'আষাঢ়ীশ্বর' শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে আজও সেখানে অবস্থিত।

স্কন্দ বললেন, অগস্ত্য, গণসমূহও আর ফিরল না দেখে একদিকে কাশীবিরহসন্তাপ যেমন মহেশের আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠল তেমনি আবার নিজের মূর্তন্তরদের সেখানে অবস্থান করার ফলে বারাণসী প্রবেশও যে তার পক্ষে আরও দুরূহ হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে অতঃপর গণেশকে ডেকে বললেন ঃ

> "প্রাহিণোৎ কথয়িত্বেতি গচ্ছ কাশীমিতঃ সুত॥
> তত্র স্থিতোঽপি সংসিদ্ধো যতস্ব সহিতো গণৈঃ।
> নির্বিঘ্নং কুরু চাস্মাকং নৃপে বিঘ্নং সমাচর॥" (৫৫/৫৯-৬০)

—হে পুত্র! তুমি কাশীতে যাও। সেখানে আর গণসমূহের সঙ্গে থেকে রাজার বিঘ্ন আচরণ করে নির্বিঘ্নে আমার কার্যসিদ্ধির জন্য যত্ন নাও।

[অধ্যায় ৫৬—৫৮]

গণপতি গণেশ মহাদেবের আদেশে অতঃপর দ্রুতগামী যানে আরোহণ করে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে প্রবিষ্ট হলেন বারাণসীপুরীতে। সেখানে তিনি পরিচিত হলেন গুণবৃদ্ধ নামে গণকরূপে।

বিঘ্নহর কিভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যায়, তার উপায় চিন্তা করে বৃদ্ধ গণকের বেশে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে মানুষের ভাগ্যগণনা করে প্রথমে বিশ্বাস উৎপাদন করলেন। তারপর দিবোদাসের আগে বারাণসীতে যেখানে মহাদেবসুত গণপতির আবাস ছিল, সেইখানে ব্রাহ্মণবেশী গণপতি আপন আবাসে থেকে রাতে পুরজনদের স্বপ্ন দেখিয়ে সকালে গিয়ে তার ব্যাখ্যা আর গ্রহসঞ্চারজনিত ফলাফল বলতে সুরু করলেন।

কাউকে ডেকে বললেন, গতকাল রাত শেষে তুমি স্বপ্ন দেখেছ যে, তুমি একটা বিশাল গভীর হ্রদে হঠাৎ পড়ে গিয়ে ডুবে মরার ভয়ে তীরে এসে পিছলে গেলে, আবার যেখানে এসে উঠলে সেখানে এত কাদা যে কিছুতেই উঠে আসতে পারছ না। এটা বড়ই দুঃস্বপ্ন। সামনে তোমার কোন বিপদ আসছে। অন্য কাউকে ডেকে বললেন, রাতে তুমি স্বপ্নে মুণ্ডিত-মস্তক কাষায়-বসনধারী কোন পুরুষকে দেখেছ। এ দর্শন শুভ নয়। আবার অন্য কাউকে ডেকে বললেন, তুকি কাল স্বপ্নে সূর্যগ্রহণ দেখেছ, তারপর দেখেছ দুই ইন্দ্রধনু। তাই না? তোমার পক্ষে এই দর্শন খুবই ক্ষতিকর। আরও যাদের যাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তাদের এক-একজনকে ডেকে বলতে লাগলেন—তুমি তো স্বপ্ন দেখেছ পশ্চিমদিকে সূর্য উঠে নতুন চাঁদকে আকাশ থেকে টেনে মাটিতে ফেলে দিল। তোমার এই স্বপ্ন রাজ্যের পক্ষে ভীতি-সূচক। অপরজনকে ডেকে বললেন—তুমি স্বপ্ন দেখেছ, দুই কেতু পরস্পর ভীষণ যুদ্ধ করছে। এর অর্থ রাজ্যে ভাঙন অবশ্যম্ভাবী।

ওহে! তুমি তো স্বপ্নে দেখেছ যে হরিণ-দম্পতি রাতে নগরের চারদিকে কেঁদে বেড়াচ্ছে। ফল এর খুবই খারাপ। একমাসের মধ্যে তোমাদের এই রাজ্য পরিত্যাগ করতে হবে।

এইভাবে স্বপ্নদ্রষ্টা প্রতিজনকে ডেকে ডেকে যখন তাদের দেখা স্বপ্নবৃত্তান্ত বলতে লাগলেন, তারা সকলেই বিস্মিত হতে লাগল আর সর্বজ্ঞ ভেবে তাঁর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করতে সুরু করল।

নগরমধ্যে উপবেশন করে কাউকে ডেকে গ্রহসঞ্চার দেখাতে দেখাতে বললেন—ঐ যে দেখছ, একই রাশিতে সূর্য, শুক্র আর মঙ্গলের অবস্থান। এটা তোমার ক্ষেত্রে ভাল নয়। আবার কাউকে ডেকে দেখালেন—ঐ যে দেখছ ধূমকেতু সপ্তর্ষিমণ্ডল ভেদ করে পশ্চিম-দিকে প্রস্থান করছে, জানবে রাজ্য-বিনাশের লক্ষণ। দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে বেশ কিছু পুরবাসী এমনি ভীত হয়ে পড়ল যে তারা কাশী ছেড়ে পালাতে সুরু করল।

জনারণ্যে এইভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দ্বিজরূপী গণেশ এইবার মায়াবলে ঢুকলেন নৃপতির অন্তঃপুরে। তাদের দিকে এক পলক তাকিয়েই তাদের সম্বন্ধে এমন সব কথা বলতে সুরু করলেন, যে মুহূর্তমধ্যে বিশ্বাস এবং আস্থা অর্জন করে ফেললেন। কোন রমণীকে দেখা মাত্রই বললেন—তোমার তো তিরানব্বইটি পুত্র। তাদের মধ্যে একজন আজ ঘোড়ায় চেপে আসতে গিয়ে বাইরে সেতু থেকে পড়ে মারা গেল। কাউকে দেখেই বললেন—এই কন্যা তো গর্ভবতী। একটি মেয়ে হবে। আগে এই কন্যার ভাগ্য ভাল ছিল না, এখন ভাল হয়েছে। আবার হয়ত বিশেষ কোন এক রাজ্ঞীকে দেখেই বলে বসলেন—ইনিই এখন পাটরাণী। রাজা নিজের গলার মুক্তামালা এঁকে দিয়েছেন। আর বড় জোর পাঁচ-সাতদিন হল, রাজা এঁকে দুখানা গ্রাম দেবার আদেশ দিয়েছেন।

কোনটাই মিথ্যা নয়। ফলে তারা এমন গুণগ্রাহী হয়ে পড়ল যে মহারাজকে অসঙ্কোচে সেই গণকের অসীম শক্তির কথা বিনা-দ্বিধায় বলতে শুরু করল।

অবসর বুঝে একদিন মহিষী লীলাবতী ব্রাহ্মণ গুণবৃদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রাজা দিবোদাসকে বললেন—সর্বশাস্ত্রবিদ্ গণকশ্রেষ্ঠ এই গুণবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজারও পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রাজ্ঞীর ইচ্ছানুযায়ী রাজাও তাঁকে একদিন অন্তঃপুরে আনার আদেশ দিলেন। রাজ্ঞীও তৎক্ষণাৎ তাঁর দাসী বিচক্ষণাকে ডেকে ব্রাহ্মণকে অন্তঃপুরে আনালেন।

আগতপ্রায় ব্রাহ্মণরূপী গণপতিকে দূর থেকে দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন রাজা দিবোদাস। দেখলেন, যেন জাজ্বল্যমান স্বয়ং ব্রহ্মতেজ। যথারীতি অভিবাদন, আশীর্বাদ গ্রহণ এবং কুশলাদি বিনিময় শেষে সসম্মানে ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন সেদিন।

পরদিন রাত্রি প্রভাত হতেই ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে ভেট পাঠিয়ে তাঁকে নিজ গৃহে আনালেন। পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে তাঁর সৎকার শেষে নিভৃতে রাজা দিবোদাস নিজের বর্তমান মানসিকতা নিয়ে আলোচনা শেষে ব্রাহ্মণের পরামর্শ চাইতে বসলেন।

দিবোদাস বললেন, এতাবৎকাল সর্বরকম প্রযত্নেই রাজ্যপালন করে আসছি। আমি নিজ মুখে আমার কীর্তির কথা প্রকাশ করতে চাই না। কিন্তু ঃ

"নির্ব্বিস্মমিব মে চেতঃ সাম্প্রতং সর্বকর্ম্মসু।
বিচার্য্যার্য্য শুভোদর্কমত আখ্যাহি সত্তম॥" (৫৬/৬২)

—হে মহাপ্রাজ্ঞ! কিছুদিন হতে আমার মন সবরকম কাজেই বিরক্তভাব ধারণ করছে। হে আর্য! ভবিষ্যতে কিসে আমার মঙ্গল হবে, তা বিবেচনা করে বলুন।

ব্রাহ্মণরূপী গণপতি শুনে বললেন—হে দিবোদাস! আপনি কে, কী এবং কতখানি শক্তিধর তা আমি জানি। ভবিষ্যতে আপনার কিসে শুভ হবে, তাও আমি জানি। তবে আমি নিজমুখে তা আপনাকে বলব না।

"আরভ্যাদ্যদিনাদ্ভূপ ব্রাহ্মণোহষ্টাদশেহহনি।
উদীচ্যঃ কশ্চিদাগত্য ধ্রুবং ত্বামুপদেক্ষ্যতি॥

তস্য বাক্যং ত্বয়া রাজন্ কর্তব্যমবিচারিতম্।

ততস্তে হৃৎস্থিতিং সর্ব্বং সেৎস্যত্যেব মহামতে॥" (৫৬/৭৬-৭৭)

—হে ভূপ! আজ থেকে আগামী অষ্টাদশ দিবসে উত্তরদেশ থেকে কোন ব্রাহ্মণ এসে আপনাকে তত্ত্ব উপদেশ করবেন। সেই ব্রাহ্মণ আপনাকে যা উপদেশ করবেন নির্বিচারে তা প্রতিপালন করবেন, তাহলেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে সন্দেহ নেই।

এই বলে জ্ঞানবৃদ্ধ নিজের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। আর দিবোদাসও প্রতীক্ষান্তে অষ্টাদশ দিবসে ব্রাহ্মণের দর্শন এবং উপদেশ গ্রহণ করে কাশী পরিত্যাগ এবং কাশীতে মহাদেবের প্রত্যাগমনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।

মহাদেব সপরিবারে মন্দর-পর্বত থেকে কাশীতে এসেই সর্বপ্রথম গণপতিকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তবে তুষ্ট করেছিলেন।

কাশীতে এই গণনায়ক কোন কোন নামে কীভাবে ক্ষেত্র রক্ষা করছেন, অগস্ত্য তা জানতে চাইলে স্কন্দদেব বললেন: কাশী ক্ষেত্রের প্রথম আবরণ রক্ষার জন্য ঢুণ্ঢিরাজ যে যে স্থানে অবস্থান করেছেন, আগে তা বলি শোন। গঙ্গা ও অসিসঙ্গমের কাছে 'অর্কবিনায়ক', দক্ষিণে 'দুর্গ', ক্ষেত্রের নৈঋর্তে ভীমচণ্ডীর কাছে 'ভীমচণ্ড বিনায়ক', পশ্চিমে 'দেহলি বিনায়ক', বায়ুদিকে 'উদ্দণ্ডাখ্য'। কাশীর উত্তরে গণপতি 'পাশুপাণি', গঙ্গা-বরণার সঙ্গমস্থলে 'খর্ববিনায়ক' আর পূর্বে যমতীর্থের পশ্চিমে 'সিদ্ধিবিনায়ক' অবস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় আবরণে অর্কবিনায়কের উত্তরে গণপতি 'লম্বোদর', দুর্গবিনায়কের উত্তরে গণাধিপ 'কূটদন্ত', ভীমচণ্ড-বিনায়কের ঈশানকোণে গণপতি 'শালকটঙ্কট', দেহলি বিনায়কের পূর্বে 'কুষ্মাণ্ডাখ্য', উদ্দণ্ডাখ্যের অগ্নিকোণে পাতালব্যাপী 'মুণ্ডবিনায়ক', পাশপাণির দক্ষিণে 'বিকটদ্বিজ', খর্বাখ্য বিনায়কের নৈঋর্তে 'রাজপুত্র' এবং রাজপুত্রের দক্ষিণে গণপতি 'প্রণব'। বারাণসীর দ্বিতীয় আবরণে এই আটটি বিনায়ক কাশীবাসিগণের বিঘ্নরাশি অপহরণ করে থাকেন।

তৃতীয় আবরণে লম্বোদরের উত্তরে গণপতি 'বক্রতুণ্ড', কূটদন্তকের উত্তরে গণপতি 'একদন্তক', শালকটঙ্কের ঈশানে গণপতি 'ত্রিমুখ'—মুখ তার বানর, সিংহ আর হাতীর মত, কুষ্মাণ্ডের উত্তরে সিংহযোজিত রথে 'পঞ্চাস্য,' মুণ্ডবিনায়কের অগ্নিকোণে কাশীর জননীস্বরূপা 'হেরম্ব', বিকটদন্তের দক্ষিণে গণপতি 'বিঘ্নরাজ', রাজপুত্রের নৈঋ্‌র্তে গণপতি 'বরদ' আর প্রণব-বিনায়কের দক্ষিণে গণপতি 'মোদকপ্রিয়' অবস্থিত।

বারাণসীর চতুর্থ আবরণে রয়েছেন আরও আটজন বিনায়ক।

বক্রতুণ্ড গণপতির উওরে গঙ্গার পশ্চিমে বিনায়ক 'অভয়দ', একদশন বিনায়কের উত্তরে গণপতি 'সিংহতুণ্ড', ত্রিতুণ্ড বিনায়কের ঈশানে 'কূণিতাক্ষ', পঞ্চাস্য বিনায়কের পূর্বে 'ক্ষিপ্রপ্রসাদন', হেরম্ব বিনায়কের বহ্নিকোণে 'চিন্তামনি বিনায়ক', বিনায়ক বিঘ্নরাজের দক্ষিণে 'দন্তহস্ত', গণেশ বরদ-র নৈঋ্‌র্তে 'পিচিণ্ডিল', আর পিলপিলা তীর্থে বিনায়ক মোদকপ্রিয়র দক্ষিণে অবস্থান করছেন গণপতি 'উদ্দণ্ডমুণ্ড'।

বারাণসীর পঞ্চম আবরণেও রয়েছেন আটজন বিনায়ক।

বিনায়ক অভয়প্রদর উত্তরে গণপতি 'স্থূলদন্ত', সিংহতুণ্ডের উত্তরে 'কলিপ্রিয়', কূণিতাক্ষের ঈশানে 'চতুর্দন্ত', আর গণনায়ক 'দ্বিতুণ্ড', চিন্তামনি-বিনায়কের অগ্নিকোণে গণাধ্যক্ষ 'জ্যেষ্ঠ', দন্তহস্তের দক্ষিণে 'গজবিনায়ক', পিচিণ্ডিল গণপতির দক্ষিণে 'কালবিনায়ক', আর উদ্দণ্ডমুণ্ড-র দক্ষিণে নাগলোক প্রাপ্তির সহায়ক বিনায়ক 'নাগেশ' অবস্থিত।

এবার ষষ্ঠ-আবরণের বিঘ্ন-বিনায়কগণ হলেনঃ পূর্বে গণপতি 'মণিকর্ণ', বহ্নিকোণে 'আশা বিনায়ক', দক্ষিণে সৃষ্টি-সংহারক রূপে 'সৃষ্টিগণেশ', নৈঋ্‌র্তে 'যজ্ঞবিঘ্নেশ', পশ্চিমে 'গজকর্ণ', বায়ুকোণে 'চিত্রঘণ্ট' উত্তরে 'স্থূলজঙ্ঘ', ঈশানে 'মঙ্গলবিনায়ক' আর যমতীর্থের উত্তরে 'মিত্রবিনায়ক'।

আর সপ্তম আবরণে মোদ প্রভৃতি পাঁচটি গণপতি, ষষ্ঠ জ্ঞানবিনায়ক, সপ্তম দ্বারবিঘ্নেশ—এঁরা মহাদ্বারের পুরোভাগে পরিভ্রমণ করে থাকেন। আর অষ্টম আবরণে সর্বব্যাপি 'অবিমুক্ত-

বিনায়ক'।

এইভাবে বিঘ্নরাজ গণপতি মূলত পঁয়ষট্টি মূর্তি পরিগ্রহ করে ভক্তের কামনা পূরণ করে কাশীতে অবস্থান করছেন।

এদিকে কাশী হতে গণেশের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হচ্ছে দেখে মন্দর পর্বতে মহাদেব বিষ্ণুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁকেই অনুরোধ জানালেন কাশী যেতে। সেই সঙ্গে বললেন,—হে বিষ্ণু! 'তথা ত্বমপি মাকার্ষীর্যথা প্রাকপ্রস্থিতৈঃ কৃতম্'—দেখো, আগে-আগে যারা গিয়ে যে আচরণ করেছে, তুমিও যেন সেরকম কোরো না।

শুনে সসম্ভ্রমে বিষ্ণু বললেন :

"শম্ভুনা প্রেষিতেনাদ্য সুদ্যমঃ ক্রিয়তে ময়া।
তদ্ভক্তিসম্পত্তিমতাং সম্পন্ন প্রায় এব নঃ॥" (৫৮/১০)

—হে ভগবন্। আপনি আমায় পাঠাচ্ছেন। আপনার প্রেরণা বলে আজ থেকেই আমি সবিশেষ উদ্যমশীল হব। আপনার প্রতি ভক্তিই আমার পরম সম্বল। সুতরাং জানবেন, তারই প্রভাবে সিদ্ধি লব্ধপ্রায়।

"অতীব যদসাধ্যং স্যাৎ সুবুদ্ধিবলপৌরুষৈঃ।
তৎকার্য্যং হি সুসিদ্ধং স্যাত্ত্বদনুধ্যানতঃ শিব॥" (৫৮/১১)

—বুদ্ধি এবং পৌরুষবলেও, হে শিব! যদি তা নিতান্ত অসাধ্য হয়; আপনার অনুধ্যানে, স্মরণে-মননে তা অবশ্যই সিদ্ধ হবে।

বিষ্ণু এইভাবে মহাদেবকে আশ্বাস দিয়ে লক্ষ্মী-সহ তাঁকে প্রদক্ষিণ ও বারবার প্রণাম করে মন্দর পর্বত থেকে এলেন বারাণসীতে। এখানে এসেই তিনি কাশীর উত্তরে গরুড় বাহন থেকে অবতরণ করে গঙ্গা এবং বরণার সঙ্গমস্থলে স্বচ্ছ সলিলে পাদ-প্রক্ষালন, স্নানাদি সারলেন। সেই থেকে এই স্থানটি সর্বপাপ-তাপহর 'পাদোদক' তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

লক্ষ্মী ও গরুড়ের সঙ্গে ভগবান গরুড়ধ্বজ সেই তীর্থে নিত্যক্রিয়া সমাপন করে নিজের সর্বব্যাপিনী মূর্তি সংহার করে এবং প্রস্তরময়

আদিকেশব নাম্নী ভাগবতী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সর্বপ্রথমে নিজে তার পূজা করলেন।

তীর্থ-সমৃদ্ধ এই কাশী ক্ষেত্রের প্রসঙ্গত কয়েকটি তীর্থের নাম শোন, অগস্ত্য। ষড়ানন বললেন ঃ ক্ষীরারি, শঙ্খ, গদা, পদ্ম, মহালক্ষ্মী, গরুড়, নারদ, প্রহ্লাদ, আম্বরীষ, দত্তাত্রেয়েশ্বর, ভার্গব, বামন, যজ্ঞবারাহ, বিদারনারসিংহ, শেষতীর্থ, শঙ্খমাধব আর হয়গ্রীব তীর্থ—প্রতিটি তীর্থই স্ব-স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

এখন শঙ্খ-চক্র গদাধর বৈকুণ্ঠনাথ কাশীতে স্বীয় কৈশবী মূর্তিমধ্যে সমাবিষ্ট হয়ে, মহেশ্বরের কার্যসাধনের জন্য অংশাংশেরও অংশ হয়ে সেখান থেকে বের হলেন। কারণ, কাশীর মাহাত্ম্য যার জ্ঞাত, তিনি কখনই পুরোপুরি কাশী থেকে নির্গত হবেন না। তাই কেশব স্বীয় প্রতিকৃতির মধ্যে নিজের অস্তিত্বের বেশীর ভাগটা রেখে স্বল্লাংশ নিয়েই বাইরে বের হলেন।

কাশীর কিছু উত্তরে গিয়ে নারায়ণ অতঃপর নিজের অবস্থিতির জন্য ধর্মক্ষেত্র নামে একটা মনোরম স্থান নির্মাণ করলেন। নিজে ধারণ করলেন সৌম্যদর্শন সৌগত-রূপ, লক্ষ্মী গ্রহণ করলেন অপরূপ সৌন্দর্যসম্পন্না পরিব্রাজিকা। পুস্তকে ন্যস্ত-হস্তা, জগজ্জননী লক্ষ্মী দেবীর পশ্চাতে বিনয়কীর্তি—নরদেহধারী শিষ্যরূপী গরুড়। তারও হাতে পুস্তক। সৌগত পুণ্যকীর্তি, (ছদ্মবেশী নারায়ণ) স্বভাব-মাধুর্য্য নিয়ে পরিব্রাজিকা এবং শিষ্য-সহ বেড়িয়েছেন নগর ভ্রমণে। পথিমধ্যেই চলেছেন তাঁরা ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে। যে শোনে সে-ই তাঁর বচন মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে অনুগামী হয় তাঁর। সৌগত তাঁর শিষ্যকে উদ্দেশ্য করে বলে চলেন—এই সংসার অনাদি। এর কোন কর্তা নেই। আপনা হতেই এ প্রাদুর্ভূত হয়েছে, আপনা হতেই এ বিলীন হয়ে যাবে। আত্মাই এক এবং অদ্বিতীয়। তিনিই ঈশ্বর। তিনিই দেহকে আশ্রয় করে বিভিন্ন নাম সংজ্ঞায় এই পৃথিবীতে বিরাজ করছেন। আমি যেমন পুণ্যকীর্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র-ও তেমনি দেহ-পরিগৃহীত আত্মার এক-একটি সংজ্ঞা। আমাদের যেমন মৃত্যু-

আছে, তেমনি ব্রহ্মা থেকে কীট পর্যন্ত সকল দেহধারীরই মৃত্যু আছে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন সকলের মধ্যে সমানভাবেই বিদ্যমান। স্থিরচিত্তে ভেবে দেখলে, সব প্রাণীই সমান। সুতরাং কারো প্রতি যেমন হিংসা করা উচিত নয়, তেমনি সকলের প্রতি দয়া করা উচিত, দান করা উচিত। নানা শাস্ত্র বিচার করে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ ইহকাল ও পরকালের কল্যাণবিধায়ক চার রকম দানের কথা বলেছেন ঃ

"ভীতেভ্যশ্চাভয়ং দেয়ং ব্যাধিতেভ্যস্তথৌষধম্।

দেয়া বিদ্যার্থীনাং বিদ্যা দেয়মন্নং ক্ষুধাতুরে॥" (৫৮/১০১)

—ভীত ব্যক্তিকে অভয়, পীড়িতকে ঔষধ, বিদ্যার্থীকে বিদ্যা আর ক্ষুধাতুরকে অন্ন দান। এগুলির মধ্যে আবার অভয় দানই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অতুলনীয়।

বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে দ্বাদশ ইন্দ্রিয়—পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। প্রভূত অর্থ উপার্জন করে এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ের নিরন্তর পূজা করা উচিত। ইন্দ্রাদি দেবের উপাসনা করে কোন ফল নেই।

স্বর্গ আর নরক বলে অন্য কোন অস্তিত্ব নেই। স্বর্গ হল সুখ আর, দুঃখ হল নরক। সুখভোগ করতে করতে দেহবিসর্জনের নামই মোক্ষ। এছাড়া অন্য কোন প্রকারে মোক্ষ লাভ হয় না। যারা স্বর্গ-লাভের আশায় বৃক্ষচ্ছেদ করে, পশুহত্যা করে মাটি রুধিরাক্ত করে, অনলে ঘি আর তিল পোড়ায় তাদের দেখে আমার অবাক লাগে।

পরম্পরায় এই ধর্মকথায় আকৃষ্ট হয়ে উঠল পুরবাসিগণ, পুর-স্ত্রীগণও সমাকৃষ্টা হল। তারাও বিজ্ঞানকৌমুদী সৌগতের কাছে সমাগতা হতে সুরু করল।

তাদের উদ্দেশ্যে সৌগত বলতে লাগলেন—শ্রুতিতে বলেছে, আনন্দই ব্রহ্মের রূপ। যথার্থ কথা। যে পর্যন্ত শরীর নিরুদ্বিগ্ন থাকে, যে পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সমূহ বিকল না হয়ে যায়, যে পর্যন্ত জরা গ্রাস না করে, সে পর্যন্ত প্রত্যেকেরই সুখ ও আনন্দলাভের চেষ্টা করা উচিত।

"সত্বরো গত্বরো দেহঃ সক্ষয়াঃ সপরিক্ষয়াঃ।

ইতি বিজ্ঞায় বিজ্ঞাতা দেহে সৌখ্যং প্রসাধয়েৎ॥" (৫৮/১১৮)

—এই দেহ অল্পদিনেই বিনষ্ট হয়ে যাবে, সঞ্চিত অর্থও ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। এই সমস্ত বিবেচনা করে বিবেচক পুরুষ দেহে সুখসাধন করবে।

অন্তিমে তো এই দেহ কৃমি, কীট, কাকের ভোজ্য হবে নতুবা ভস্মে পরিণত হবে।

তাছাড়া, সকলেই যখন মানুষ, তখনই কেনই বা অধম-উত্তমের বিচার আর কেনই বা জাতিভেদের কল্পনা!

"মুখবাহূরুপজ্জাতং চাতুর্বর্ণ্যমিহোদিতম্।
কল্পনেয়ং কৃতা পূর্বৈর্ন ঘটেত বিচারতঃ॥
একস্যাশ্চ তনৌ জাতা একস্মাদ্ যদি বা ক্বচিৎ।
চত্বারস্তনয়াস্তং কিং ভিন্নবর্ণত্বমাপ্নুয়ুঃ॥
বর্ণাবর্ণবিবেকোঽয়ং তস্মান্ন প্রতিভাসতে।
অতো ভেদো ন মন্তব্যো মনুষ্যে কেনচিৎ ক্বচিৎ॥" (৫৮/১২৪-১৬)

—পূর্বে কল্পনা করা হয়েছে যে চাতুর্বর্ণ যথাক্রমে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হতে উৎপন্ন হয়েছে। বিচার করে দেখলে, কেমন-ভাবে তা সম্ভব হতে পারে? কারণ, এক ব্যক্তির একই শরীর থেকে যদি সকলেই উৎপন্ন হয়ে থাকে, তবে তাদের মধ্যে পরস্পর কেন জাতিভেদ থাকবে। অতএব বর্ণাবর্ণের বিচার কখনই যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং সকল মানুষকেই তুল্যজ্ঞান করবে, ইতর-বিশেষ জ্ঞান করবে না।

এই সকল উপদেশ শুনে প্রত্যেকেই ধর্মবিষয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল। রাজকুমার থেকে সুরু করে পুরবাসীসহ অন্তঃপুরচারিনীরাও আর নতুন কিছু ভাবতে পারল না। পরিব্রাজিকা লক্ষ্মীও নারীভেদে অনেক ওলট-পালট করে দিলেন। অনেক নারী সৌগতের শিষ্যত্বও গ্রহণ করল। পতিশুশ্রূষার মত পরম ধর্মও তারা ভুলে গেল। এদিকে পুরুষেরাও নানারকম আকর্ষণী, বশীকরণ বিদ্যা শিখে পরস্ত্রীতে প্রয়োগ করে অনাচারে মত্ত হয়ে উঠল। এইভাবে ধর্ম যখন পরাঙ্মুখ হল, অধর্মের প্রাবল্য দেখা দিল অবশ্যম্ভাবীরূপে। ক্রমে ক্রমে রাজা দিবোদাসেরও সামর্থ্য লোপ পেতে সুরু করল। তার ওপর আবার

ঢুণ্ঢিরাজ গণেশ দূর থেকে দিবোদাসের চিত্তকে রাজ্যব্যাপারে ক্রমশঃই এমন বিরক্ত করে তুলতে লাগলেন, যে অষ্টাদশ দিবসটির জন্যে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন।

অধীর অপেক্ষার শেষে একদিন উপস্থিত হল অষ্টাদশ দিবস। সূর্য তখন মধ্যগগনে। রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন দু-তিনটি পবিত্রাত্মার সঙ্গে এক তেজপুঞ্জদেহী ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুই সেই ব্রাহ্মণের বেশ ধরে গিয়েছিলেন রাজসমীপে। তাঁকে দর্শনমাত্রেই রাজা দিবোদাস স্থির প্রত্যয় হলেন, এই সেই প্রত্যাশিত ব্রাহ্মণ। রাজা তাঁকে যথাবিধি সৎকার করে সুখাসনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

"খিন্নোঽস্মি বিপ্রবর্য্যাহং রাজ্যভারং সমুদ্বহন্।

খেদো নাস্ত্যেব হি পরং বৈরাগ্যমিব জায়তে॥

কিং করোমি ক্ক গচ্ছামি কথং মে নির্বৃতিভবেৎ॥" (৫৮/১৪৪-৪৫)

—হে বিপ্র! আমি রাজ্যভার বহন করে এখন বিষাদগ্রস্ত হয়েছি। কেবল বিষাদগ্রস্ত নয়, সব বিষয়েই আমার বৈরাগ্য আসছে। আপনি বলুন, আমি কি করব, কোথায় যাব, কিভাবেই বা নির্বৃতি লাভ করব।

যদিও আমার রাজ্যশাসন এবং পালনে কোথাও কোন ত্রুটি নেই। আমি স্বার্থহীন চিত্ত নিয়েই প্রজাসাধারণের জন্যে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছি তবুও, আমার বিশ্বাস, আমার এই বিষাদের কারণ, দেবতাদের সঙ্গে অসহযোগিতা। আমি জানি, দেবতাদের সঙ্গে বিরোধ করে কেউই বেঁচে থাকতে পারেনি, শান্তি পায়নি। ত্রিপুর, বলি সকলকেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। মহাদেবভক্ত বানাসুরের সহস্র-বাহু বিষ্ণু ছেদন করেছিলেন কেবলমাত্র তার দেব-বিদ্বেষের কারণে। অনেকেই বহুতর যজ্ঞ করে ইন্দ্রত্ব লাভ করে তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা করেছেন। আমার এসবের কোন প্রয়োজনও হয়নি। তাই দেবতারা যে আমার কোন অনিষ্ট সাধন করবেন, সে বিশ্বাসও আমি করি না। তবুও, এসব আর ভাল লাগছে না। আমি আপনাকে গুরুপদে বরণ করলাম। আপনি উপদেশ করুন—কি করলে আমাকে আর গর্ভবাস যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়।

দিবোদাসের আকুতি শুনে অন্তর্যামী ব্রাহ্মণবেশী জনার্দনের বুঝতে অসুবিধা হল না যে এসবই কৃতবিদ্য গণেশের আবেশ।

ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণু তখন উপদেশছলে দিবোদাসকে বললেন: তুমি রাজা হলেও জ্ঞানী, তপস্বী—তুমি রাজর্ষি। তোমার মত রাজা এই পৃথিবীতে কখনো আসে নি, আসবেও না। দেবগণের সঙ্গে বিরোধ করে তুমি তাঁদের কোন অপকারই করনি। তবুও তুমি বিষাদগ্রস্ত এবং মোক্ষার্থী। কারণ আমার মনে হয়—

"এক এব হি তে দোষো হৃদি মে প্রতিভাসতে।

কাশ্যা বিশ্বেশ্বরো দূরং যৎ কৃতো ভবতা কিল॥" (৫৮/১৭৮)

—হে নৃপ! তুমি কাশী থেকে বিশ্বনাথকে যে বহিষ্কৃত করেছ, আমার বিশ্বাস এটাই তোমার একমাত্র অপরাধ।

সেই অপরাধ-বোধজনিত মহাপাপ ক্রমশঃ তোমাকে গ্রাস করছে। এর থেকে মুক্তি পাবার একটাই মাত্র উপায়। তুমি সর্বপ্রযত্নে এখানে একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে তার অর্চনা কর। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তোমার মত পূতাত্মাকে মহাদেবও প্রতিনিয়ত স্মরণ করে চলেছেন। দেখবে, লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠার পর আজ থেকে সপ্তম দিবসে দিব্য শাম্ভব বিমান এসে তোমাকে তোমার সশরীরেই নিয়ে যাবে।

এই বলে ব্রাহ্মণ জনার্দন রাজসভা থেকে নির্গত হয়ে স্বর্গাদপি গরিয়সী কাশীকে দেখে মনস্থ করলেন সেখানেই থেকে যাবেন। কাছেই পঞ্চনদ হ্রদ দেখে, সেখানে স্নান সেরে অবস্থান করলেন আর সবকিছু সংবাদ দিয়ে গরুড়কে পাঠিয়ে দিলেন মহাদেবের কাছে মন্দর পর্বতে।

এদিকে ব্রাহ্মণের উপদেশে প্রসন্নাত্মা দিবোদাসও রাজকুমার সমরঞ্জয়কে রাজভবনে অভিষেক করে গঙ্গার পশ্চিমে এক প্রাসাদ নির্মাণ করালেন। তার নাম হল 'ভূপালশ্রী' আর সেখানেই রাজা রিপুঞ্জয় 'দিবোদাসেশ্বর' লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে নিজের অশান্ত চিত্তকে শান্ত করলেন।

একদিন দিবোদাস সবেমাত্র লিঙ্গের পূজা শেষে স্তবপাঠ সমাপ্ত করেছেন, গগণাঙ্গন থেকে বেগে নেমে এল এক দিব্য যান। ললাটস্থ

নেত্রজ্যোতি, সর্প-বিভূষিত অঙ্গ, শত-শত রুদ্র-কন্যার চামর-ব্যজন-সহ সেই যান সেখানে অবতরণ করতেই শিব-পার্ষদরা এসে দিব্য মাল্য, গন্ধ, অলঙ্কারে ভূষিত করলেন তাঁকে। নৃপতির কপাল তৃতীয় লোচনের দ্বারা বিভূষিত হল। তিনি ভুজচতুষ্টয়-সমাযুক্ত এবং সর্পনিচয়ের দ্বারা অলঙ্কৃত; জটাজুট-সমন্বিত হয়ে সেই যানে আরোহণ করে সশরীরেই স্বর্গে গমন করলেন।

কাশী এইভাবে দিবোদাসমুক্ত হলে বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরী উমাকে সঙ্গে নিয়ে নন্দী, ভৃঙ্গীকে আগে রেখে মন্দর পর্বত পরিত্যাগ করে কাশীর উদ্দেশ্যে পুনরায় গমন করলেন। মহাশাখ, বিশাখ, একাদশ রুদ্র, নৈগমেয় আর দেবর্ষিরা তাঁর অনুগামী হলেন। সনকাদি ঋষিরা স্তব করতে লাগলেন। বিষ্ণু, মহালক্ষ্মী, ব্রহ্মা, বিশ্বকর্মা, গণেশ্বর তাঁর আগমনে মহোৎসব করতে লাগলেন।

বারাণসী পুরীতে প্রবিষ্ট হয়ে বৃষবাহন মহাদেব বৃষ হতে অবতরণ করে দেবগণের সামনেই গণেশকে আলিঙ্গন করে বললেন:

"যদহং প্রাপ্তবানস্মি পুরাং বারাণসীং শুভাম্।
ময়াপ্যতীব দুষ্প্রাপ্যং স প্রসাদোঽস্য বৈ শিশোঃ॥
যদ্দুষ্প্রসাধ্যং হি পিতুরপি ত্রিজগতীতলে।
তৎ সূনুনা সুসাধ্যং স্যাদত্র দৃষ্টান্ততা ময়ি॥" (৫৭/১২-১৩)

—যে বারাণসী আমার অতীব দুষ্প্রাপ্য ছিল, সেই বারাণসীকে আমি যে পুনরায় পেলাম, তা এই বালকের জন্যে। ত্রিজগতে যে কাজ পিতার অসাধ্য, পুত্র যে তা অনায়াসে সিদ্ধ করতে পারে এটিই তার একমাত্র প্রমাণ।

দেবদেবের মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় তাই তিনি প্রথমেই গজাননের স্তব করেছিলেন কাশীতে অবতরণ করেই।

তবে যে কাশীতে দেবদেব এলেন, এটি দিবোদাসভুক্ত কাশী নয়। দিবোদাস বহিষ্কৃত হলে বিশ্বকর্মা এসে এই কাশীকে আবার নতুনভাবে স্থাপন করেছিলেন।

[অধ্যায় ৫৯—৬২]

মিত্রাবরুণ-তনয় অগস্ত্য অতঃপর দেব ষড়াননকে জিজ্ঞেস করলেন—বিশ্বাত্মা ভগবান বিষ্ণু, যিনি লীলাচ্ছলে সমস্ত জগতের কর্তা, পাতা, হর্তা, কেন তিনি নিজের স্বরূপ সংবরণ করে পঞ্চনদতীর্থে থেকে গেলেন ?

ষড়ানন বললেন, দেবাদিদেব মহাদেবের কাছ থেকে এই পঞ্চনদ-তীর্থের উৎপত্তি, মাহাত্ম্য আর কিভাবে কেনই বা মাধব সেখানে থেকে গেলেন, যা শুনেছি, তা বলি শোন ঃ

পুরাকালে ভৃগুবংশে মূর্তিমান দ্বিতীয় বেদের ন্যায় সর্বজ্ঞানের আধার বেদশিরা নামে এক মহর্ষির আবির্ভাব ঘটেছিল। একদিন, তপস্যাকালে হঠাৎ তাঁর নয়নগোচর হল রূপলাবণ্যবতী অপ্সরা শুচি। তাকে দেখা-মাত্রই মুনির মন এতই চঞ্চল হয়ে উঠল যে তিনি আর বীর্য ধারণ করতে পারলেন না ; অতর্কিতে রেতঃ স্খলিত হয়ে গেল। তাই দেখে শুচি ভয়াতুরা হয়ে দূর থেকেই তাকে প্রণাম করে বললেন—'জ্ঞানত আমি কোন অপরাধ করিনি। অজ্ঞাতসারেও যদি কোন অপরাধ করে থাকি, হে তপোনিধি, আমায় ক্ষমা করুন।' শুনে বেদশিরা বললেন—'এখানে আমার বা তোমার কিছুমাত্র অপরাধ ঘটেনি। তুমিও অতর্কিতে এখানে এসেছ আর আমারও স্খলন ঘটেছে অতর্কিত-ভাবেই। কামপ্রযুক্ত নয়। তবুও এক্ষেত্রে তোমার স্বাভাবিকভাবেই একটা কর্তব্য এবং দায়িত্ব এসে গেছে। আমাদের বীর্য অমোঘ। তোমার দর্শনে যেহেতু এই বীর্য স্খলিত হয়েছে। এটিকে তুমি তোমার জঠরে ধারণ কর। যথাসময়ে তোমার একটি মহাপবিত্র কন্যারত্ন লাভ হবে।' ঋষির বাক্য, অন্যথা করার উপায় নেই, শুচি সেই বীর্য আপন জঠরে ধারণ করলেন। যথাসময়ে দিব্যাঙ্গনা-সদৃশ একটি কন্যারত্ন প্রসব করে, তাকে বেদশিরার আশ্রমে রেখে শুচি চলে গেলেন তার

গন্তব্য স্থানে।

বেদশিরা সেই কন্যার নাম রাখলেন 'ধূতপাপা'। হরিণীর স্তনদুগ্ধে তাকে লালন-পালন করতে লাগলেন। দিনে-দিনে বর্ধমানা চন্দ্রের দ্যুতি নিয়ে বাড়তে লাগল ধূতপাপা। দেখতে-দেখতে আট বছর বয়স হলে বেদশিরা তাকে যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন।

অনেক ভেবে-চিন্তেও বেদশিরা যখন কন্যার যোগ্যপাত্রের সন্ধান করতে পারলেন না, তখন কন্যাকে ডেকে জানতে চাইলেন তার অভিলষিত স্বামীর নাম, যার সঙ্গে তিনি নিশ্চিন্তে তার বিবাহ দিতে পারেন।

কন্যা ধূতপাপা কিছুকাল চিন্তা করে বললে—'যদি কোন সৎপাত্রের সাথে আমার বিয়ে দিতে ইচ্ছে করেন, তবে আমার অভিলষিত সেই পাত্রের গুণাবলী হবে এইরকম ঃ যিনি হবেন সকল পদার্থ থেকে পবিত্র, সকলে যাঁকে নমস্কার করেন, যিনি সকলের কাছেই প্রার্থনীয়, সকল সুখের উৎপত্তিস্থল, অবিনাশী, সর্বলোকের পরিত্রাতা, যাঁর কৃপাকণায় সকলের মনোরথ সিদ্ধ হয়, আমাকে এমন কোন এক পাত্রে সমর্পণ করুন। পিতা—

যন্নামগ্রহণাদেব কেঽপি বাধাং ন কুর্ব্বতে।
যদাধারেণ তিষ্ঠন্তি ভুবনামি চতুর্দ্দশ॥
এবমাদ্যা গুণা যস্য বরস্য বরচেষ্টিতম্।
তস্মৈ প্রযচ্ছ মাং তাত মম তেঽপীহ শর্ম্মণে॥" (৫৯/৫৩-৫৪)

—যাঁর নাম গ্রহণ করলে কেউ কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না, যাঁকে অবলম্বন করে চতুর্দশ ভুবন বিরাজিত; এমন গুণরাজি যাঁর মধ্যে আছে, আমাকে সেইরকম পাত্রে সমর্পণ করে আপনার এবং আমার কল্যাণ বিধান করুন।'

কন্যার প্রার্থনায় অতীব প্রীত হলেন পিতা বেদশিরা। এমন কন্যার জনক হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করে চিন্তা করতে বসলেন, কে হতে পারে এমন সৎপাত্র! ধ্যানমগ্ন হয়ে কন্যার প্রার্থিত গুণাবলী-

সমন্বিত একজন পাত্রকেই তিনি অবলোকন করে কন্যাকে বললেন ঃ 'কন্যা ধূতপাপা! একজনই মাত্র এমন গুণরাজিসমন্বিত আছেন কিন্তু তিনি ত' সহজলভ্য নন। তাঁকে পতিরূপে লাভ করতে গেলে চাই মহাতপস্যা, দান, দম, দয়া।

"তপঃপণেন স ক্রয্যঃ সুতীর্থবিপণৌ ক্বচিৎ" (৬০)—সুতীর্থরূপ কোন বিপণিতে গিয়ে সুতপোরূপ পণ দিয়েই মাত্র সেই বররূপ পণ্য-দ্রব্যটিকে ক্রয় করা যেতে পারে।'

ধূতপাপা তা শুনে পিতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসীতে গিয়ে তপস্বিনীর বেশে কঠোর শরীর-সাধ্য দুশ্চর তপস্যা সুরু করল। নিদাঘের দাহ, বর্ষার অবিরাম বারিধারার সঙ্গে গুরুগম্ভীর অশনি-নির্ঘোষ, শরতের কলহংসকুলের গুঞ্জন, হেমন্তের শিশির, শীতের তীব্র কম্পন, বসন্তের কোকিলালাপ—কোন কিছুই তাকে তপস্যার একাগ্রতা থেকে বিন্দুমাত্রও সরাতে পারল না। ক্রমে-ক্রমে কন্যা ক্ষুধা-তৃষ্ণা পরিহার করে কেবলমাত্র সর্পগণের বৃত্তি (বায়ু-আহার) করে থাকল। ফলে, কোমলাঙ্গীর কোমল অঙ্গ বিশুদ্ধ হলেও যেন মণিপ্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ধূতপাপার সেই নিশ্চলা তপস্যায় স্থির থাকতে না পেরে হংসবাহন চতুরানন আবির্ভূত হলেন তার সামনে বরপ্রদানের জন্যে। ধূতপাপা তাঁর কাছে কেবলমাত্র একটি অভিলাষই জানালে ?

"পিতামহ বরো মহ্যং যদি দেয়ো বরপ্রদ।
সর্ব্বেভ্যঃ পাবনেভ্যোঽপি কুরু মামতিপাবনীম্॥" (৫৯/৮১)

—হে বরপ্রদ পিতামহ! আপনার যদি আমাকে বরপ্রদানের অভিলাষই হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে সেই বর দিন, যাতে পৃথিবীতে যত পাবনী (পবিত্র-সম্পাদক) আছে, আমি যেন তাদের চেয়েও অধিকতর পাবনী হই।

ব্রহ্মা কন্যায় অভিলষিত বর প্রদান করে অন্তর্হিত হলেন ; ধূতপাপাও প্রত্যাগমন করল পিতা বেদশিরার আশ্রমে।

একদিন ধূতপাপা আশ্রম-প্রাঙ্গণে ক্রীড়ারতা। বিগতকল্মষা

সেই কন্যাকে দেখে স্বয়ং ধর্ম কামাতুর হয়ে অজ্ঞাত পরিচয় ব্রাহ্মণের বেশে এসে নিভৃতে তার পাণি প্রার্থনা করল। ধূতপাপা প্রথমে উপেক্ষা করলেও ব্রাহ্মণের বারংবার কামনায় ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেঃ 'আপনার এ-রকম দুর্মতি কেন ? আপনি আমার পিতার কাছে গিয়ে আমাকে প্রার্থনা জানান, সেটাই তো নিয়ম।' কিন্তু ধর্ম ধূতপাপার কথা উপেক্ষা করে প্রস্তাব দিলে গান্ধর্ব-বিবাহ করে তার মনোরথ সফল করতে। শুনে, খুবই বিরক্ত হল ধূতপাপা। বললে, 'তুমি এখনই এ স্থান ত্যাগ কর।' কিন্তু ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম এতই কামাতুর হয়ে উঠেছিলেন যে স্থান পরিত্যাগ তো দূরের কথা, অত্যন্ত পীড়াপীড়ি সুরু করে দিলেন। তখন ধূতপাপা আর স্থির থাকতে না পেরে তাকে অভিশাপ দিলেঃ 'জড়োঽসি নিতরাং যস্মাজ্জলাধারো নদো ভব'॥ (৯৫)—জড়স্বভাব তুমি আজ থেকে জলাধার নদে পরিণত হও। ধর্মও ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতি অভিশম্পাত দিলেঃ 'কঠোরহৃদয়ে ত্বং তু শিলা ভব সুদুর্ম্মতে'॥ (৯৬)—কঠোরহৃদয়ে দুর্মতে ! তুমিও আজ থেকে শিলায় পরিণত হও।

সেই অভিশম্পাতে ধর্ম নদরূপে 'ধর্মনদ' নামে থেকে গেছেন অবিমুক্তক্ষেত্রে। এদিকে শাপগ্রস্তা ত্রস্তা ধূতপাপা ছুটে এল পিতার কাছে, নিবেদন করলে সব কিছু। পিতা বেদশিরাও ধ্যাননেত্রে সবকিছু প্রত্যক্ষ করে বললেন—'কন্যা, ঐ নদরূপী ধর্মই হলেন তোমার অভিলষিত সর্বগুণসম্পন্ন স্বামী। কিন্তু শাপ যেহেতু বিফলে যাবে না, তুমি অন্য কোন শিলা না হয়ে চন্দ্রকান্ত শিলায় পরিণত হবে। চন্দ্রের উদয়ে দ্রবীভূত তোমার শরীর নদীরূপ ধারণ করে সর্বপাপধৌতকারী 'ধূতপাপা' নামে পরিচিত হবে। আমার তপোবলে তোমরা দুজনেই প্রাকৃত এবং দ্রবময় রূপ ধারণ করবে।' এইভাবে ধর্মনদের সঙ্গে মিলন ঘটল ধূতপাপা নদীর। এই পবিত্র তীর্থেই ময়ূখাদিত্য যখন মঙ্গলাগৌরীর ধ্যানে তন্ময় তখন তাঁর কিরণময় অঙ্গ থেকে এত স্বেদরাশি বিনির্গত হয়েছিল যে, তা একটা নদীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সেই স্রোতস্বিনী হল 'কিরণা'। এই কিরণাও এসে মিলিত হল ধূতপাপা

আর ধর্মনদের সঙ্গে। তারপর ভগীরথ আনলেন ভাগীরথীকে; ভাগীরথীর সঙ্গে এসে মিলিত হল যমুনা আর সরস্বতী। এইভাবে, ধূতপাপা, কিরণা, সরস্বতী, গঙ্গা আর যমুনা—এই পাঁচটি নদীর সঙ্গমের ফলে এই তীর্থ ত্রিভুবনে 'পঞ্চনদ' তীর্থ নামে বিখ্যাত হল। ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষের মঙ্গলময় আবাসভূত এই তীর্থ অশেষ মহিমান্বিত।

"কৃতে ধর্ম্মনদং নাম ত্রেতায়াং ধূতপাপকম্।
দ্বাপরে বিন্দুতীর্থঞ্চ কলৌ পঞ্চনদং স্মৃতম্॥" (৫৯/১৩৭)

—সত্যযুগে ধর্মনদ তীর্থ, ত্রেতাযুগে ধূতপাপক, দ্বাপরযুগে বিন্দু আর কলিযুগে তীর্থ হল পঞ্চনদ।

এই কথা বলে ষড়ানন এবার বিন্দুমাধবের আবির্ভাব কাহিনী বললেন মুনি মিত্রাবরুণনন্দন অগস্ত্যকে।

রাজা দিবোদাসকে কাশীধামচ্যুত করার সফল প্রয়াস-সংবাদ দিয়ে গরুড়কে মন্দর পর্বতে মহাদেবের কাছে পাঠিয়ে বিষ্ণু যখন এই পঞ্চনদতীর্থে বসে তপস্যায় মগ্ন, তখন এক ঋষি; নাম অগ্নিবিন্দু, দেখতে পেলেন তাঁকে। গলায় বনমালা, চারি হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, বক্ষস্থলে কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীতবাস—দেখেই উদ্বেল হয়ে উঠল অগ্নিবিন্দুর মন। সেই হৃষিকেশকে স্তবে তুষ্ট করলে অচ্যুত তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। অগ্নিবিন্দু জানাল তার প্রার্থনা।

"ভগবন্ সর্ব্বগোঽপীহ তিষ্ঠ পঞ্চনদে হ্রদে।
হিতায় সর্ব্বজন্তূনাং মুমুক্ষাণাং বিশেষতঃ॥
লক্ষীশেন বরো মহ্যমেষ দেয়োঽবিচারতঃ।
নান্যং বরং সমীহেঽহং ভক্তিং চ ত্বৎপদাম্বুজে॥" (৬০/৪৮-৪৯)

—হে ভগবন! আপনি সর্বব্যাপী হলেও সমস্ত জীবগণের, বিশেষ করে, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির হিতের জন্যে এই পঞ্চনদ তীর্থেই অবস্থান করুন। আপনার চরণ কমলে আমার অচলা ভক্তি লাভ হক। লক্ষ্মীপতি, আপনি অবিচারে আমাকে এই বর দিন, অন্য কোন বর চাই না।

লক্ষ্মীপতি অচ্যুত আত্মকেন্দ্রিকতাহীন ঋষির এই প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানিয়ে আরও বর প্রার্থনা করতে বললে ঋষি প্রার্থনা জানালেন—'হে রমাপতে! এই স্থানে আপনি আমার নামে অবস্থান করে সবসময় ভক্ত এবং অভক্ত প্রত্যেককেই মুক্তি উপদেশ করুন।'

আরো প্রসন্ন হয়ে বিষ্ণু বললেন—'বিন্দুমাধব ইত্যাখ্যা মম ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা। কাশ্যাং ভবিষ্যতি মুনে মহাপাপৌঘঘাতিনী'—মহাপাপসমূহ বিনাশকারী আমার ত্রৈলোক্যবিশ্রুত 'বিন্দুমাধব' এই নামে কাশীতে আমি পরিচিত হব। আর এই তীর্থ পাতক-বিনাশন 'বিন্দুতীর্থ' নামে বিখ্যাত হবে।

অতঃপর শ্রীহরি অগ্নিবিন্দুকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দিয়ে বললেন—কলিতে মানুষ আমারই মায়া প্রভাবে ভেদবুদ্ধি-সমাচ্ছন্ন আর মোহগ্রস্ত হয়ে পরস্পরে বিদ্বেষভাব পোষণ করে অশেষ দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন। এর থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল ব্রত-পরায়ণ হওয়া। পাশুপাত-ভূমি এই বারাণসীতে মহাদেবে আর আমাতে যারা বিভেদ দেখবে, তাদের মুক্তি নেই।

> "আদিমাধবনামাহং পূজ্যঃ সত্যযুগে মুনে ॥
> অনন্তমাধবো জ্ঞেয়স্ত্রেতায়াং সর্ব্বসিদ্ধিদঃ।
> শ্রীমাধবসংজ্ঞোঽহং দ্বাপরে পরমার্থকৃৎ ॥
> কলৌ কলিমলধ্বংসী জ্ঞেয়োঽহং বিন্দুমাধবঃ।" (৬০/১২৪-২৬)

—হে মুনে! সত্যযুগে আমি ছিলাম 'আদিমাধব', ত্রেতায় 'অনন্ত-মাধব', দ্বাপরে 'শ্রীমাধব', আর কলিতে কলিমলনাশন আমিই 'বিন্দুমাধব'।

অনন্তর ঋষি অগ্নিবিন্দু জানতে চাইলে, ভগবান জনার্দন কী কী রূপে আছেন কাশীতে আর ভবিষ্যতে কি কি মূর্তিতেই বা অবস্থান করে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন।

মাধব এই প্রসঙ্গে অগ্নিবিন্দুকে যা বলেছিলেন, দেব ষড়ানন তা শোনালেন অগস্ত্যকে।

বিষ্ণু বললেন—প্রথমত, পাদোদক-তীর্থে 'সঙ্গমেশ্বর' মহাশিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে আমি আছি আদিকেশব-রূপে। এর দক্ষিণে শ্বেতদ্বীপ মহাতীর্থে আমি জ্ঞানকেশব। তার্ক্ষ্যতীর্থে আমি তার্ক্ষ্যকেশব। নারদতীর্থে আমি নারদকেশব। প্রহ্লাদতীর্থে আমি প্রহ্লাদকেশব। অম্বরীষতীর্থে আমি আদিত্যকেশব! দত্তাত্রয়েশ্বর মহাদেবের দক্ষিণে আমি গদাধর। ভার্গবতীর্থে আমি ভৃগুকেশব। বামন মহাতীর্থে আমি বামনকেশব। নরনারায়ণ-তীর্থে আমিই আছি নর-নারায়ণরূপে। যজ্ঞবরাহতীর্থে যজ্ঞবারাহ। বিদারনরসিংহতীর্থে কাশীর বিঘ্ন-বিদারণ আমি বিদারনরসিংহ। গোপীগোবিন্দতীর্থে আমি গোপীগোবিন্দ। লক্ষ্মী-নৃসিংহতীর্থে আমি লক্ষ্মী-নৃসিংহ। শেষতীর্থে আমিই হলাম শেষমাধব। এছাড়াও শঙ্খমাধব তীর্থে শঙ্খমাধব; হয়গ্রীব তীর্থে হয়গ্রীব-কেশব, বৃদ্ধকালেশ্বর মহাদেবের পশ্চিমে ভীষ্ম-কেশব; লোলার্কের উত্তরে নির্বাণকেশব নামে অবস্থিত। কাশীতে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর দক্ষিণে ত্রিভুবনকেশব; জ্ঞানবাপীর সামনে জ্ঞানমাধব; বিশালাক্ষী দেবীর কাছে শ্বেতমাধব; দশাশ্বমেধের উত্তরে প্রয়াগমাধব নামেও আমি মুমুক্ষুজনের জন্যে অবস্থিত। সর্বতীর্থসার একমাত্র মণিকর্ণিকায় প্রত্যহ স্নানবলেই আমি আমার নামগ্রহণ-কারীদের পাপসমূহ হরণ করেই আমি হয়েছি 'হরি'। হে মুনে! অগস্ত্য-তীর্থের দক্ষিণে গঙ্গাকেশব তীর্থে আমিই গঙ্গাকেশব। মণি-কর্ণিকার উত্তরে সীমা-বিনায়কের দক্ষিণে এবং বৈরোচনেশ্বরের পূর্বে আমি 'বৈকুণ্ঠমাধব'। বীরেশ্বরের পশ্চিমে আর কালভৈরবের কাছে আমি আছি বীরমাধব আর কালমাধব নামে।

পুলস্তীশ্বর মহাদেবের দক্ষিণে আমি নির্বাণদায়ী নির্বাণ-নরসিংহ-রূপে অবস্থান করছি। মহাবলনৃসিংহরূপে আমি আছি ওঁঙ্কারেশ্বর মহাদেবের পূবে; প্রচণ্ডনরসিংহরূপে আছি চণ্ডভৈরব মহাদেবের পূবে। দেহলি বিনায়কের পূবে আমি গিরিনৃসিংহ। পিতামহেশ্বর শিবের পিছনে আমি মহাভয়হর নরসিংহ। কলসেশ্বর মহাদেবের পশ্চিমে আমি অত্যুগ্র নরসিংহ। কঙ্কাল ভৈরবের কাছে আমি কোলাহল

নৃসিংহ। আবার নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের পিছনে আমিই বিটঙ্ক নরসিংহ নামে অবস্থিত। অনন্তেশ্বর মহাদেবের কাছে আমি অনন্ত বামন আর দধিমাধব। ত্রিলোচনের উত্তরে আমি ত্রিবিক্রম। কলি-ভদ্রেশ্বর মহাদেবের পূবে আমিই হলাম বলিবামন।

তাম্রদ্বীপ থেকে কাশীতে এসে ভবতীর্থের দক্ষিণে আমিই অবস্থান করছি তাম্রবরাহ-রূপে। প্রয়াগেশ্বর মহাদেবের কাছে ধরণীবরাহ-রূপে; বরাহেশ্বর মহাদেবের কাছে আমি কোকাবরাহ-রূপে অবস্থান করছি।

"নারায়ণাঃ শতং পঞ্চ শতঞ্চ জলশায়িনঃ।
ত্রিংশৎ কমঠরূপাণি মৎস্যরূপাণি বিংশতিঃ॥
গোপালাশ্চ শতং সাষ্টং বুদ্ধাঃ সন্তি সহস্রশঃ।
ত্রিংশৎ পরশুরামাশ্চ রামা একোত্তরং শতম্॥
বিষ্ণুরূপোঽস্ম্যহং চৈকো মুক্তিমণ্ডপমধ্যতঃ।
মুনে কৃত প্রসাদেন বিশ্বেশেন শ্রিতঃ স্বয়ম্॥
নারায়ণ স্বরূপেণ গণাশ্চক্রগদোদ্যতাঃ
কুর্ব্বন্তি রক্ষাং ক্ষেত্রস্য পরিতো নিযুতানি ষট্॥" (৬০/২০৭-২১০)

—হে অগ্নিবিন্দু! আমার পাঁচশ' নারায়ণ মূর্তি, একশো জলশায়ি মূর্তি, একশো আট গোপাল মূর্তি, একহাজার প্রায় বুদ্ধমূর্তি, তিরিশ পরশুরাম মূর্তি, একোত্তরশো রামমূর্তি বিরাজমান। হে মুনে! স্বয়ং বিশ্বনাথের প্রসাদে এই মুক্তিমণ্ডপে আমি বিষ্ণুরূপে অবস্থিত আর আমার ছয় নিযুত গণ নারায়ণরূপে চক্র ও গদা ধারণ করে চতুর্দিকে এই ক্ষেত্র রক্ষা করছে।

এরপর অগ্নিবিন্দু জিজ্ঞেস করলে :

"হিতায় নিজভক্তানাং মম সন্দেহশান্তয়ে।
কতি তে মূর্তয়োঽনন্ত কথং জ্ঞেয়াস্তথা বদ॥" (৬০/২১২)

—হে প্রভো! অনন্তমূর্তি আপনার রূপভেদ কয়রকমের আর কিভাবেই বা জানা যাবে, ভক্তদের হিতের জন্য সেই সঙ্গে আমার সন্দেহ নিরসনের জন্য বলুন।

তখন চতুর্ভুজ বিষ্ণু অগ্নিবিন্দুকে নিদর্শন-সহ নিজের রূপভেদ বর্ণনা করলেন : প্রথমে ডানদিকের ঊর্ধ্বহস্ত হতে পর্যায়ক্রমে যে মূর্তিতে আমি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-পাণি, সেটি হল আমার কৈশবীমূর্তি ; যে মূর্তিতে আমি শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্র-পাণি, সেটি আমার মধুসূদন মূর্তি ; যে মূর্তিতে আমি শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদা-পাণি সেটি আমার সঙ্কর্ষণ মূর্তি ; যে মূর্তিতে আমি শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম-পাণি, সেটি আমার দামোদর মূর্তি ; যে মূর্তিতে আমি শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদা-পাণি, সেটি আমার বামন মূর্তি ; যে মূর্তিতে আমি শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র-পাণি সেটি আমার প্রত্যুম্নমূর্তি ।

বাঁদিকের ঊর্ধ্বহস্ত থেকে যেখানে আমি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মপাণি সেখানে আমার বিষ্ণুমূর্তি ; যেখানে আমি শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রপাণি. সেখানে আমার মাধব মূর্তি ; যেখানে আমি শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদাপাণি সেখানে আমার অনিরুদ্ধ মূর্তি; যেখানে আমি শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্মপাণি, সেখানে আমার পুরুষোত্তম মূর্তি ; যেখানে আমি শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদা-পাণি, সেখানে আমার অধোক্ষজ মূর্তি ; আর যেখানে আমি শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্রপাণি, সেখানে আমার জনার্দন মূর্তি ।

সেইরকমই আবার বাঁদিকের নীচের হাত যেখানে আমি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধৃত, সেখানে আমি গোবিন্দ মূর্তি ; যেখানে আমি শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধৃত, সেখানে আমি ত্রিবিক্রম মূর্তি ; যেখানে আমি শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদাধৃত, সেখানে আমি শ্রীধর ; যেখানে আমি শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্মধৃত, সেখানে আমি হৃষিকেশ ; যেখানে আমি শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাধৃত, সেখানে আমি নৃসিংহ ; আর যেখানে আমি শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্মধৃত, সেখানে আমি অচ্যুত ।

আবার ডানদিকের নীচের হাত থেকে যেখানে আমি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মপাণি, সেখানে আমার বাসুদেব মূর্তি ; যেখানে আমি শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রপাণি, সেখানে আমার নারায়ণ মূর্তি ; যেখানে আমি শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদাপাণি, সেখানে আমার পদ্মনাভ মূর্তি ; যেখানে আমি শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্মপাণি, সেখানে আমার উপেন্দ্র মূর্তি ; যেখানে আমি শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাপাণি, সেখানে আমার শ্রীহরি মূর্তি ; আর যেখানে

আমি শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্রপানি, সেখানে আমার কৃষ্ণমূর্তি!

ভগবান বিষ্ণু যখন এইভাবে পঞ্চনদ তীর্থে বসে অগ্নিবিন্দুর কাছে স্বীয় স্বরূপ বিশ্লেষণ করে চলেছেন, তখন প্রত্যাগমন হল গরুড়ের, জানাল দেবাদিদেবের আগমন-বার্তা। ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ গগনপথে বিমানচারিগণের দিব্য যানসমূহে পরিবেষ্টিত ত্রিলোচনের বৃষভধ্বজ রথ দেখে, তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। অগ্নিবিন্দুকে বললেন—তুমি ডান হাত দিয়ে আমার এই সুদর্শন চক্র স্পর্শ কর। ঋষি নির্দেশ মত স্পর্শ করামাত্রই শোভন জ্ঞান লাভ করে নারায়ণের শ্রীঅঙ্গে একীভূত হয়ে গেলেন।

নারায়ণ আর কালবিলম্ব না করে ব্রহ্মাকে সামনে নিয়ে এবং বিষ্ণু, সূর্য, গণসমূহ এবং গণপতিকে পিছনে নিয়ে সহর্ষে দেবাদিদেবকে আহ্বান জানাবার জন্যে এগিয়ে এলেন বারাণসী সীমা পর্যন্ত। দেবেশের আদেশ প্রতিপালন করে ফিরে না-যাওয়ার জন্যে ব্রহ্মা থেকে সুরু করে প্রত্যেকের মনেই ছিল একটা অপরাধ-বোধ। দেবেশ এলে তাঁকে যথোচিত সম্বর্ধনা জানিয়ে ব্রহ্মা এবং আদিত্য নিজেদের অপরাধ-মনস্কতা স্খালন করতে এলে মহাদেব তাঁদের প্রসন্ন করলেন, যোগিনী আর গণসমূহকেও সহাস্যে আশ্বস্ত করলেন। গরুড়ের কাছ থেকে গণপতি আর গদাধরের অসামান্য কার্যাবলীর কথা তো শুনেইছিলেন। তাদেরও দিকে নিক্ষেপ করলেন প্রসন্ন দৃষ্টি। ঠিক সেই সময়েই গোলকধাম থেকে সেখানে এসে হাজির হল পাঁচটি ধেনু—সুনন্দা, সুশীলা, সুমনা, সুরভি আর কপিলা তাদের নাম। তাদের পয়োধর থেকে অযাচিত দুধ নিঃসৃত হয়ে সেখানে যেন এক দ্বিতীয় দুগ্ধসমুদ্র হয়ে গেল। মহাদেব সেই সুবিশাল হ্রদের নাম রাখলেন 'কাপিল তীর্থ'। মহেশ্বরের আদেশে দেবগণ সেই তীর্থে স্নান করামাত্রই আবির্ভূত হলেন অগ্নিষ্বাত্তা, আজ্যপ, বর্হিষদ, সোমপাদি পিতৃগণ। তাঁদের আবেদনে, এই তীর্থকে মহাদেব করলেন পিতৃপুরুষগণের মোক্ষপ্রদ তীর্থ। দশ-নামে মহাদেব এই তীর্থকে

মোক্ষপ্রদ করলেন—মধুস্রবা, ঘৃতকুল্যা, ক্ষীরনিরধি, বৃষভধ্বজ তীর্থ, পৈতামহ, গদাধর, পিতৃ, কাপিল, সুধাখনি আর শিবগয়া তীর্থ। তিনি তীর্থোদ্ভূত পিতামহগণকে উদ্দেশ করে বললেন।

"কৃতে ক্ষীরময়ং তীর্থং ত্রেতায়াং মধুমৎ পুনঃ।
দ্বাপরে সর্পিষা পূর্ণং কলৌ জলময়ং ভবেৎ॥" (৬২/৮৩)

—সত্যযুগে এই তীর্থ হবে ক্ষীরময়, ত্রেতায় মধুময়, দ্বাপরে ঘৃতময় আর কলিতে হবে জলময়।

যদিও এই তীর্থ বারাণসীর সীমার বাইরে তবুও যেহেতু এখানেই সকলে প্রথমে আমার বৃষধ্বজ দেখেছে, সেহেতু এখানেই আমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-আদিত্য আর আমার পার্ষদদের নিয়ে বৃষভধ্বজরূপে অবস্থান করব।

ইতিমধ্যে নন্দীকেশ্বর আটটি সিংহ, আটটি বৃষভ, আটটি হস্তী, আর আটটি অশ্ব-যোজিত বিশালকায় পরম রমনীয় এক রথ নিয়ে এলেন মহাদেবের কাশীতে প্রবেশের জন্য। চারণদের মঙ্গলগীত, দেববাদ্য নিনাদে পরিপূরিত আকাশ-মাটি। বিষ্ণুর হাত ধরে পিনাকপাণি উঠলেন। তেত্রিশ কোটি দেবতা, বিশহাজার কোটি গণ, ন'কোটি চামুণ্ডা, এককোটি ভৈরবী, আটকোটি অনুচর-সহ মহাবল ময়ূরবাহন, গজানন, সাতকোটি পিচণ্ডিল গণ, ষাট হাজার ব্রহ্মবাদী মুনি গৃহমেধি ঋষি, তিনকোটি নাগ, দু'কোটি করে দানব আর দৈত্য, আট নিযুত গন্ধর্ব, আধকোটি যক্ষ-রাক্ষস, ষাট হাজার অপ্সরা, আট লক্ষ গো-মাতৃকা, ছ' অযুত গরুড় বংশীয় পাখি, বিশলক্ষ দশহাজার বিদ্যাধর, সপ্ত সাগর, তিপান্ন হাজার নদী, আট হাজার পাহাড়, তিনশ' বনস্পতি আর আট দিগ্‌হস্তী নিয়ে সুবিপুল আনন্দে পার্বতীসহ মহাদেব আবার ফিরে এলেন স্বীয় পুরী কাশীতে।

[অধ্যায় ৬৩—৬৪]

ভক্তবৎসল সর্বজ্ঞ দেব মহেশ্বর বারাণসীতে প্রবেশ করে প্রথমেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন একটি গুহার দিকে, যার অভ্যন্তরে জৈগীষব্য নামে এক ঋষি ছিলেন গভীর তপস্যামগ্ন। বৃষভবাহন মহেশ্বর ভগবতী গিরিজার সঙ্গে সেই গুহামুখে এসে দাঁড়ালেন। তারপর নন্দীকে ডেকে দেবগণের সামনেই বললেন—নন্দী, যেদিন আমি কাশী ত্যাগ করে মন্দর পর্বতে প্রস্থান করি, সেইদিন থেকেই যম-নিয়ম-প্রাণায়াম অবলম্বন করে খাদ্য তো দূরের কথা, জলকণা পর্যন্ত গ্রহণ না করে আমার পাদপদ্ম বিলোকনের আশায় জৈগীষব্য এই গুহামধ্যে কঠোর যোগ সাধনায় রত রয়েছে। তুমি আমার এই লীলাকমল নিয়ে, গুহামধ্যে গিয়ে তার সর্বাঙ্গে স্পর্শ করিয়ে, চৈতন্যোদয় ঘটিয়ে তাকে এখানে নিয়ে এস।

জৈগীষব্যের এই যোগ সাধনার কাহিনী একমাত্র মহাদেব ছাড়া আর কেউ জানতেন না, তাই দেবগণ-সহ সকলেই বিস্মিত হলেন।

সেই মুহূর্তটি ছিল—সোমবার, জ্যৈষ্ঠমাস, অনুরাধা নক্ষত্রযুক্ত শুক্লাচতুর্দশী। যেহেতু প্রমথনাথ কাশী প্রবেশের প্রথমেই এখানে এই সময় এসেছিলেন, তাই এই স্থানটি 'জ্যেষ্ঠ' নামে পরিচিত আর দুই স্বয়ম্ভু লিঙ্গ 'জ্যেষ্ঠেশ্বর' এবং 'জ্যেষ্ঠাগৌরী' নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মঙ্গলদায়ী। আবার এখানে মহাদেবের কিছুকাল অবস্থান করার ফলে, পরে এখানে 'নিবাসেশ' নামে এক পরম পবিত্র লিঙ্গ খ্যাতিলাভ করেছিল।

নন্দী অতঃপর সেই লীলাকমল নিয়ে প্রমথনাথকে প্রণাম করে প্রবেশ করলেন গুহামধ্যে। ঋষিবরের গায়ে লীলাকমল স্পর্শ করাতেই আনন্দাপ্লুত ঋষির ধ্যানমগ্ন ভাব অপসারিত হল। চোখ মেলে তাকাতেই বাঞ্ছিত শশিশেখরকে দেখেই পরমানন্দের হেতুভূত শিবকে

স্তবার্চনা করে প্রার্থনা জানালেন—হে দেবেশ ! আমি যেন কখনো আপনার চরণাম্বুজ ছাড়া না থাকি আর প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গে আপনি সর্বদা অধিষ্ঠান করুন।

ভবানীপতি তার অভীপ্সা পূরণ করেও বললেন :

"যোগশাস্ত্রং ময়া দত্তং তব নির্ব্বাণসাধকম্।
সর্ব্বেষাং যোগিনাং মধ্যে যোগাচার্য্যোহস্তু বৈ ভবান্॥
রহস্যং যোগবিদ্যায়া যথাবত্তং তপোধন।
সংবেৎস্যসে প্রসাদান্মে যেন নির্ব্বাণমাপ্স্যসি॥" (৬৩/৭১-৭২)

—হে মহাভাগ জৈগীষব্য ! আমি তোমাকে পরম নির্বাণসাধক যোগশাস্ত্র প্রদান করলাম। তুমি যোগিগণের মধ্যে যোগাচার্য পদবী লাভ করবে। হে তপোধন ! তুমি আমার অনুকম্পায় নিখিল যোগশাস্ত্রের রহস্য অবগত হবে আর তার ফলে পরম নির্বাণ লাভে সমর্থ হবে।

জ্যেষ্ঠেশ্বর ক্ষেত্রে জৈগীষব্য প্রতিষ্ঠিত কলিতে গুপ্ত জৈগীষব্যেশ্বর লিঙ্গ যোগসিদ্ধি প্রদাতা।

"করিষ্যাম্যত্র সান্নিধ্যমস্মিল্লিঙ্গে তপোধন।
যোগসিদ্ধি প্রদানায় সাধকেভ্যঃ সদৈব হি॥" (৬৩/৮৬)

—হে তপোধন! তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গে আমি সর্বদা থেকে সাধকদের সম্যক যোগসিদ্ধি প্রদান করব।

এইভাবে তিনি ঋষি জৈগীষব্যকে জরামরণরহিত, নন্দী-ভৃঙ্গী-সোমনন্দীর পর্যায়ে উন্নীত করে চোখ তুলতেই দেখলেন সামনে ক্ষেত্রবাসী সমবেত ব্রাহ্মণ।

মহাদেব সপরিবারে মন্দরে গমন করলে, ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করে থেকে গিয়েছিল। তারা দানাদি-গ্রহণ পরিহার করে দণ্ডের দ্বারা মাটি খুঁড়ে যেসব মূল আহরণ করত তাই খেয়ে জীবন-যাপন করতেন। বহুবার এইভাবে খোঁড়ার ফলে সেখানে হয়ে গিয়েছিল এক পুষ্করিণী। তাই, তার নাম হয়েছিল 'দণ্ডখাত'। এই দণ্ডখাতেরই চারদিকে অসংখ্য শিবলিঙ্গ স্থাপন করে মহাদেবের প্রত্যাবর্তন কাল পর্যন্ত তারা

কাটিয়েছিলেন কঠোর তপস্যায়। উমাপতির পুনরাগমন-বার্তা শুনে সেই দণ্ডখাত-তীর্থ থেকে এলেন পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ। এছাড়াও, মন্দাকিনী তীর্থ থেকে পাশুপাত-ব্রতাবলম্বী ব্রাহ্মণ এলেন অযুত-সংখ্যক। হংসতীর্থ থেকে এলেন তিনশ' অযুত, দুর্বাসা-তীর্থ থেকে এলেন দুশ' হাজারেরও বেশী। মৎসোদরী তীর্থ থেকে ছ' হাজার। কপাল-মোচন থেকে সাতশ'; ঋণমোচন থেকে দু হাজারেরও বেশী; বৈতরণী থেকে পাঁচ হাজার; পৃথুরাজের পৃথোদক তীর্থ থেকে তিনশ', মেনকা কুণ্ড থেকে দুশ'; উর্বশী কুণ্ড থেকে দুশ' হাজারেরও বেশী; ঐরাবত কুণ্ড থেকে তিনশ'; গন্ধর্ব কুণ্ড থেকে সাতশ'; অপ্সরা কুণ্ড থেকে দুশ'; বৃষেশ তীর্থ থেকে তিনশ' নব্বই; যক্ষিনী কুণ্ড থেকে তিনশ'র বেশী; লক্ষ্মী তীর্থ থেকে ষোলশ'র ও বেশী; পিশাচ-মোচন তীর্থ থেকে সাত হাজার; পিতৃ-কুণ্ড থেকে একশ'র কিছু বেশী, ধ্রুব-তীর্থ থেকে ছ'শ; মানস সরোবর থেকে পাঁচশ'; বাসুকি হ্রদ থেকে দশ হাজার; জানকী কুণ্ড থেকে আটশ'; গৌতম কুণ্ড থেকে ন'শ-র বেশী; দুর্গতি সংহরণ তীর্থ থেকে এগারোশ' ব্রাহ্মণ; অসি-সঙ্গম থেকে আরম্ভ করে সঙ্গমেশ্বর পর্যন্ত গঙ্গাতীরের আট হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন জন ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধার্ঘ নিয়ে এলেন মহাদেবের কাছে। গন্ধ-পুষ্প-মাল্য-আতপ তণ্ডুল প্রভৃতি দিয়ে তারা গিরিজাপতির পূজা-অর্চনা করে বলল:

"ক্ষেমমূর্ত্তিরিয়ং কাশী ক্ষেমমূর্ত্তির্ভবান্ ভব।
ক্ষেমমূর্ত্তিস্ত্রীপথগানান্যৎ ক্ষেমত্রয়ং ক্বচিৎ॥" (৬৪/৩৯)

—এই কাশী ক্ষেমমূর্তি, হে ভব! আপনিও ক্ষেমমূর্তি এবং ত্রিপথগা-ও ক্ষেমমূর্তি—এই তিনের অধিক ক্ষেম-মূর্তি আর কোথাও নেই।

সমাগত ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রভক্তিতে অতীব প্রীত হলেন মহেশ্বর এবং তাদের অভিলাষ পূরণ করে বললেন—তিনি আর কখনো কাশী পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবেন না। এখানে ব্রাহ্মণের কোন অভিশাপই মোক্ষ প্রতিবন্ধক হবে না আর দেহান্ত পর্যন্ত তারা অখণ্ড কাশীবাস করবে। অতঃপর দেবদেব তাঁদের লিঙ্গ-স্থাপন, সৎ-জীবন যাপন এবং

কখনো যেন তারাও এই যোগ-জ্ঞান-মুক্তির ত্রিসঙ্গম অবিমুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ করে না যায়, তার উপদেশ দিয়ে তাদের সামনেই অন্তর্হিত হলেন।

[অধ্যায় ৬৫—৬৮]

দেব ষড়ানন অতঃপর কুম্ভজ অগস্ত্যকে লিঙ্গ-সম্বন্ধীয় আরো ধারণা দিতে গিয়ে বললেন,—জ্যেষ্ঠেশ্বরের চারদিকে পরাশরেশ্বর, মাণ্ডব্যেশ্বর, শঙ্করেশ্বর, জাবালীশ্বর, কণ্বেশ্বর, কাত্যায়নেশ্বর প্রভৃতি সর্বসিদ্ধিপ্রদ পাঁচ হাজার শিবলিঙ্গ আছে।

একবার এখানেই এক অপূর্ব ব্যাপার ঘটেছিল। কোন একসময় এই জ্যেষ্ঠস্থানে পার্বতীর সঙ্গে মহাদেব বিহার করছিলেন। করতে-করতে শিবা শুরু করলেন কন্দুক (ভাঁটা) খেলা, নিজের মনেই ভাঁটা লোফালুফির নেশায় এমনি মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যে, সুবিন্যস্ত কেশদাম আলুথালু হয়ে কখন যে তা থেকে পুষ্পমাল্য স্থানভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে পড়েছে, গণ্ডদ্বয় থেকে স্বেদ-নির্গমন হতে শুরু হয়েছে, উৎক্ষিপ্ত কন্দুকের পুনঃপুন পতনে কখন যে তাঁর করপঙ্কজ রক্তরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে, বক্ষাবৃত বসন স্খলিত হয়ে অঙ্গপ্রভা বিচ্ছুরিত হতে শুরু করেছে, সে-সব দিকে কোন খেয়ালই ছিল না পার্বতীর। সেই অবস্থায় তাঁকে দেখল দেব-বরে বলীয়ান গগণ-বিহারী দুই দৈত্য—বিদল আর উৎপল। কাম-প্রপঞ্চে জর্জরিত হয়ে তাঁকে হরণ-অভিলাষে সেই দুই দৈত্য শাম্বরীমায়া অবলম্বন করে শিবপার্ষদ রূপে আকাশপথ থেকে অবতরণ করে চঞ্চলচিত্তে এগিয়ে আসতে লাগল পার্বতীর দিকে। সর্বজ্ঞ মহাদেবের কিন্তু তাদের এই অভিসন্ধি অনুধাবন করতে বিলম্ব হল না। ইশারা করলেন শিবাকে। শিবা-ও খেলাচ্ছলে এমনভাবে দুই কন্দুক ছুঁড়লেন দুই দৈত্যের দিকে, যে তারা তড়িতাহত গাছের মত নিষ্প্রাণ দেহে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আর কন্দুক-দুটি যেখানে গিয়ে পড়ল

সেখানে প্রাদুর্ভূত হল এক লিঙ্গ—নাম 'কন্দুকেশ্বর লিঙ্গ'।

এখানে আরও এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল, অগস্ত্য, তা-ও শোন।

দণ্ডখাত-তীর্থে ব্রাহ্মণেরা যখন নিষ্কাম তপস্যায় রত, সে-সময় প্রহ্লাদের মামা দুন্দুভি-নির্হ্রাদ, কিভাবে দেবতাদের পরাজিত করা যায়, তার উপায়-চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

অনেক ভেবে ঠিক করল, দেবগণ তো যজ্ঞভোজী মাত্র। যা কিছু যজ্ঞ সবই বেদাধীন, এই বেদ হল ব্রাহ্মণদের অধীন; তাহলে ব্রাহ্মণরাই হল দেবতাদের বল। ব্রাহ্মণদের দেওয়া আহার্য গ্রহণ করেই দেবগণের সামর্থ্য। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই ব্রাহ্মণদের দেওয়া ক্ষমতা বলেই বলীয়ান। সুতরাং যদি ব্রাহ্মণদের বিনষ্ট করা যায়, তাহলে বেদ আপনিই নষ্ট হয়ে যাবে। বেদ নষ্ট হলে আর বেদবিহিত যজ্ঞও হবে না। যজ্ঞ যদি আর না হয়, দেবতারা আর আহার্য্য পাবে না; আহার না পেলে দেবতারা দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন তাদের জয় করা, ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করে ত্রিভুবনের আধিপত্য করা কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য হবে না। দুন্দুভি-নির্হ্রাদ এ-ব্যাপারে স্থির-নিশ্চিত হয়ে এবার ভাবতে বসল, কোথায় ব্রহ্মতেজসম্পন্ন বেদপাঠী ব্রাহ্মণরা আছে। ভাবতে-ভাবতে দেখলে, বারাণসীতেই এর সংখ্যা বেশী। তাই ঠিক করল, আগে সেখানে গিয়ে সেখানকার ব্রাহ্মণদের নিঃশেষ করবে। তারপর তীর্থ থেকে তীর্থান্তর গমন করে যেখানে যত ব্রাহ্মণ পাবে, সকলেরই প্রাণ হরণ করবে।

দুন্দুভি-নির্হ্রাদ কাশীতে এসে উপস্থিত হল এবং মায়া অবলম্বন করে নিজ কৃত্য শুরু করে দিল। ব্রাহ্মণেরা সমিধ আহরণে অরণ্যে গেলে সেখানে, জলাশয়ে স্নানে গেলে সেখানেও বনচর, জলচর-রূপে তাদের প্রাণহরণ এমনভাবে করতে আরম্ভ করে দিলে যে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেউ টেরও পেত না। দিনের বেলায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধ্যান নিষ্ঠার ভাণ করে তাদের কুটির প্রবেশ আর নির্গমদ্বার লক্ষ্য করে রাখত। আর রাতে বাঘের রূপে এসে তাদের নিঃশেষে ভক্ষণ করত। এমনিভাবে অনেক ব্রাহ্মণ নিহত হল।

একদিন শিবরাত্রিতে এক ব্রাহ্মণ নিজ কুটিরে দেবদেবের পূজা শেষে ধ্যানমগ্ন। দুন্দুভি-নির্হ্রাদ ব্যাঘ্ররূপে এল তাকে ভক্ষণ করতে। তখন আক্রান্ত শরণাগত ভক্তকে রক্ষা এবং দানবকে নিধনের জন্য স্বয়ং মহাদেব ভক্ত-পূজিত লিঙ্গ থেকে রুদ্ররূপে আবির্ভূত হলেন দেখে দৈত্যও নিজ মূর্তি ভূধর প্রমাণ করে তাঁকে অবজ্ঞা করল। তিনিও চকিতে তাকে কুক্ষিগত করে প্রচণ্ড মুষ্টি প্রহার আরম্ভ করলেন। ব্যাঘ্ররূপী দুন্দুভি-নির্হ্রাদ সেই প্রহার এবং নিষ্পেষণে এতই নিপীড়িত হয়ে পড়ল যে তীব্র আর্তনাদ শুরু করে দিলে। সেই আর্তনাদ হঠাৎ শুনে সচকিত ব্রাহ্মণগণ সেখানে ছুটে এসে মহাদেবের কুক্ষিমধ্যে মৃগেশ্বর দুন্দুভিকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাঁর স্তব করলেন।

সেই থেকে জ্যেষ্ঠেশ্বরের উত্তরে মহাদেব ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা অনুসারে বিপদত্রাতা 'ব্যাঘ্রেশ্বর' শিবলিঙ্গ-রূপে সেখানে অবস্থান করছেন। এর পশ্চিমে অভয়দাতা 'উটজেশ্বর লিঙ্গ'।

জ্যেষ্ঠেশ্বরের চারিদিকে পঞ্চাশ হাজার লিঙ্গ ছাড়াও আরো অনেক শুভদ বাপী, কুণ্ড এবং লিঙ্গ বিদ্যমান। প্রতিটি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে শৈলেশ্বর-লিঙ্গ-র কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ।

পূর্বকালে কোন একদিন গিরিরাজ হিমালয়কে প্রসন্ন দেখে, পত্নী মেনকা স্বামীকে বললেন, 'গিরিজা উমার বিবাহ দেবার পর থেকে তার আর কোন সংবাদ না পেয়ে মন উৎকণ্ঠায় ভরে উঠেছে। না জানি উমাপতি বৃষভবাহন, সর্প-বিভূষণ জামাতা মহেশ্বরই বা কোথায়? আমার আশঙ্কা, ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার নিপীড়নে নিপীড়িতা হচ্ছে কন্যা উমা। আপনি একটু উদ্যম নিয়ে তাদের সংবাদ সংগ্রহ করে আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন।'

অপত্য-স্নেহাভিষিক্ত গিরিরাজের অন্তঃকরণ উমার নামে উদ্বেল হয়ে উঠল। গিরিরাজ আর কালক্ষেপ না করে, জানি না কন্যা কী অবস্থায় আছে এই ভেবে দুকোটি মুক্তা, ওজন যার চারশ' তোলা, একশো তোলার শুভ্রবর্ণ হীরে, একশো তোলা ওজনের দু-লাখ ছয়-কোণ-বিশিষ্ট অতি তেজোময় বৈদূর্যমণি, একশো পল পাঁচকোটি পদ্মরাগ,

ন'লক্ষ পল পরিমাণ পুষ্পরাগমণি, একলক্ষ গুণ শতপল গোমেদ, আধ-কোটি গুণ শতপল ইন্দ্রনীলমণি, নিযুত সংখ্যক শতপল মরকত, ন'কোটি গুণ শতপল বিদ্রুমরত্ন, অসংখ্য বিচিত্র-বিচিত্র মসৃণ বস্ত্র, বহু চামর, সুদগন্ধ-বিশিষ্ট দ্রব্য, অসংখ্য দাস-দাসী আর দ্রব্যসম্ভার নিয়ে গিরিজার অন্বেষণে বেরিয়ে বরণাতীরে উপস্থিত নয়ন-মনোহর বারাণসী দেখে সেখানে এলেন। অষ্ট মহাসিদ্ধির বিচিত্র ভূমিতে পদার্পণ করেই মণি-মাণিক্য আর রত্ননিচয় খোচিত প্রাসাদ, রাজপথ, প্রাকার, গৃহ, গো-পুর প্রভৃতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গিরিরাজ। ভাবলেন, স্বর্গ-মর্ত্য তো দূরের কথা, এই রাশিপ্রমাণ ঐশ্বর্য না আছে বৈকুণ্ঠে, এমন কি কুবেরেরও নেই। এই পুরী কোন ভাগ্যবানের হতে পারে?

যখন এইরকম চিন্তা পেয়ে বসেছে, গিরিরাজ এমন সময় দেখতে পেলেন এক কার্পটিককে। ডাকলেন তাকে, জিজ্ঞেস করলেন, এই পুরী কার? কে এর অধিষ্ঠাতা? এখানে অপূর্ব বস্তু বলতে কি আছে?

কার্পটিক বিস্ফারিত নেত্রে তাকালেন তাঁর দিকে, তারপর বললেন:

> "অহানি পঞ্চষাণ্যেব ব্যতিক্রান্তানি মানদ ॥
> সমায়াতে জগন্নাথে পর্ব্বতেন্দ্রসুতাপতৌ।
> সুন্দরান্মন্দরাদদ্রের্দিবোদাসে গতি দিবি ॥
> যো বৈ জগদধিষ্ঠাতা সোঽধিষ্ঠাতাত্র সর্ব্বগঃ।
> সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বগঃ শর্ব্বঃ কথং ন জ্ঞায়তে বিভো ॥" (৬৬/৬৬ ৬৮)

—হে মানদ্! পাঁচ ছ'দিন হল নৃপতি দিবোদাস স্বর্গে গমন করলে সুন্দর মন্দর পর্বত থেকে গিরিরাজ সুতাপতি জগন্নাথ (মহাদেব) এখানে প্রত্যাগমন করেছেন। যিনি জগতের অধিষ্ঠাতা, যাঁর গতি সর্বত্র, যিনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সেই গিরিজা-পতি মহেশ্বরই বর্তমানে এই পুরীর অধিষ্ঠাতা; আপনি যে তা জানেন না এটাই বড় বিস্ময়ের।

সেই গিরিজা-পতি মহেশ্বর এখন উমার সঙ্গে পরমানন্দ-চিত্তে জ্যেষ্ঠেশ্বর তীর্থে অবস্থান করছেন।

কন্যা গিরিজার নাম কার্পটিকের কাছে শুনে হর্ষান্বিত হয়ে উঠল

পর্বতরাজের পিতৃহৃদয়। রোমাঞ্চিত হল তনু। আরো শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন তিনি।

তাছাড়া, বিশ্বকর্মা-নির্মিত দেবেশের আবাস-প্রাসাদের মত এমন সর্বাঙ্গ-সুন্দর আবাস-প্রাসাদের সংবাদ-ও যে আপনি জানেন না, এটাও বড় আশ্চর্যের! সূর্যপ্রভা হতেও অধিক উজ্জ্বল মণিমাণিক্যাদি বহু-বহু রত্নময় শলাকা দিয়ে নির্মিত সেই প্রাসাদ-প্রাকার। চতুর্দশ ভুবনকে ধরে রাখার জন্যে বুঝিবা পুরীমধ্যে বিশ্বকর্মা যেখানকার যাবতীয় সৌন্দর্য এনে স্থাপন করেছেন একশো বারোটা স্তম্ভ। প্রতিটি স্তম্ভ নির্মিত চন্দ্রকান্ত মণি দিয়ে। তাতে শোভা পাচ্ছে ইন্দ্রনীল আর পদ্মরাগনির্মিত নানা নারীমূর্তি—আরত্রিরতা। তলদেশ পদ্মাকারে স্বচ্ছস্ফটিক প্রস্তরে নির্মিত। তার ওপর অপরূপ-ভাবে সজ্জিত নীল-লোহিত, পীতমঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের রত্নময় মূর্তি। সপ্ত-সমুদ্রের যাবতীয় রত্ন যেমন মহাদেবের গণেরা আহরণ করে এনে সেখানে স্তূপীকৃত করেছে, তেমনি পুঞ্জীকৃত করেছে নাগ'গণের কোষাগার থেকে আহৃত মণি। শিবভক্ত রাবণ নিজে অনুচরদের দিয়ে সুমেরু শৃঙ্গ থেকে অপরিমিত সোনা আনিয়ে প্রাসাদের অভ্যন্তরে তা শিখরাকারে সাজিয়ে রেখেছেন। মহাদেবের প্রাসাদ নির্মিত হচ্ছে শুনে, যার যা সামর্থ্য, সে তাই নিয়ে এসেছে এখানে। অনেক ভক্ত দিয়েছেন বিচিত্র-বর্ণের পতাকা। স্বর্গীয় কামধেনু প্রতিদিন এসে তাদের মধুময় দুধ দিয়ে লিঙ্গরূপী বিশ্বেশ্বরকে স্নান করায়। দই, ক্ষীর, আখের রস, ঘৃত-সমুদ্র প্রতিদিন পঞ্চামৃতের কলস দিয়ে তাঁর অভিষেক হচ্ছে। মলয়াচল নিজে মহেশ্বরের অঙ্গ চন্দনলিপ্ত করে তাঁর সেবা করে চলেছে,—আপনি এসব কিছুই জানেন না, বড়ই বিস্ময়ের। তবে একথাও ঠিক, তিনি স্বেচ্ছায় না জানালে, তাঁর মর্ম জানতে পারে, সাধ্য কার?

পুলকে-পুলকে রোমাঞ্চিত তনু গিরিরাজ জামাতা ঈশ্বরের এই অতুল বৈভবের কথা শুনে। যখন গিরিজাকে তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তখন বৃষভবাহন তাঁকে তিনি 'ঈশ্বর' নামে-মাত্রই জেনেছিলেন, আর কোন পরিচয়ই তিনি তাঁর জানতেন না। জানতেন শুধু, তাঁর

জামাতা 'ঈশ্বর' নিষ্কর্মা, এছাড়া আর কোন আচরণও তাঁর জানা ছিল না। এতদিনের এই পরিচয় আজ যে কার্পটিকের কৃপায় তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, এতে তার আনন্দ আর ধরে না।

মনে-মনে এই ভেবে উৎফুল্লিত হলেন গিরিরাজ যে তিনি নামে-মাত্র ঈশ্বর নন, তিনি পরমেশ্বর; গুণহীন নিষ্কর্মা নন, সর্বগুণাধার হয়েও ত্রিগুণাতীত, পর ও অপর।

"ভূধরাণামহং নাথো বিশ্বনাথ উমাপতিঃ ॥
অহং প্রমিতসম্পত্তিরপ্রমেয়ধমো হ্যসৌ।
তুচ্ছপ্রাভৃতকস্তস্মান্নেদানীমস্ত দর্শনম্ ॥
করিষ্যেঽথ করিষ্যামি ব্যাবৃত্তাগত্য কর্হিচিৎ।
সম্প্রধার্য্যেতি মনসি সায়ং স চ গিরীশ্বরঃ ॥" (৬৬/১১৩-১১৫)

—আমি কেবল পর্বতগণের রাজা, আর আমার উমাপতি বিশ্বনাথ। আমার সম্পত্তির পরিমাণ আছে, কিন্তু আমার জামাতার অপ্রমেয় সম্পত্তি, আমার আনীত এই সকল ধন অতি তুচ্ছ; এখন এঁর সাথে দর্শন না করে অন্য একদিন এসে দেখা করব।

তখন সন্ধ্যা। মনে-মনে স্থির করেই তিনি তার অনুচরদের ডেকে বললেন—'শোন, তোমরা সকলেই কর্মতৎপর। আমার আদেশ, রাত শেষ হয়ে সূর্যোদয়ের আগেই এখানে একটা শিবালয় তোমরা নির্মাণ কর।'

গিরিরাজের আদেশ—রজনী প্রভাত হবার আগেই তৈরী হয়ে গেল শিবালয়। উজ্জ্বল চন্দ্রকান্ত মণির এক শিবলিঙ্গ গিরিরাজ সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে, লিখে রাখলেন বিচিত্র অক্ষরে এক প্রশস্তি। তারপর পঞ্চনদ-হ্রদে স্নান সেরে কালরাজের অর্চনা করে, সেখানেই রত্নরাজি রেখে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দেই নিজালয়ে প্রস্থান করলেন।

সকালে হুণ্ডন, মুণ্ডন নামে দুই গণ বরণার তটে অদৃষ্টপূর্ব, রমণীয় শিবালয় দেখে যেমন বিস্মিত, তেমনি আনন্দিত হয়ে খবর দিতে ছুটল মহাদেবের কাছে।

সর্বজ্ঞ দেবাদিদেব সব শুনে, যেন কিছুই জানেন না, এমনি ভান করে, পার্বতীকে বললেন—'চল গিরিজা, আমরা এই শিবালয় দর্শন করে আসি।'

পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে মহাদেব এলেন বরণার তীরে। দেখলেন, একরাতের মধ্যে নির্মিত সেই অপূর্ব প্রাসাদ, অভ্যন্তরে, চন্দ্রকান্ত-শিলাময় অপূর্ব লিঙ্গ এবং প্রশস্তি পাঠ করে পার্বতীকে ডেকে বললেন —'তোমার পিতার কী অলোকসামান্য কাজ দেখ।'

শোনামাত্রই পার্বতী হলেন রোমাঞ্চিতা। তিনি মহাদেবকে প্রণাম করে পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গের মধ্যে সর্বদা অবস্থান করে, সকলের মোক্ষ বিধানের প্রার্থনা জানালে দেবদেব সম্মত হলেন।

পার্বতীও প্রসন্নচিত্তে প্রতিশ্রুতি দিলেন—'শৈলেশ্বরস্য যে ভক্তাস্তে মে পুত্রা ন সংশয়ঃ ;—এই শৈলেশ্বর লিঙ্গের যারা ভক্ত, তারা নিঃসন্দেহে হবে আমার পুত্রস্বরূপ।

শৈলেশ্বর লিঙ্গ দর্শন শেষে মহাদেব আর পার্বতীর দৃষ্টিপাত ঘটল ইন্দ্রধনুর প্রভায় আকাশমণ্ডল প্রদীপ্ত করা অদূরবর্তী এক রত্নময় লিঙ্গের দিকে। সেখানে এসে বিস্মিতা পার্বতী জিজ্ঞেস করলেন মহেশ্বরকে ঃ

> "দেবদেব জগন্নাথ সর্ব্বভক্তাভয়প্রদ।
> কুতস্ত্যমেতল্লিঙ্গং হি সপ্তপাতালমূলবৎ ॥
> জ্বালাজটিলিতাকাশং প্রভাভাসিতদিঙ্মুখম্।
> কিমাখ্যং কিং স্বরূপং চ কিম্প্রভাবং ভবান্তক ॥" (৬৭/১০-১১)

—হে সর্বভক্তের অভয়প্রদ দেবদেব জগৎপতি, এই সপ্তপাতাল-গামী মূল-সমন্বিত রত্নময় লিঙ্গটি কোথা হতে আবির্ভূত হল? জ্যোতি-শিখায় আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল প্রভাসিত এই লিঙ্গের কি নাম? এর স্বরূপ কি? প্রভাবই বা কি?

সর্বজ্ঞ দেবদেব মহেশ্বর বললেন, 'তোমার পিতা তাঁর পুণ্যার্জিত কিছু রত্ন সঙ্গে এনেছিলেন তোমার জন্যে। কিন্তু রত্নশালিনী, শেষ

পর্যন্ত তিনি তোমায় তা না দিতে পেরে এইখানে রেখে চলে গিয়েছিলেন। তুমি তো জানো, তোমার বা আমার জন্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে যা কিছুই এখানে আসুক না কেন, তা শুভ-পরিণামই লাভ করে। তোমার পিতার সেই পরিত্যক্ত রত্নরাজিই লিঙ্গরূপ ধারণ করে নির্বাণ-রূপ রত্ন দানকারী 'রত্নেশ্বর' লিঙ্গ নামে অভিহিত হবে। পার্বতী, তোমার পিতা যে রাশীকৃত সোনা এখানে ফেলে রেখে গেছেন, তা দিয়ে তুমি এই লিঙ্গের জন্যে একটা প্রাসাদ তৈরী করে দাও।'

দেবদেবের আজ্ঞামাত্রেই ভগবতী তাঁর সোমনন্দী-প্রমুখ গণদের ডেকে আদেশ দিলে মুহূর্তমধ্যে অতি বিচিত্র চিত্রিত এক প্রাসাদ নির্মিত হয়ে গেল।

তখন মহাদেব পার্বতীকে সেই সর্বসিদ্ধিপ্রদাতা গুহ্যতম রত্নেশ্বর লিঙ্গের প্রসঙ্গে বললেন ঃ

"লিঙ্গং ত্বমাদিসংসিদ্ধমেতদ্দেবি শুভপ্রদম্।
আবির্ভূতমিদানীঞ্চ ত্বৎপিতুঃ পুণ্যগৌরবাৎ॥" (৬৭/২৫)

—পরম শুভপ্রদ অনাদিসিদ্ধ এই রত্নেশ্বর লিঙ্গ, হে দেবি, তোমার পিতার অশেষ পুণ্যবলে এখানে আবির্ভূত হয়েছেন।

অনাদিসংসিদ্ধ এই লিঙ্গ সম্বন্ধে মহাশ্চর্যকর এক ইতিহাস আছে, শোন ঃ

বহুকাল আগে এইখানে নৃত্য গীত বাদ্যে সুনিপুনা কলাবতী নামে এক নর্তকী বাস করত। ফাল্গুন মাস। সেদিন শিবরাত্রি। সারারাত বিনিদ্র থেকে নৃত্য গীত বাদ্যে কলাবতী অর্চনা করেছিল রত্নেশ্বর লিঙ্গের। ফলে, দেহান্তে একই গুণ এবং অসামান্য রূপলাবণ্য নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করল গন্ধর্বরাজ বসুভূতির কন্যারূপে। কন্যাকে সর্ববিষয়ে গুণান্বিতা দেখে পিতার আনন্দের সীমা নেই। তার নাম হল রত্নাবলী। তার ছিল তিন সখী—শশিলেখা, অনঙ্গলেখা আর চিত্রলেখা। সবরকম কলাবিদ্যায় এই তিনজনও রত্নাবলীর তুলনায় কিছুমাত্র কম ছিল না।

জন্মান্তরের সংস্কারবলে সেই গন্ধর্বরাজকন্যা রত্নাবলী সেবা-

পরায়ণা হল এই রত্নেশ্বর লিঙ্গের। প্রতিদিনই সে তার সেই তিন সখীকে নিয়ে গন্ধর্বলোক থেকে এসে গীতে-গীতে অর্চনা করে যেত। একদিন রত্নাবলীর অর্চনা শেষ হয়েছে ; তিন সখী গেছে লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করতে, সেই অবকাশে আমি লিঙ্গমধ্য হতে তার সামনে একান্তে আবির্ভূত হয়ে তাকে এই বর দিয়েছিলাম যে,—আজ রাতে তুমি যার সঙ্গে রতিপরায়ণা হবে, সে-ই হবে তোমার স্বামী। তার নামের সঙ্গে থাকবে তোমার নামের সাদৃশ্য ! শুনে, যেমন লজ্জা অনুভব করেছিল রত্নাবলী, তেমনি মনে মনে অপার আনন্দও লাভ করেছিল।

আকাশপথে পিতৃগৃহে ফেরার সময় সখীদের কাছে নিজের সৌভাগ্যের কথা আর গোপন রাখতে না পেরে, বলে ফেলল সবকিছু। শুনে, সখীদের আনন্দ আর ধরে না। বললে—দ্যাখ, একই সঙ্গে আমরা যাই, অর্চনা করি। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে আর দর্শন হল না। আর তুমি কত না ভাগ্যবতী ! দর্শন পেলে বরও লাভ করলে। যাই হোক, যিনি আসবেন তোমার কাছে গোপনে রাতের অভিসারে, তুমি ভাই, তাকে তোমার বাহুলতায় বেঁধে রেখো, যাতে সকালে এসে আমরা দেখতে পাই। —এই বলে যে যার ভবনে চলে গেল।

পরদিন সকালে আবার মিলিত হল সখীরা। দেখেই মনে হল উপভুক্তা। কিন্তু সেই হর্ষ নেই ; নেই সেই উচ্ছ্বাস। নির্বাক রত্নাবলী। সেইভাবেই তারা প্রতিদিনের মত এল এই বারাণসীতে। গঙ্গায় স্নান করে রত্নেশ্বর লিঙ্গের দর্শন এবং স্তবাদি শেষে উৎসুক সখীদের কাছে রত্নাবলী বললে তার পূর্বরাত্রির বৃত্তান্ত।

অঙ্গ-সংস্কার এবং মনোরম বেশ-ভূষায় সজ্জিতা হয়ে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করে প্রিয় দর্শনাভিলাষে অতন্দ্রা ছিল রত্নাবলী। অপেক্ষমানার দুচোখ-জুড়ে যখন একসময় নেমে এল তন্দ্রা, তখনই সে অনুভব করলে এক অপরূপ অঙ্গস্পর্শ। একে তন্দ্রাবেশ, তার ওপর মদির তার দেহ-সংগমে এমনি অভিভূতা হয়ে পড়েছিল রত্নাবলী, যে লোপ পেয়ে গেল বাহ্যজ্ঞান। এমন সংজ্ঞা তখন তার আর ছিল না যে চোখ মেলে দেখে তার প্রিয়তমকে। তারপর, যখন প্রিয়তম তার

চলে যেতে উদ্যত হল, ঠিক সেই সময়েই সে প্রসারিত করলে তার দু'বাহু। বেজে উঠল এত জোরে তার হাতের বলয় কিঙ্কিনী যে, সেই স্বপ্নাবেশ গেল টুটে। চোখ মেলে শুধু বিরহানলই দেখল।

"কিংকুলীয়ঃ স নো বেদ্মি কিংদেশীয় কিমাখ্যকঃ।
দুনোতি নিতরাং সখ্যস্তদ্বিশ্লেষানলো মহান॥" (৬৭/৭০)

—কোন কুলে তিনি জাত, কোথায় তাঁর বাস, কী-ই বা তার নাম—কিছুই আমি জানতে পারিনি। এখন আমার হৃদয় জুড়ে কেবলমাত্র প্রিয়-বিরহের সন্তাপানল।

একমাত্র তোমরাই পার আমার এই বিরহজ্বালা জুড়াতে; আমার প্রিয়-মিলনে আমায় সাহায্য করতে। রত্নাবলীর এই আকুল আবেদন, তার ওপর তার মানসিক অবস্থা দেখে উৎকণ্ঠিতা হয়ে উঠল সখীরা। জানা নেই যাঁর কুল, যাঁর বাসস্থান, রত্নাবলীর কাছেও যিনি থেকে গেছেন অপরিচিত, কিভাবে তারা নেবে তার সন্ধান—সখীর সঙ্গে মিলন ঘটাবে তার?

সখীদের সংশয়াকুল দেখে রত্নাবলীর উৎকণ্ঠা গেল এতই বেড়ে যে সে হঠাৎ মূর্চ্ছা গেল। আতঙ্কিতা সখীরা যখন অনেক চেষ্টা করেও তার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাতে পারলে না, তখন নিয়ে এল রত্নেশ্বরের স্নানজল। আর সেই জল তার সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই সংজ্ঞা ফিরে পেল রত্নাবলী। আবার সেই বিরহজ্বালা।

শেষে রত্নাবলী নিজেই তার প্রিয়তমকে খুঁজে বের করার এক উপায় উদ্ভাবন করলে। ডাকলে তার কলানিপুণা সখীদের।

শশিলেখাকে বললে, স্বর্গবাসী তরুণ যুবকদের ছবি আঁকতে। অনঙ্গলেখাকে বললে, পৃথিবীতে যত তরুণ যুবক আছে, তাদের ছবি আঁকতে। আর চিত্রলেখাকে বললে, পাতাল-তলবাসী যত নবোপগত যুবক আছে, সে যেন তাদের ছবি আঁকে।

বুদ্ধি-চতুরা রত্নাবলীর অভিপ্রায় অনুসারে তিন সখীই সুনিপুণ তুলির টানে আঁকল ত্রিলোকের যত সুন্দর যুবক ছিল, তাদের প্রতিচ্ছবি। রত্নাবলী অভিনিবিষ্টা হল ছবিগুলির দিকে। স্বর্গ-মর্ত্যের

যাবতীয় ছবি নিরীক্ষণ করল রত্নাবলী। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়াই জাগল না তার মনে। দৈত্য দানব-গন্ধর্ব কুমার, যেখানে যত যুবক ছিল, কেউ-ই তার মনে কোন সাড়া জাগাতে পারল না। অতঃপর রত্নাবলী নিরীক্ষণ করতে লাগল পাতাল-তলবাসী নাগ-যুবকদের চিত্রপট। শেষ, তক্ষক, বাসুকিগোত্র, অনন্ত, কর্কট, ভদ্র প্রভৃতি নাগ-বংশজ যুবকদের ঔৎসুক্য-সহকারে অবলোকন করতে করতে শঙ্খচূড়-বংশজ এক নাগযুবকের ছবি অবলোকন করা মাত্রই, তার প্রতি তার দৃষ্টি গেল নিবদ্ধ হয়ে। সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে বিদ্যুৎ-লতার মত খেলতে শুরু করল আবেশ-বিহ্বল লজ্জা। মহাচতুরা চিত্রলেখার তখন বুঝতে বাকি রইল না। পরিহাস-ছলে সে সঙ্গে-সঙ্গেই বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে ঢেকে দিল সেই পটলেখা। নির্বাক রত্নাবলী অস্ফুট অধরে কুটীল কটাক্ষ করল চিত্রলেখার দিকে। শশিলেখার ইঙ্গিতে অনঙ্গলেখা সেই চিত্রপট থেকে বস্ত্রাঞ্চল অপসারিত করলে রত্নাবলীর দৃষ্টি আবার নিবদ্ধ হল সেই যুবকের দিকে। কুসুম-শরে তাকে ক্রমশই পীড়িতা হয়ে উঠতে দেখে চিত্রলেখা তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে :

"এতস্যাবগতং সর্ব্বং দেশনামান্বয়াদিকম্।
মা বিষীদালি সুলভস্তেষ রত্নেশ্বরার্পিত ॥" (৬৭/১১০)

—এঁর নাম, ধাম, কুল, সবই আমি জানি, সখী। বিষণ্ণ হোয়ো না। রত্নেশ্বর-অর্পিত তোমার এই পতি অনায়াসলভ্য।

এই বলে প্রায় অবশতনু রত্নাবলীকে নিয়ে সখীরা আকাশমার্গে হল গৃহাভিমুখী। পথিমধ্যে পাতালবাসী দানব সুবাহু তাদের দেখতে পেয়ে, সিংহ যেমন হরিণীকে ধরে নিয়ে যায়, সেইভাবে তাদের সকলকেই ধরে নিয়ে গেল নিজের আবাসে। দানবের এই অতর্কিত আক্রমণ আর বলপূর্বক অপহরণে ভীতা হয়ে পরল অসহায়া রত্নাবলী আর তার তিন সখী। এখানে এই অবস্থায় তাদের আরাধ্য দেব রত্নেশ্বর ছাড়া আর কে রক্ষা করতে পারে। তাই তারা চোখের জলে আকুল আবেদন জানাতে লাগল রত্নেশ্বরকে। পাতালোদ্ভূত দেবতার নাম করে এই বিলাপ অলক্ষ্যে বিচলিত করে তুলল নাগরাজ রত্নচূড়কে।

উৎকর্ণ হলেন রত্নচূড়। কানে এল বালাকণ্ঠের বিলাপ। কালবিলম্ব না করে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাইরে বেরিয়েই ক্রন্দনধ্বনি অনুসরণ করে গিয়ে দেখতে পেল রসাসবপানে মত্ত দানবাধম সুবাহুকে। শিষ্টাচার বিমুখ দানবকে লক্ষ্য করে নাগরাজ সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করলেন আর সুবাহুও ঘোর বিক্রমে চন্দ্রচূড়কে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করল গদা। কিন্তু রত্নেশ্বর যার সহায়, এ জগতে কে তার ক্ষতি করতে পারে? নিক্ষিপ্ত মুষল ছিন্ন হল বানে। বানে বিদ্ধ হয়ে বিকটাকার দানব প্রাণহীন দেহ নিয়ে লুটিয়ে পরল। নিক্ষিপ্ত বান সুবাহুর বক্ষ বিদীর্ণ করে আবার ফিরে গেল রত্নচূড়ের তূণীরে।

দানবের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বটে রত্নাবলী আর সখীরা, কিন্তু তাদের চিত্ত ছিল এমনি ভয়বিহ্বল যে, কোনমতেই তারা নাগরাজকে স্মরণ-পথে আনতে পারল না। অপরূপ হৃদয়-হরণকারী দেহকান্তি নিয়ে নাগরাজ রত্নচূড় তাদের সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চাইছে তাদের পরিচয়। মনে হচ্ছে তাদের অতি চেনা, তবু কিছুতেই চিনতে না পেরে নিজেদের পরিচয় থেকে শুরু করে রত্নেশ্বরের প্রসাদে রত্নাবলীর সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের সব কাহিনী বলে, জানতে চাইল তারা সেই যুবকের পরিচয়।

রত্নচূড় নিজ পরিচয় সেই মুহূর্তে গোপন রেখে জানতে চাইল তারা রত্নেশ্বর দর্শনে যাবে কিনা। সম্মতি জানালে রত্নচূড় তাদের, নিয়ে এল এক ক্রীড়া বাপীতটে। বলল, এতে অবতরণ কর। মণি-নির্মিত বিচিত্র সোপান, হংস-চক্রবাক-জলচর-বিহঙ্গম সমাকুল-সেই বাপীজলে নাগরাজের আদেশমত বস্ত্রাচ্ছাদন, গাত্রালংকার-সহ নিমজ্জিত হল তারা। তারপর উঠেই যা দেখল তাতে তাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই। দেখল, কাশীতে কালরাজের কাছে রত্নেশ্বর মন্দিরে তারা। কেমন করে এই অসম্ভব সম্ভব হল? যাদু নয় তো? সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল তারা চারদিকে। ঐ তো সামনেই উত্তর-বাহিনী গঙ্গা, শঙ্খচূড়বাপী আর আলয়, পঞ্চনদ তীর্থ, বাগীশ্বরীর মন্দির, শঙ্খচূড়েশ্বর শিবলিঙ্গ! ঐ তো সিদ্ধাষ্টকেশ্বর, সিদ্ধাষ্টক কুণ্ড, মধ্যমেশ্বর

লিঙ্গ, বৃদ্ধকালেশ্বরের প্রাসাদ।

দেখতে-দেখতে যখন তারা অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ল সেই সময়ে সেখানে সহসা ক্ষিপ্রগতিতে এসে উপস্থিত হলেন গন্ধর্বরাজ বসুভূতি। দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েই তিনি ছুটে এসেছিলেন এখানে। নারদ তাঁকে সব কিছুই বলেছিলেন। তিনি এসেই কন্যাকে সস্নেহে আদর করে তার কাছ থেকে আবার সবকিছু জানতে চাইলে রত্নাবলী শুধু তাঁকে দানব-অপহরণের আর এই যুবকের উদ্ধার কাহিনীই বললে, বাকি যা কিছু সব গোপন করে গেল। কিন্তু, শশীলেখা গন্ধর্বরাজকে সমুদায় বৃত্তান্তই শুনিয়ে দিলে।

গন্ধর্বরাজের সঙ্গে যখন সখী-সহ কন্যার আলাপ হচ্ছিল, তখন কিন্তু রত্নচূড় সেখানে ছিল না। সে গিয়েছিল দেবালয়ে রত্নেশ্বরের অর্চনা করতে। রত্নচূড় প্রতিদিনই তার নাগলোক থেকে এই বাপীমার্গ, যে-পথে রত্নাবলী আর সখীদের নিয়ে এসেছে, এই পথ, অবলম্বন করে আসত রত্নেশ্বরের মন্দিরে; মন্দাকিনীর জলে স্নান করত। আট অঞ্জলি রত্ন দিয়ে পূজা করত, তারপর আটটি সোনার পদ্ম প্রদান করে লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করত। তার এই পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব একদিন তাকে স্বপ্নাবেশে দর্শন দিয়ে বর দিয়েছিলেন, তুমি নিজবীর্যে এক দানবকে নিধন করে একটি কন্যারত্ন লাভ করবে। সে-ই হবে তোমার পত্নী। হঠাৎ সেই বরের কথা স্মরণে এল রত্নচূড়ের।

লিঙ্গের অর্চনা, প্রদক্ষিণ সেরে মন্দির হতে রত্নচূড় নিষ্ক্রান্ত হতেই সখীরা গন্ধর্বরাজকে অঙ্গুলী নির্দেশে দেখিয়ে দিল তাদের উদ্ধার-কর্তাকে। দেখলেন গন্ধর্বরাজ। বিমোহিত হলেন যুবককে দেখে। তারপর তার বংশ পরিচয়াদি নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে রত্নেশ্বরের সামনেই নিজ দুহিতাকে সম্প্রদান করলেন তার হাতে। অতঃপর তাকে নিয়ে গেলেন গন্ধর্বলোকে। আর সেখানে নিয়ে গিয়ে বিধি-অনুযায়ী মাঙ্গলিক কাজ সমাপ্ত করলেন। রত্নাবলীর তিন সখী—শশিলেখা, অনঙ্গলেখা, চিত্রলেখা-ও পিতাদের অনুমতি নিয়ে রত্নচূড়কে পতিত্বে বরণ করল। রত্নচূড়-ও একসঙ্গে চারটি গন্ধর্বকন্যাকে নিয়ে

নিজালয়ে ফিরে সুখে জীবন অতিবাহিত করেছিল।

রত্নাবলীর এই কাহিনী বিশ্বেশ্বর গিরিজাকে শুনিয়ে বললেন :

"গুপ্তমাসীদিদং লিঙ্গমন্ত যাবৎ সুমধ্যমে ॥
তব পিত্রা হিমবতা মম ভক্তেন সর্ব্বথা।
পুণ্যার্জ্জিতৈর্মহারত্নৈ রত্নেশঃ প্রকটীকৃতঃ ॥" (৬৭/২১২-১৩)

—অয়ি সুমধ্যমে! এ যাবৎ এই লিঙ্গ ছিল গুপ্ত। আমার সর্ব-সময়ের ভক্ত তোমার পিতা হিমবান পুণ্যার্জিত অনন্ত রত্নের দ্বারা এঁকে প্রকাশ করেছেন।

এই লিঙ্গেরই পূর্বে, পার্বতী, তুমি 'দাক্ষায়নীশ্বর' নামে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলে। সেখানে তুমি হলে 'অম্বিকা গৌরী' আর আমি 'অম্বিকেশ্বর'। তারই কাছে বিদ্যমান তোমার পুত্র ষড়ানন।

স্কন্দ বললেন মুনি অগস্ত্যকে—দেব মহেশ্বর যখন পার্বতী সমীপে রত্নেশ্বর-লিঙ্গের পুরাকাহিনী নিয়ে আলাপরত, হঠাৎ চতুর্দিক থেকে উত্থিত হল আর্তরব 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!' সচকিত হয়ে দেবদেব দেখলেন, প্রমথগণকে মথিত করে বীর্যমদে মত্ত মহিষাসুর-পুত্র গজাসুর উন্মত্তের মত এগিয়ে আসছে। নহাজার যোজন লম্বায় আর চওড়াতে প্রায় তদনুরূপ গজাসুর গতিপথে পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, দিঙমণ্ডল ধূলিজালে আবৃত করে, মেদিনীর বুকে কম্পন তুলে পিঙ্গলনেত্রে প্রায় সৃষ্টি-বিধ্বংসী। মহেশ্বর জানতেন, ব্রহ্মার বরে বলীয়ান সে, কাম-পরায়ণ কোন পুরুষ বা স্ত্রীর হাতেই সে বধ্য নয়। তখন তিনি নিজেই তাকে তাঁর ত্রিশূলাগ্রে বিদ্ধ করলেন।

বিদ্ধ গজাসুর এই বরণীয় মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে বললে—'হে ত্রিশূলপাণি! আমার এই মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েও বলি, আপনি আমার কাছে পরাজিত। কেননা, আপনার ত্রিশূলাগ্রে আপনারই মাথার ওপর আমি ছত্রধারী হয়ে অবস্থান করছি।'

গজাসুরের কথা শুনে ঈষৎ হাসলেন দেবদেব। তারপর বললেন—'তোমার মনোগত অভিলাষ প্রার্থনা কর। আমি তা পূরণ করব।' গজাসুর তখন প্রার্থনা জানাল—'হে দিগ্বাস! আপনি অনুগ্রহ করে আমার এই কৃত্তি (গাত্রচর্ম) পরিধান করুন। আপনার ত্রিশূলাগ্নিতে এখন এটি পবিত্র হয়েছে। এখন আপনার কৃপায় রণাঙ্গণের পণস্বরূপ আমার এই কৃত্তি ইষ্টগন্ধী, কোমল এবং শোভনকারক হ'ক। আর 'নামাস্তু কৃত্তিবাসাস্তে প্রারভ্যাদ্যতনং দিনম্'—আর আজ থেকে আপনার নাম হক 'কৃত্তিবাস'।'

স্কন্দ বললেন, দেবদেব মহাদেব গজাসুরের প্রার্থনায় সঙ্গে-সঙ্গে সম্মতি জানালেন আর অবিমুক্তক্ষেত্রে রণে ত্যক্ত-দেহ গজাসুরকে সেই লিঙ্গে পরিণত করে নাম রাখলেন 'কৃত্তিবাসেশ্বর'। আর বললেন:

"রুদ্রাঃ পাশুপতাঃ সিদ্ধা ঋষয়স্তত্ত্বচিন্তকাঃ।
শান্তা দান্তা জিতক্রোধা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥
অবিমুক্তে স্থিতা যে তু মম ভক্তা মুমুক্ষবঃ।
মানাপমানয়োস্তুল্যাঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনাঃ॥
কৃত্তিবাসেশ্বরে লিঙ্গে স্থাস্যেঽহং তদনুগ্রহে।" (৬৮/৩২-৩৪)

—অবিমুক্তক্ষেত্রে যাবতীয় রুদ্র, পাশুপত, সিদ্ধ, তত্ত্বচিন্তক ঋষি আছে, যারা শান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ, মুমুক্ষু, মান-অপমান যাদের কাছে তুল্য; লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চন-এ যারা সমদর্শী, আমি এই কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গে অবস্থান করব, তাদের অনুগ্রহ করার জন্য।

দেবাদিদেব আরো বললেন, কলি ও দ্বাপরযুগে মানবকুল হবে অতীব নীচাশয়। সদাচারহীন, সত্য ও শৌচে পরাঙ্মুখ হয়ে, মায়া, দম্ভ, লোভ, মোহ আর অহঙ্কারে তারা হবে সমাচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণেরা লোলুপ আর লালসাসক্ত হয়ে শূদ্রান্নসেবী হবে; সন্ধ্যা, স্নান, জপ, যজ্ঞ তাদের মন থেকে দূরীভূত হবে। তবুও তারা যদি কৃত্তিবাসেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তবে অবশ্যই সর্বপাপ বিবর্জিত হবে।

দেবদেব দিগম্বর মহেশ্বর এই বলে গজাসুরের বিশাল চর্ম মহা-

উৎসব-সহকারে পরিধান করলেন। সে স্থানে শূলে আরোহিত হয়ে গজাসুর ছত্রীকৃত হয়েছিল, সেখান থেকে শূল উৎপাটন করতেই, উৎপন্ন হল এক বিশাল কুণ্ড। আশ্চর্য সেই কুণ্ডে একদিন এক ঘটনা ঘটেছিল।

সেদিন চৈত্র-পূর্ণিমা। কৃত্তিবাসেশ্বরের মহোৎসব। সমাগত ভক্তবৃন্দ। রাশীকৃত অন্নের উপহার। অন্ন দেখে নানা পাখি সেখানে এসে উপস্থিত হল। সুরু হল অন্ন-সংগ্রহের প্রতিযোগিতা। সুরু হল কাকেদের মধ্যে লড়াই। হৃষ্টপুষ্ট বলবান কাকদের চঞ্চুর আঘাতে প্রায় বিগত-প্রাণ হয়ে শূণ্য থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল কাকেরা পড়তে লাগল নীচে, সেই কুণ্ডজলে। সকলেই দেখল, পড়া-মাত্রই তারা হংসরূপ ধারণ করে জলে সাঁতরাতে লাগল। সেই থেকে এই তীর্থ হল 'হংসতীর্থ'।

স্কন্দদেব অতঃপর মহামুনি অগস্ত্যকে বললেন, হে কলসসম্ভব! এই তীর্থ অনাদিসিদ্ধ। মহেশ্বরের সান্নিধ্যেই আবার এই তীর্থ প্রকটিত হয়েছে। শুধু তাই নয়—

"এতানি সিদ্ধলিঙ্গানিচ্ছন্নানি স্যুর্যুগে যুগে।
অবাপ্য শম্ভুসান্নিধ্যং পুনরাবির্ভবন্তি হি॥" (৬৮/৬৪)

—এইরকম আরও সিদ্ধলিঙ্গ আছে, যা যুগে যুগে তিরোহিত হয়। আবার শম্ভুর সান্নিধ্যে পুনরায় আবির্ভূত হয়ে থাকে।

এই হংসতীর্থের চতুর্দিকে দুশো অযুতের বেশী শিবলিঙ্গ আছে। সবকটিই মুনিশ্রেষ্ঠদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কাত্যায়নেশ্বর থেকে চ্যবনেশ্বর প্রতিটি লিঙ্গই সিদ্ধিপ্রদ। কৃত্তিবাসেশ্বরের পশ্চিমে লোমশেশ্বর, উত্তরে মালতীশ্বর, ঈশানদিকে অন্তকেশ্বর, তার পাশে জনকেশ্বর। এই জনকেশ্বরের উত্তরে 'অসিতাঙ্গ' ভৈরব।

কৃত্তিবাসেশ্বরের উত্তরে বিকটলোচনা দেবী শুষ্কোদরী; দেবীর নৈর্ঋতে 'অগ্নিজিহ্ব' বেতাল। এখানেই সেই বেতাল-কুণ্ড; যার জল ব্রণ আর বিস্ফোটক জ্বালা নিবারণ করে। এইখানেই পাপবুদ্ধিদের বিনাশ এবং ধর্মবুদ্ধিদের রক্ষার জন্য বৃষাকার চতুঃশৃঙ্গ, দ্বিশীর্ষ, ত্রিপাদ, সপ্তহস্ত ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তি অবস্থান করছেন। এই রুদ্রের উত্তরে আছেন

[অধ্যায় ৬৯—৭০]

অতঃপর দেব ষড়ানন মহামুনি অগস্ত্যকে কাশীর মোক্ষপ্রদ শিবলিঙ্গ-সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন, যা তিনি শুনেছিলেন মাতৃ-পিতৃ সকাশে অবস্থান কালে।

যেখানে দেবাদিদেব গজাসুরের কৃত্তি বা চর্ম-আবরণ পরিধান করেছিলেন, সেই স্থানটির নাম হল 'রুদ্রাবাস'॥

একদিন মহেশ্বর উমার সঙ্গে অবস্থান করছেন সেই রুদ্রাবাসে, নন্দী এসে সপ্রণত নিবেদন রাখল দেবদেবের কাছে :

"ভূর্ভুবঃস্বস্তলে যানি শুভান্যায়তনানি হি।
মুক্তিদান্যপি তানীহ ময়া নীতানি সর্ব্বতঃ॥
যতো যচ্চ সমানীতং যত্র যচ্চ কৃতাস্পদম্।
কথয়িষ্যাম্যহং নাথ ক্ষণং তদবধার্য্যতাম্॥" (৬৯/৫-৬)

—হে দেবদেবেশ! স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে যেখানে যত আয়তন (তীর্থ) আছে সবই আমি এখানে এনেছি। যেখান থেকে যা এনেছি, হে নাথ, আমি বলছি, ক্ষণকাল অবধান করুন।

কুরুক্ষেত্র হতে এখানে এসে আবির্ভূত হয়েছেন দেবদেবের 'স্থাণু'-নামে মহালিঙ্গ আর তারই সামনে, লোলার্কের পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা কোটিগুণ বেশী ফলদায়ী 'সন্নিহতি' মহাপুষ্করিণী। বর্তমানে এটিই কুরুক্ষেত্র তীর্থ। নৈমিষক্ষেত্র হতে এসেছেন 'ব্রহ্মাবর্ত' কূপ-সহ 'দেবদেবাখ্য' লিঙ্গ। এটি অবস্থান করছেন ঢুণ্ঢিরাজের উত্তরে। গোকর্ণ হতে এসে কপালমোচনের সামনে সাম্বাদিত্যের কাছে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন 'মহাবল' লিঙ্গ। প্রভাস-তীর্থ থেকে এসে এখানে ঋণমোচন তীর্থের পূবে অবস্থান করছেন 'শশিভূষণ' লিঙ্গ। ওঁঙ্কারেশ্বর লিঙ্গের পূবে অবস্থান করছেন পাপনাশন 'মহাকাল'। পুষ্কর তীর্থে হতে এসেছেন

পুষ্করের সঙ্গে 'অয়োগন্ধেশ্বর' লিঙ্গ। অবস্থান করছেন মৎস্যোদরীর উত্তরে। অট্টহাস থেকে 'মহানাদেশ্বর' লিঙ্গ এখানে এসে অবস্থান করছেন ত্রিলোচনের উত্তরদিকে। কামেশ্বরের উত্তরে এসে অবস্থান করছেন মরুৎকোট থেকে 'মহৎকোটেশ্বর' লিঙ্গ।

বিশ্বস্থান থেকে 'বিমলেশ্বর' লিঙ্গ এখানে স্বর্লীনের পশ্চিমে অবস্থান করছেন। মহেন্দ্র-পর্বত থেকে স্কন্দেশ্বরের সন্নিকটে এসে অবস্থান করছেন 'মহাব্রত' মহালিঙ্গ।

"বৃন্দারকর্ষিবৃন্দানাং স্তবতাং প্রথমে যুগে।
উৎপন্নং যন্মহালিঙ্গং ভূমিং ভিত্ত্বা সুদুর্ভিদাম্॥
মহাদেবেতি তৈরুক্তং যন্মনোরথপূরণাৎ।
মারাণস্যাং মহাদেবস্তদারভ্যাভবচ্চ যৎ॥" (৬৯/২৬-২৭)

—সত্যযুগে দেবর্ষিগণের স্তুতিকালে সুকঠিন মৃত্তিকা ভেদ করে যে মহালিঙ্গ উৎপন্ন হয়েছিলেন, যেহেতু তিনি মনোরথ পূর্ণ করেছিলেন, তাই 'মহাদেব'নামে আখ্যাত হয়েছিলেন। সেই মহাদেব-লিঙ্গ তদবধি বারাণসীতেই অবস্থান করছেন।

হিরণ্যগর্ভ-তীর্থের পশ্চিমে সর্বরত্নময় প্রাসাদস্থিত মহাদেবই হলেন এই ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা ও রক্ষক। গয়াতীর্থ থেকে ফল্গু পর্যন্ত যে সাড়ে আট কোটি তীর্থ আছে, সেই তীর্থগুলির সঙ্গে 'পিতামহেশ্বর' লিঙ্গ এখানে আগমন করেছেন। এবং ধর্ম যে ধর্মেশ্বর লিঙ্গকে সাক্ষী রেখে একশ অযুত যুগ তপস্যা করেছিলেন, সেই স্থানে অবস্থান করছেন। প্রয়াগ-তীর্থ থেকে নির্বাণ-মণ্ডপের দক্ষিণে এসে অবস্থান করছেন 'শূলটঙ্ক' মহেশ্বর। বিনায়কেশ্বরের পূর্বদিকে অবস্থান করছেন মহাক্ষেত্র শঙ্কুকর্ণ থেকে এসে 'মহাতেজ' লিঙ্গ। রুদ্রকোটি নামক তীর্থ থেকে 'মহাযোগীশ্বর' লিঙ্গ এখানে এসে আবির্ভূত হয়েছেন পার্বতীশ্বর লিঙ্গের সন্নিকটে। এরই চতুর্দিকে রুদ্রগণের প্রাসাদনিচয়, যাকে বলা হয়ে থাকে 'রুদ্রস্থলী'। ভুবনেশ্বর ক্ষেত্র থেকে স্বয়ং কৃত্তিবাস এসে এখানে কৃত্তিবাস-লিঙ্গের মধ্যে অবস্থান করছেন। পাশপাণি গণপতির সন্নিকটে এসে অবস্থান করছেন মরুজাঙ্গল থেকে 'চণ্ডীশ্বর' লিঙ্গ।

কালঞ্জর তীর্থ থেকে ভগবান 'নীলকণ্ঠ' এসে অবস্থান করছেন দণ্ডকূট গণপতির সামনে।

কাশ্মীর থেকে এসেছেন 'বিজয়েশ্বর' লিঙ্গ। ইনি অবস্থান করছেন শালটঙ্কটের পূবে। ভগবান 'উর্দ্ধরেতা' কুষ্মাণ্ডক গণপতির সামনে এসে অবস্থান করছেন ত্রিদণ্ডাপুরী থেকে। মণ্ডলেশ্বর ক্ষেত্র থেকে 'শ্রীকণ্ঠ' লিঙ্গ আগমন করে রয়েছেন মণ্ড-নামক বিনায়কের উত্তরে। পিশাচমোচন-তীর্থে ছাগলাণ্ড তীর্থ থেকে এসেছেন 'কপর্দীশ্বর'। বিকটদন্ত-গণপতির সমীপে এসে অবস্থান করছেন আম্রাতকেশ্বর থেকে স্বয়ং 'সূক্ষ্মেশ্বর' লিঙ্গ। মধুকেশ্বর থেকে 'জয়ন্ত' নামক মহালিঙ্গ এসে রয়েছেন লম্বোদর গণপতির সামনে। বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমে এসে অবস্থান করছেন শ্রীশৈল থেকে দেবদেব 'ত্রিপুরান্তক'। সৌম্যস্থান থেকে 'কুক্কুটেশ্বর' এসে রয়েছেন বক্রতুণ্ড গণপতির কাছে। কূটদন্ত গণপতির সামনে জালেশ্বর থেকে 'ত্রিশূলী', একদন্ত গণপতির উত্তরে রামেশ্বর থেকে 'জটিদেব', ত্রিমুখের পূবে ত্রিসন্ধ্যক্ষেত্র থেকে 'ত্র্যম্বক', হরিশ্চন্দ্রে-শ্বরের সামনে হরিশ্চন্দ্র ক্ষেত্র থেকে 'হরেশ্বর', চতুর্বেদেশ্বরের সামনে মধ্যমেশ্বর থেকে ভগবান 'শর্ব' এখানে এসে অবস্থান করছেন। আর এসেছেন স্থলেশ্বর থেকে 'যজ্ঞেশ্বর' মহালিঙ্গ।

জ্ঞানচক্ষুদাতা 'সহস্রাক্ষ' লিঙ্গ এখানে এসে অবস্থান করছেন শৈলেশ্বরের দক্ষিণে। হর্ষিতক্ষেত্র থেকে এসেছেন 'হর্ষিতেশ্বর' মন্ত্রেশ্বরের সন্নিকটে। রুদ্র-মহালয় ক্ষেত্র থেকে এসেছেন ভগবান রুদ্র, অবস্থান করছেন ত্রিপুরেশ্বরের সন্নিকটে। বাণেশ্বর লিঙ্গের কাছে বৃষধ্বজ ক্ষেত্র থেকে এসেছেন ভগবান 'বৃষেশ্বর'। প্রহ্লাদ-কেশবের পশ্চিমে অবস্থান করছেন কেদারক্ষেত্র থেকে এসে 'ঈশানেশ্বর'। খর্ব-বিনায়কের পূবে ভৈরব-তীর্থ থেকে মনোহর 'সংহার ভৈরব' এসেছেন। অর্ধ-বিনায়কের পূবে এসেছেন কনখল-তীর্থ থেকে 'উগ্র'। বস্ত্রাপথ মহাক্ষেত্র থেকে ভীমচণ্ডীর সন্নিকটে এসেছেন 'ভব'। দেবদারু বন থেকে ভগবান দণ্ডী বারাণসীতে এসে দেহলি-বিনায়কের পূবে লিঙ্গরূপে অবস্থান করছেন। ভদ্রকর্ণ হ্রদ থেকে 'ভদ্রকর্ণেশ্বর' শিবলিঙ্গ হ্রদ-সহ

এখানে এসেছেন। উদ্দণ্ড-গণপতির পূবে সেই শ্রেষ্ঠতীর্থ।

হরিশ্চন্দ্র-পুর থেকে 'শঙ্কর', যমলিঙ্গ নামক মহাতীর্থ থেকে 'কলসেশ্বর', নেপাল থেকে 'পশুপতি' করবীরক-তীর্থ থেকে 'কপালীশ্বর' দেবিকাপুর থেকে 'উমাপতি', মহেশ্বর ক্ষেত্র থেকে 'দীপ্তেশ্বর', কায়ারোহণ-ক্ষেত্র থেকে পাশুপত-ব্রতাবলম্বী স্বীয় শিষ্যগণ-সহ আচার্য 'নকুলীশ্বর' গঙ্গাসাগর থেকে 'অমরেশ্বর' লিঙ্গ, সপ্ত-গোদাবরী তীর্থ থেকে ভগবান 'ভীমেশ্বর', ভূতেশ্বর-ক্ষেত্র থেকে ভগবান 'ভস্মগাত্র', নকুলীশ্বর থেকে ভগবান 'স্বয়ম্ভু' এসে অবস্থান করছেন যথাক্রমে আপনার সামনে, চণ্ডেশ্বরের পশ্চিমে, কপালমোচন-তীর্থে, পশুপতীশ্বরের পূবে, উমাপতির সন্নিকটে, নকুলীশ্বরের পূবে আর মহালক্ষ্মীশ্বরের সামনে।

হে দেবাদিদেব! মন্দর-পর্বত থেকে ঋষি ও দেবগণ-সহ আপনি কাশীতে এসেছেন শুনে বিন্ধ্য পর্বত থেকে 'ধরণিবারাহ' এসে অবস্থান করছেন প্রয়াগতীর্থের কাছে। এই ধরণীবারাহের পশ্চিমে কর্ণিকার ক্ষেত্র থেকে গদাপাণি শ্রীমান গণপতি, গাণপত্য পদ লাভ করে অবস্থান করছেন। মহেশ্বরের দক্ষিণে এসে অবস্থান করছেন হেমকূট পর্বত থেকে ভগবান 'বিরূপাক্ষ'। গঙ্গদ্বার থেকে ব্রহ্মনালের পশ্চিমে এসে স্থিতি নিয়েছেন 'হিমাদ্রীশ্বর' লিঙ্গ।

কৈলাস পর্বত থেকে এখানে আগমন করেছেন গণাধিপ সাত কোটি অন্যান্য মহাবল গণনিচয়কে সঙ্গে নিয়ে।

"দুর্গাণি তৈঃ কৃতানীহ সপ্তস্বর্গসমানি চ।
সদ্বারাণি সযন্ত্রাণি কপাটবিকটানি চ॥
কোটিকোটিভটাঢ্যানি সর্ব্বর্দ্ধিসহিতান্যপি।
সুবর্ণরূপ্যতাম্রৈশ্চ কাংসরীতিকসীসকৈঃ॥
অয়স্কান্তেন কান্তানি দৃঢ়ান্যভ্রংলিহান্যপি।
ততঃ শৈলং মহাদুর্গং তৈঃ কাশীপরিতঃ কৃতম্॥
পরিখাপি কৃতা নিম্না মৎস্যোদর্য্যা জলাবিলা।
মৎস্যোদরী দ্বিধা জাতা বহিরন্তশ্চরা পুনঃ॥

তচ্চ তীর্থং মহৎখ্যাতং মিলিতং গাঙ্গবারিভিঃ।
যদা সংহারমার্গেণ গঙ্গাম্ভঃ প্রসরেদিহ॥
তদা মৎস্যোদরীতীর্থং লভ্যতে পুণ্যগৌরবাৎ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ পর্ব্ব তদা কোটিগুণং শতম্॥" (৬৯/১৩৩-১৩৮)

—হে প্রভো! তারা (গণানিচয়) এখানে এসে স্বর্গ সমান সাতটি দুর্গ নির্মাণ করেছেন। সেই সমস্ত দুর্গে বহুতর বিকটাকার কপাট-সমূহে আবদ্ধ দ্বার এবং অস্ত্রনিক্ষেপের যন্ত্রসমূহও নির্মিত হয়েছে। সোনা-রূপা-তামা-কাঁসা-পিতল-সীসা দিয়ে দুর্গগুলি নির্মিত। অয়স্কান্ত মণির সমান প্রতিটি দুর্গের প্রভা, দুর্গগুলি যেমন অতি দৃঢ়, তেমনি অতি উঁচু। তারপরে কাশীর চতুর্দিকে তারা এক শৈল-দুর্গও নির্মাণ করেছেন। একটি গভীর পরিখাও খনন করে তারা তা মৎস্যোদরীর জলে পূর্ণ করেছেন। বহিশ্চর এবং অন্তশ্চর-রূপে মৎস্যোদরীও সেখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন। গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে মৎস্যোদরী তীর্থ অতি শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাত। যখন গঙ্গাজল দক্ষিণে সঞ্চারিত হয়ে এই তীর্থে এসে মেলে, তখন এই তীর্থলাভ অতিশয় পুণ্যবলেই হয়ে থাকে। সেখানে সে-সময়ে শতকোটি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের পবিত্রতা এসে বিরাজিত হয়।

গন্ধমাদন পর্বত থেকে 'ভূর্ভুবঃ'-নামে লিঙ্গ এখানে এসে এই গণপতির পূবে অবস্থান করছেন। ভোগবতীর সঙ্গে ভগবান 'হাটকেশ্বর' সপ্ত-পাতাল ভেদ করে এখানে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর রত্নসমূহে অলঙ্কৃত সুবর্ণময় অবয়ব নিয়ে। শেষ ও বাসুকি প্রভৃতি নাগেরা মণি-মাণিক্য দিয়ে এখানে তার প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছেন। তারালোক থেকে এসেছেন তারকজ্ঞান-দাতা জ্যোতির্ময় লিঙ্গ 'তারকেশ্বর'। তিনি অবস্থান করছেন জ্ঞানবাপীর সামনে। যে স্থানে আপনি কিরাত-রূপ ধারণ করেছিলেন সেই কিরাত-ক্ষেত্র থেকে ভগবান 'কিরাতেশ্বর' এখানে এসে অবস্থান করছেন তারভূতেশ্বরের পিছনে। লঙ্কাপুরী থেকে 'মরুকেশ্বর' লিঙ্গ এখানে এসে নৈর্ঋতদিকে পৌলস্ত্য-রাঘবের পিছনে 'নৈর্ঋতেশ্বর' নামে অবস্থিত হয়েছেন।

"পুণ্যং জলপ্রিয়ং লিঙ্গং জললিঙ্গং স্থলাদপি।
আয়াতং তচ্চ গঙ্গায়া জলমধ্যে ব্যবস্থিতম্॥" (৬৯/১৬১)

—স্থল লিঙ্গ হতে পবিত্র জললিঙ্গ; 'জলপ্রিয়' লিঙ্গ এখানে এসে গঙ্গাজলমধ্যে অবস্থান করছেন। গঙ্গামধ্যে তাঁর প্রাসাদ সর্বধাতু ও সর্বরত্নময়। কোটীশ্বর তীর্থ থেকেও এসেছেন শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ, অবস্থান করছেন জ্যেষ্ঠেশ্বরের পিছনে। নলেশ্বরের সামনে এসে অবস্থান করছেন জ্বালামুখী থেকে 'অনলেশ্বর' লিঙ্গ। বিরজতীর্থ থেকে দেবদেব ত্রিলোচন এখানে এসে অনাদিসিদ্ধ 'ত্রিবিষ্টপ' লিঙ্গে অবস্থান করছেন। অমরকণ্টক থেকে 'প্রণবেশ্বর' এখানে পিলিপিলা তীর্থে অবিভূত হয়েছেন।

"তদাস্থাং তারকক্ষেত্রং যদা গঙ্গা ন চাগতা।
যদৈবাবিরভূৎ কাশী ত্রৈলোক্যাদ্ধরণায় বৈ॥
তদাকৃতি মহল্লিঙ্গং স্বয়মাবিরভূত্ততঃ।
মহিমানং ন তস্যান্যঃ পরিবেত্তি বিভোঋতে॥" (৬৯/১৬৮-১৬৯)

—হে প্রভো! যখন গঙ্গাও এখানে আসেন নি, কেবল ত্রৈলোক্য উদ্ধারের জন্য কাশী আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই থেকেই এই লিঙ্গের (প্রণবেশ্বর) আবির্ভাবের কারণে এই ক্ষেত্র 'তারকক্ষেত্র' নামে বিখ্যাত হয়েছেন। প্রণবাকৃতি সেই মহালিঙ্গ যা স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন, হে বিভো! আপনি ছাড়া আর কেউ-ই তার মহিমা অবগত নন।

সবদিক থেকেই এই সব পুণ্য আয়তন স্বক্ষেত্রে একভাগ রেখে সমুদায় অংশ নিয়েই এখানে আপনার অনুজ্ঞায় এসে অবস্থান করছেন। বললেন নন্দী। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, তার আর কি করণীয় আছে।

দেবদেব তখন তাঁকে বললেন:

"নবকোট্যস্তু চামুণ্ডা যা যত্র নিবসন্তি হি।
স্বদেবতাভিঃ সহিতা ভূতবেতালভৈরবৈঃ॥
তাঃ পুরীরক্ষণার্থায় সবাহনবলায়ুধাঃ।
প্রতিদুর্গং দুর্গরূপাঃ পরিতঃ পরিবাসয়॥" (৬৯/১৭৭-৭৮)

—নন্দী, ন'কোটি চামুণ্ডার মধ্যে যিনি যেখানে অবস্থান করছেন, তাঁদের সকলকেই নিজ নিজ আয়ুধ, বাহন, দেবতা, ভূত, বেতাল, ভৈরব-সহ এখানে এনে প্রতি দুর্গের চারদিকে অবস্থান করিয়ে এই পুরী রক্ষা করাও।

স্কন্দ বললেন, অগস্ত্য! নন্দীও প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে যে-সব দেবীদের অবিমুক্তক্ষেত্রে পুরী রক্ষায় নিযুক্ত করেছিলেন, এবার তার ইতিবৃত্ত বলছি, শোন।

অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসীর পরম ইষ্টদাত্রী দেবী হলেন 'বিশালাক্ষী'। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী অবস্থান করছেন পিছনে গঙ্গায় 'বিশাল-তীর্থ' ক্ষেত্রে। গঙ্গা-কেশবের সন্নিকটে ললিতা-তীর্থ। এখানে ক্ষেত্ররক্ষাকারিণী-রূপে রয়েছেন 'ললিতা' দেবী। বিশালাক্ষী দেবীর পুরোভাগে ক্ষেত্রনিবাসী ভক্তগণের বিঘ্ননিচয় সংহার করছেন 'বিশ্বভূজা' নামে গৌরী দেবী অবস্থান করে। কাশীতে ক্রতুবারাহের সন্নিকটে অবস্থান করছেন আপদনাশিনী 'শিবদূতী'—ইনি উর্ধ্বহস্ত, ত্রিশূলধারিণী। ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থান করছেন গজরাজোপরি স্থিতা বজ্রহস্তা 'ইন্দ্রাণী'। স্কন্দেশ্বরের সন্নিকটে ময়ূরবাহনা 'কৌমারী'। মহেশ্বরের দক্ষিণে বৃষভবাহিনী 'মাহেশ্বরী'। নির্বাণ-নরসিংহের সন্নিকটে সুদর্শন চক্রহস্তা 'নারসিংহী'। ব্রহ্মেশ্বরের পশ্চিমে আত্মজ্ঞানাভিলাষী ব্রাহ্মণ ও যতিদের ব্রহ্মবিদ্যা-দায়িনী হংসবাহনা 'ব্রাহ্মী'। তৎপরে গোপিগোবিন্দের পশ্চিমে 'নারায়ণী'। ইনি উর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন করে তর্জনী দিয়ে চক্র ঘোরাচ্ছেন আর শার্ঙ্গধনু হতে শরনিক্ষেপ করে কাশীর বিঘ্নসমূহ দূর করছেন।

দেবযানীর উত্তরে 'বিরূপাক্ষী' গৌরী, শৈলেশ্বরের সন্নিকটে তর্জনী উত্তোলনকারিণী দেবী 'শৈলেশ্বরী'। অতঃপর আছেন 'চিত্রঘণ্টা' দেবী। ধর্মচ্যুতি এবং পাতকি হলেও কাশীতে চিত্রকূপে স্নান, চিত্রগুপ্তেশ্বরের দর্শন অতঃপর চিত্রঘণ্টা দেবীর পূজা করলে সে ভক্ত কখনই চিত্রগুপ্তের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। চিত্রাঙ্গদেশ্বরের পূবে যম-যাতনা নিবারণকারিণীদেবী 'চিত্রগ্রীবা'। ভদ্রনাগের পুরোভাগে

আছেন 'ভদ্রকালী'। সিদ্ধি-বিনায়কের পূবে 'হরসিদ্ধি' এবং বিধিশ্বরের সন্নিকটে অবস্থান করছেন দেবী 'বিধি'। প্রয়াগ-তীর্থের পাশে নিগড়-মোচনা দেবী 'নিগড়-ভঞ্জনী'। পশুপতীশ্বরের পিছনে অমৃতেশ্বরের নিকটে দেবী 'অমৃতেশ্বরী'—দক্ষিণহস্তে অমৃত-কমণ্ডলু আর বামহস্ত অভয়দায়িনী। অমৃতেশ্বরের পশ্চিমে প্রপিতামহেশ্বরের পুরোভাগে জগৎপালিকা 'সিদ্ধলক্ষ্মী'। প্রপিতামহেশ্বরের পশ্চিমে নলকুবর-লিঙ্গের পুরোভাগে জগন্মাতা 'কুব্জাদেবী'। এইখানেই অপর এক দেবী অবস্থান করছেন তিনি হলেন 'ত্রিলোকসুন্দরী' গৌরী। সাম্বাদিত্যের সমীপে রয়েছেন মহাশক্তি 'দীপ্তা'।

শ্রীকণ্ঠের সন্নিকটে জগজ্জননী 'মহালক্ষ্মী'। তাঁর উত্তরে দেবী 'হয়কণ্ঠী', দক্ষিণে পাশহস্তা 'কৌর্ম্মী', তার বায়ুকোণে দেবী 'শিখীচণ্ডী' অবস্থান করছেন। পাশ এবং মুদ্গরহস্তে কাশীর উত্তরদ্বার রক্ষা করছেন ভীমেশ্বরের পুরোভাগে অবস্থান করে দেবী 'ভীমচণ্ডী'। বৃষভধ্বজের দক্ষিণে ক্ষেত্রের বিঘ্ননিচয়রূপ তরুপল্লবসমূহ ভক্ষণকারীণী দেবী 'ছাগবক্ত্রেশ্বরী'। তালবৃক্ষের অস্ত্র ধারণ করে সঙ্গমেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থান করছেন 'তালজঙ্ঘেশ্বরী'। ইনি আনন্দ-ভবনের ভিতরের বিঘ্নরাশি দূর করছেন। উদ্দালকেশ্বরের দক্ষিণে উদ্দালক-তীর্থে অবস্থান করছেন দেবী 'যমদংষ্ট্রা'।

পূর্বদিক থেকে ক্ষেত্রের বিঘ্নসমূহকে সতত রক্ষা করছেন দারুকেশ্বর-এর কাছে দারুকেশ্বর তীর্থে অবস্থান করে দেবী 'চর্মমুণ্ডা'। শুষ্কোদরা স্নায়ুবদ্ধা, কুটিলোজ্জ্বল-নয়না, অনন্ত-বাহু এই দেবীর একহাতে কপাল অপর হাতে ছুরি ; পাতালে তাঁর তালু ও বদন, আকাশে তাঁর ওষ্ঠ, পৃথিবীতে তাঁর অধর। পরিধানে হস্তিচর্ম, আননে সতত বিকট হাস্য। মৃণাল-নালের মত পাপিদের অস্থিনিচয় তিনি অনবরত চর্বন করে চলেছেন। কপালমালাই তাঁর আভরণ। লোলার্কের উত্তরে হয়গ্রীবেশ্বর তীর্থে অনুরূপ আর এক দেবী আছেন। তাঁর নাম 'মহারুণ্ডা'। ইনিও প্রচণ্ডবদনা কিন্তু কবন্ধমালী। এই দুই দেবার মধ্যস্থলে মুণ্ডরূপিনী 'চামুণ্ডা' দেবী অবস্থান করছেন।

মহারুণ্ডা দেবীর পশ্চিমে দেবী 'স্বপ্নেশ্বরী' আর এই শুভা দেবীর পশ্চিমে অবস্থান করে ক্ষেত্রের দক্ষিণভাগ সতত রক্ষা করছেন দেবী দুর্গা।

[অধ্যায় ৭১—৭২]

মিত্রাবরুণ-তনয় অগস্ত্য অতঃপর প্রশ্ন রাখেন ষড়াননের কাছে, দেবীর 'দুর্গা' নাম কিভাবেই বা হল আর কিভাবেই বা তিনি কাশীতে পূজনীয়া হলেন ?

ষড়ানন বললেন, পুরাকালে রুরু-নামে এক দৈত্য ছিল। তার পুত্রের নাম ছিল দুর্গ। সেই অসুর দুর্গ কঠোর তপস্যাবলে পুরুষ-মাত্রেরই অজেয় হয়ে একসময় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের অধীশ্বর হয়ে বসল। মদগর্বে সে এমনি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে, সে নিজেই একাধারে ইন্দ্র, বায়ু, চন্দ্র, যম, অগ্নি, বরুণ, কুবের, ঈশান, রুদ্র, সূর্য, বসুগণের পদ গ্রহণ করে সর্বময় হয়ে উঠেছিল। তার ভয়ে যতিগণ তপস্যা পরিত্যাগ করেছিলেন, ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ণ থেকে বিরত থাকতেন। তার অনুচরেরা যাবতীয় যজ্ঞশালা বিনষ্ট করে দিয়েছিল। সেই দুরাত্মা স্বর্গবাসী দেবগণকে বনবাসী করেছিল। দেব আর ঋষিপত্নীদের নিজ কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। তার অনুচরেরা কত সতী-সাধ্বীর সতীত্ব যে নাশ করেছিল তার ইয়ত্তা নেই। ভয়ে দিগাঙ্গনারাও বেশভূষা পরিত্যাগ করে নিজেদের মলিন আচ্ছাদনে ঢেকে রাখত। যেমন পরস্বাপহরণে তাদের দৌরাত্ম্য ছিল অপরিসীম, তেমনি, তাদের দৌরাত্ম্যে নদীসমূহ গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। তারাই মায়াবলে মেঘ হয়ে বারিবর্ষণ করত। বীজ রোপিত না হলেও বসুন্ধরা তার ভয়ে শস্য প্রসব করতে বাধ্য হতেন, বৃক্ষসমূহও ফলভারে অবনত থাকতে বাধ্য হত।

রাজ্যভ্রষ্ট দেবগণ এই অবস্থায় শরণাপন্ন হলেন সাক্ষাৎ মহেশ্বরের।

মহেশ্বর তাকে বিনাশ করার জন্য পাঠালেন দেবী ভবানীকে। ভবানী দেবতাদের অভয় দিয়ে কালরাত্রিনাম্নী ত্রৈলোক্যসুন্দরী রুদ্রাণীকে আহ্বান করে ডাকতে পাঠালেন সেই অসুর দুর্গকে।

কালরাত্রি দৈত্যাসুরের কাছে গিয়ে বললেন—'দৈত্যরাজ, এই মদগর্বিত ভোগলিপ্সা পরিত্যাগ করে, ইন্দ্রকে এই ত্রিভুবনের আধিপত্য দিয়ে নিজের আবাস রসাতলে গমন কর। আর যদি তা না করে গর্বোদ্ধত হও, তাহলে আমার স্বামিনী মহাদেবীর সঙ্গে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও। দেবীর এই বার্তাই নিয়ে এসেছি তোমার কাছে।'

শুনে একদিকে ক্রোধারুণ-লোচন আর একদিকে কালরাত্রির রূপ-লাবণ্যে লোলুপ হয়ে উঠল দৈত্যরাজ। অন্তঃপুরচারী দাসীদের ডেকে প্রমত্তস্বরে বললে—'আমার সৌভাগ্যবলেই এমন এক নারীরত্ন স্বেচ্ছায় আমার গৃহে এসেছে। তোমরা একে ধরে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও।'

বাধা দিলেন কালরাত্রি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে। বললেন, 'দৈত্যরাজ; তুমি রাজনীতিজ্ঞ। আমি সামান্যা একজন দূতী। তোমার মত অধিপতির কী দূতের প্রতি এই আচরণ শোভনীয়? আমার মত সামান্যা এক দূতীর প্রতি তোমার মত অধিপতির কী এমন অনুরাগ সাজে? আমার স্বামিনীকে রণে পরাজিত করতে পারলে আমার মত হাজার রমণীকে তুমি স্বেচ্ছাধীন ভোগ করতে পারবে। তাঁকে দেখলে অন্তরে তুমি যেমন সুখ লাভ করবে, তোমার চিরবাঞ্ছিত মনোভিলাষও সফল হবে। অবলা আমাদের কর্ত্রী সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। আমি তোমার সঙ্গে থেকেই তোমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখিয়ে দেব। তুমি অধীর না হয়ে তোমার এই অন্তঃপুর-রক্ষীদের আমায় ধরতে বারণ কর।'

কালরাত্রির এত কথা শুনেও কাম-ক্রোধে দৈত্যপতি দুর্গ এতই আত্মহারা হয়েছিল যে, তখন অন্য কোন নারীর চিন্তাই তার মধ্যে আর ছিল না। তাই নিবারণ করল না অন্তঃপুর-রক্ষীদের। নিরুপায় দেবী তখন একটি মাত্র হুঙ্কার-ধ্বনি তুললেন। সেই ধ্বনি অনল হয়ে

যাবতীয় রক্ষীদের ভস্মীভূত করে ফেলল। দৈত্যপতি তখন তার দুর্দ্ধর, দুর্মুখ, খর-প্রমুখ অযুত অসুরকে ডেকে বললে,—'ঐ নারীকে উন্মুক্ত-কবরী, বিবস্ত্রা করে পাশে বেঁধে নিয়ে এসো।' আদেশ-মাত্রেই সেই অসুরেরা উদ্যত হলে, দেবী এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। সেই নিঃশ্বাস-বায়ু প্রবল বাত্যার বেগে উড়িয়ে নিয়ে গেল গিরিপ্রমাণ সশস্ত্র অসুরদের। তারপর দেবী সে স্থান থেকে নির্গত হবার জন্যে নভোমার্গ অবলম্বন করলেন। অসুরগণও গগণমার্গ সমাচ্ছন্ন করে সশস্ত্রে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলে। দৈত্যাধিপ দুর্গ-ও শতকোটি রথ, দুশো অর্বুদ পরিমিত হস্তী, বায়ুবেগী কোটি অর্বুদ পরিমিত অশ্ব আর সব দুরন্ত শক্তিশালী এবং দুর্দান্ত পদাতি-সমূহ নিয়ে সরোষে যুদ্ধ যাত্রা করল।

অনন্তর প্রত্যক্ষীভূতা হলেন মহাদেবী বিন্ধ্যাচলবাসিনী। কালরাত্রিও উপনীতা হলেন তাঁর সামনে, নিবেদন করলেন দৈত্যের অভিসন্ধি।

দৈত্যাধিপ দুর্গ দেখলে মহাদেবীকে। দেখলে, ভুজ-সহস্র-সমান্বিতা মহামায়া ভীষণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিতা, রণোল্লাসে উল্লসিতা। অনন্ত সুধাকিরণে যেন পরিপ্লাবিত তাঁর কমনীয় মুখমণ্ডল। অপরূপ লাবণ্যের কিরণজালে বেষ্টিত তাঁর জ্যোৎস্না-ধবল অনুপম কান্তি। তাঁর অঙ্গভূষণ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে মণি-মাণিক্যের দ্যুতি। মহাদেবের নয়নানলে ভস্মীভূত কন্দর্পের পক্ষে তিনি যেন মূর্তিমতী জীবনৌষধি-লতা। জগতের যাবতীয় মোহসঞ্চারিণী সৌন্দর্যের এমন সমাহার আর নেই। দেখা মাত্রই কামশরে জর্জরিত হয়ে উঠল দুর্গ। জম্ভ, মহাজম্ভ, কুজম্ভ, বিকটানন, লম্বোদর প্রভৃতি তার অসুরশ্রেষ্ঠদের ডেকে আদেশ দিল সে ঃ

"ভবৎস্বেতেষু চান্যেষু য এতাং বিন্ধ্যবাসিনীম্।
ধৃত্যা নেষ্যতি বুদ্ধ্যা বা বলেনাপি ছলেন বা॥
তস্যাহমিন্দ্রপদবীমদ্য দাস্যাম্যসংশয়ম্।
দৃষ্ট্বৈতাং সুন্দরীমদ্য মনো মে ব্যাকুলং ভবেৎ॥" (৭১/৭৪-৭৫)

—তোমাদের মধ্যে যে ধৃতি বা বুদ্ধি বা বল বা ছল, যে কোন

উপায়ে বিন্ধ্যবাসিনীকে ধরে এনে দিতে পারবে, তাকেই আজ আমি নিশ্চয়ই ইন্দ্রত্ব প্রদান করব। এই সুন্দরীকে দেখে আমার চিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হয়েছে।

কন্দর্পশরজর্জরিত প্রায় বিহ্বল দৈত্যাধিপ দুর্গের আদেশ শুনে এবং অবস্থা দেখে দৈত্যগণ বললে—'হে মহারাজ! সামান্যা এই এক রমণীর জন্যে আপনার এত আকুতির কোন প্রয়োজন আছে কি? স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল আপনার অধীন। ঊর্ধ্ব চার-লোক মহ-জন-তপ সত্য—তা-ও আপনার অধিকারে। ত্রিভুবনজয়ী আমরা আপনার আদেশে স্বয়ং ইন্দ্রকে তার অন্তঃপুরচারিণীসহ আপনার পায়ের তলায় এনে ফেলে দিতে পারি। স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ নিয়ত আপনার আদেশ মেনে চলেছেন। তাঁর যে-সমস্ত রমণীয় রত্ন ছিল, তিনি হাসিমুখে তা সবই পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে। আমরা স্বেচ্ছায় কৈলাস-অধিপতিকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি পান করেন বিষ। এতই গরীব যে ছাই-ভস্ম, গজচর্ম আর সাপ-ছাড়া তাঁর অন্য কোন ভূষণ নেই। একটিমাত্র স্ত্রী। তাকেও আবার আমাদের ভয়ে নিজের অর্ধাঙ্গে মিশিয়ে রেখেছেন। তাঁর আবাসভূমিতে একটির বেশী দুটি চতুষ্পদ জন্তু নেই। যে একটা আছে সেটা-ও আবার বুড়ো ষাঁড়। তাঁর যারা অনুগত সঙ্গী তাদেরও পরণে কৌপীন, বিভূতিমাখা দেহ, জটাধারী, শ্মশানবাসী। তাদের নিয়ে এসেই বা আমাদের কি লাভ হবে। তাই একমাত্র তাদেরই আমরা পরিত্যাগ করে রেখেছি। সমুদ্রগণ প্রত্যেক দিনই আপনার জন্যে রত্নরাশি পাঠাচ্ছে; নাগেরা প্রতি সন্ধ্যায় তাদের ফণার রত্নে প্রদীপ জ্বালছে। কল্পবৃক্ষ, কামধেনু, চিন্তামণিসমূহ আপনার অনুগ্রহের অপেক্ষায় এখানেই রয়েছে। বায়ু-বরুণ-অগ্নি প্রত্যেকেই আপনার সেবা করে চলেছে। আপনার প্রসাদলাভের অপেক্ষায় এ বিশ্ব চরাচরে কে নেই? আর এই নারী তো সামান্যা। একটু ধৈর্য্য ধরুন। আমরা জোর করে ওকে ধরে আনছি।'

এই বলে সেই মহাবল অসুরেরা গগনবিদারী রণভেরীধ্বনিতে চতুর্দিক এমনি আকুল করে তুলল যে, সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হল, গগনচ্যুত হল

তারকারাশি, বসুন্ধরা কাঁপতে লাগল, ভীত-ত্রস্ত হলেন দেবগণ। তখন দেবী ভগবতী নিজ শরীর থেকে শ'য়ে-শ'য়ে হাজারে-হাজারে ত্রৈলোক্য-বিজয়া, তারা, ক্ষমা, ত্রিপুরা প্রভৃতি ন'কোটি শক্তি উৎপন্ন করলেন। তারা দোর্দণ্ড অসুরদের প্রতিটি অস্ত্র হেলায় প্রতিরোধ করে চললেন দেখে জম্ভ-প্রমুখ দৈত্যেরা সক্রোধে দেবীদের ওপর বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় অসি, চক্র, ভুশুণ্ডী, গদা, মুদ্গর, তোমর, ভিন্দিপাল, কুন্ত, শল্য, শক্তি প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র থেকে সুরু করে গাছ, পাথর পর্যন্ত নিক্ষেপ করতে লাগল। বিন্ধ্যবাসিনী দেবী মহামায়া প্রচণ্ড কোদণ্ড গ্রহণ করে বায়ব্যাস্ত্রের দ্বারা অক্লেশে অসুরদের অস্ত্রহীন করে দিলে, স্বয়ং দৈত্যরাজ দুর্গ প্রজ্বলিত এক দুরন্ত শক্তি নিক্ষেপ করলে দেবীকে লক্ষ্য করে। কার্মুকে বাণ-সংযোজন করে দেবী তা হেলায় চূর্ণ করে দিলেন। দুর্গাসুর তখন তার অন্যতম মহা অস্ত্র চক্র নিক্ষেপ করলে, দেবীও তা মাঝপথেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। তখন দৈত্যরাজ ইন্দ্রধনুতুল্য স্বীয় সার্ঙ্গধনু তুলে দেবীর হৃদয় লক্ষ্য করে এক শর নিক্ষেপ করলে। প্রতিরোধ-প্রয়াস সত্ত্বেও সেই শর দেবীর দিকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসছে দেখে দেবী তখন কোদণ্ডদণ্ডে অপর এক বাণ যোজনা করে কালদণ্ড-সদৃশ সেই বাণকে রোধ করলেন। অনিবার্য সেই বাণকেও প্রতিহত হতে দেখে তখন জ্বালানল-সদৃশ এক শূল নিক্ষেপ করলে দেবীর দিকে। দেবী সেটিও মাঝপথে বিচূর্ণ করে দিলে, দৈত্যরাজ সক্রোধে নিজের বিশাল গদা নিয়ে সবেগে এসে আঘাত হানলে দেবীর বাহুমূলে। সেই গদাও বাহুমূল স্পর্শ করার সঙ্গে-সঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলে, দেবী তাকে নিজের বা-পা দিয়ে এত জোরে তার বুকে আঘাত হানলেন যে দৈত্যরাজ ভূমিতে নিপতিত হল। আর দেবীর শক্তিরা মৃত্যুসেনার মত দানব-সৈন্য মথিত করে চলল। এদিকে দুর্গ তখনি উঠে সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল।

দৈত্যরাজ দুর্গ এবার ভূমিতল ত্যাগ করে আশ্রয় নিল উপরে মেঘের আড়ালে। সেখান থেকে শুরু করে দিল তীব্রবেগে শিলাবৃষ্টি।

দেবী তা নিবারণ করলেন শোষণাস্ত্র প্রয়োগ করে। দৈত্যপতি এই আক্রমণও প্রতিহত হল দেখে শৈলশিখর-সমূহ উৎপাটন করে আকাশ থেকে সজোরে নিক্ষেপ করতে শুরু করলে, দেবী বজ্রাস্ত্র দিয়ে তা-ও খণ্ড-খণ্ড করে প্রতিহত করলেন। বারবার সুদারুণ আঘাত-সমূহ ব্যর্থ হতে দেখে দুর্গাসুর আর স্থির থাকতে না পেরে তার কুণ্ডলদ্বয়-শোভিত মস্তক সরোষে আন্দোলন করতে-করতে শৈলাকৃতি এক গজরূপ নিল দেবীর সামনে। তারপর উন্মত্তের মত প্রধাবিত হল দেবীর দিকে। দেবীও কালবিলম্ব না করে পাশাস্ত্র দিয়ে তাকে বেঁধে শুণ্ড ছেদন করে দিলেন। তখন দুর্গাসুর ধরলে ক্ষিপ্ত মহিষরূপ। এই রূপে সে তখন খুরের আঘাতে পর্বতকে যেন সচল করে তুলতে লাগল, শিঙ্ দিয়ে বিশাল-বিশাল শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করতে লাগল চতুর্দিকে। সঘন নিঃশ্বাসে তার উৎপাটিত হয়ে পড়তে লাগল মহীরুহের দল। সাগর-জল উদ্বেল হয়ে উঠল। তার তীব্র পদ সঞ্চালনে কম্পমানা হল ত্রিলোক। ভীত-ত্রস্ত নিখিলকে দেবী আশ্বস্ত করলেন মহিষরূপী দুর্গাসুরকে ত্রিশূলের আঘাতে। প্রচণ্ড সেই আঘাতে ভূপাতিত দুর্গাসুর মুহূর্তে মহিষরূপ পরিত্যাগ করে দেবীর সামনে আবির্ভূত হল সহস্রবাহুতে সহস্র আয়ুধ নিয়ে অতি ভীষণাকৃতি মূর্তিতে। আবির্ভূত হয়েই নিমেষমধ্যে দেবীকে কুক্ষিগত করে উঠে পড়ল শূণ্যে। তারপর সেখান থেকে সজোরে দেবীকে নীচে নিক্ষেপ করে শরজালে তাঁকে এমনভাবে ঢেকে ফেলল যে, দেবীকে তখন দেখে মনে হচ্ছিল যেন মেঘমধ্যে সুপ্ত বিদ্যুন্মালা। তারই মধ্যে দেবী নিজের শরনিকর দিয়ে দুর্গাসুরের শরসমূহকে বিচ্ছিন্ন করে এমন এক দিব্য মহাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন যে তা দৈত্যরাজের হৃদয় বিদীর্ণ করে দিলে। সেই ভীম আঘাতে বিদীর্ণ-হৃদয়, যাতনা-বিকল, ঘূর্ণিত-লোচন দানব দুর্গ রক্তের নদী প্রবাহিত করতে-করতে নিস্পন্দ দেহে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নিখিল জগৎ। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি নির্ভয়ে আপন-আপন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হল পুষ্পবৃষ্টি। ঋষিগণের সঙ্গে দেবগণও সেই সর্বশক্তিময়ী, সর্বশক্তিস্বরূপিনী মহামায়া,

জগদ্ধাত্রীর মহাস্তুতি করলেন। এই স্তুতি দেবীর প্রসাদে সর্ববিপদ-নাশন 'বজ্রপঞ্জর' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল।

ঋষি-গন্ধর্ব চারণগণের সঙ্গে ইন্দ্রাদি দেবতারাও দেবীর স্তব সমাপ্ত করলে, দেবী তাঁদের নিজ-নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে বললেন:

"অদ্যপ্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।
দুর্গ দৈত্যস্য সমরে পাতনাদতি দুর্গমাৎ॥" (৭২/৭১)

—দারুণ সংগ্রামে দুর্গ-নামক এই দৈত্যকে পরাভূত করার ফলে আজ থেকে জগতে 'দুর্গা' নামে আখ্যাত হব।

সেই দেবী দুর্গা তাঁর শক্তিদের নিয়ে কাশীক্ষেত্রের রক্ষাবিধান করছেন এবং পূজিতা হচ্ছেন। দুর্গাকুণ্ডে স্নান করে বিধান-অনুসারে দুর্গতিহারিণী দুর্গার অর্চনা করলে মানব ন'জন্মার্জিত পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে থাকে।

কাশীক্ষেত্রের মাঝে অবস্থান করে পূর্বদিক সংরক্ষণ করছেন আরও ন'জন দেবী—শতনেত্রা, সহস্রাস্যা, অযুতভূজা, অশ্বারূঢ়া, গজাস্যা, ত্বরিতা, শব-বাহিনী, বিশ্বা আর সৌভাগ্যগৌরী।

এই নির্বাণক্ষেত্র সর্বদা রক্ষার জন্য আছেন আটজন ভৈরব—রুরু, চণ্ড, অসিতাঙ্গ, কপালী, ক্রোধন, উন্মত্তভৈরব, সংহার-ভৈরব আর ভীষণ-ভৈরব। এঁদের সঙ্গে আছেন মুণ্ড-কবন্ধমালা পরিহিত, কুঠার, খর্পর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র হস্তে, বিশাল দন্ত, প্রকাণ্ড বাহুযুক্ত, রুধিরাস্য। বিমুক্তকেশ, দিগ্বসন, শোনিতাসব পানে প্রমত্ত স্বানুরূপ কোটি-কোটি অনুচর-বেষ্টিত নানা আকৃতির মহাভীষণমূর্তি কুকুর-বাহন চৌষট্টি বেতাল। অগস্ত্য, এদের মধ্যে কয়েকটা নাম বলছি শোন। বিদ্যুজ্জিহ্ব, লোলজিহ্ব, ক্রুরাস্য, ক্রুরলোচন, উগ্র, বিকটদংস্ট্র, বক্রাস্য, বক্রনাসিকা, জম্ভক, জ্বালানেত্র, বৃকোদর, খর্বগ্রীব, মহাহনু প্রভৃতি।

ত্রৈলোক্যবিজয়া থেকে শুরু করে জ্বালামুখী পর্যন্ত যে শক্তিরা আয়ুধ হস্তে দুর্গাসুরের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন, তারা নিজ নিজ অস্ত্র-সহ সব-সময়ই কাশীর চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে এই অবিমুক্তক্ষেত্রের যাবতীয় বিঘ্ন নাশ করছেন।

[অধ্যায় ৭৩]

ষড়ানন স্কন্দ বললেন, কাশীক্ষেত্র জুড়ে যখন লিঙ্গসমূহের অবস্থান বিবৃত হবার পর দেবী জিজ্ঞেস করেছিলেন—হে দেবদেব, মোক্ষলক্ষ্মীর গৃহস্বরূপ এই কাশী আপনার যেমন প্রিয়, আমার কাছেও তেমনি প্রীতিপ্রদ। এখানে যে সমুদায় লিঙ্গ আছেন সকলেই মুক্তির কারণ, স্বয়ম্ভু—সংশয় নেই, তবুও "কাশ্যামনাদিসিদ্ধানি কানি লিঙ্গানি শঙ্কর ॥ যত্র দেবঃ সদা তিষ্ঠেৎ সংবর্তেঽপি সবল্লভঃ। যৈরিয়ং প্রথিতিং প্রাপ্তা কাশী মুক্তিপুরীতি চ ॥" (১২-১৩)—হে শঙ্কর ! কাশীতে কোন কোন লিঙ্গ অনাদিসিদ্ধ ? সেই সমুদায় লিঙ্গে আপনার সঙ্গে আমার নিত্য অধিষ্ঠানের ফলে এই কাশী 'মুক্তিপুরী' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে, তাঁদের কথা বিশেষরূপে বলুন।

দেবদেব বললেন—ব্রহ্মা, নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণও যা জানেন না, সেই অতি গুহ্য কথা তোমায় বলছি শোন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব, যক্ষ, চারণ, রাক্ষস, মানব, দানব, উরগ, অপ্সরা প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামে এখানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে সংখ্যাতীত সেই সব লিঙ্গের মধ্যে কতকগুলি রত্নময়, কতকগুলি ধাতুময়, বেশীর ভাগই প্রস্তরময়, অনেকগুলিই স্বয়ম্ভু। এক সময় আমি গণনা করে দেখেছিলাম তাঁদের সংখ্যা ছিল পরার্ধশত (এক কোটির একশো গুণ)। তার পরেও আমার ভক্তেরা এখানে এত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন যে তা গুণে শেষ করা যায় না। এঁদের মধ্যে প্রণবেশ্বর, ত্রিলোচন, মহাদেব, কৃত্তিবাস, রত্নেশ্বর, চক্রেশ্বর, কেদারেশ্বর, ধর্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্মেশ্বর, মণিকর্ণিকেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর এবং বিশ্বেশ্বর— আমার এই চোদ্দটি মহালিঙ্গ এবং সবকটিই নিঃশ্রেয়স। "এতেষাং সমবায়োঽহং মুক্তিক্ষেত্রমিহেরিতম্"—এদের সমবায়ের কারণেই এই ক্ষেত্র—মুক্তিক্ষেত্র।

শোনার পর অগস্ত্য কাশীতে আরো মুক্তিপ্রদ লিঙ্গের পরিচয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলে দেবদেব মহেশ্বর দেবী পার্বতীকে যা বলেছিলেন, তা শোনাতে লাগলেন। দেবদেব বলেছিলেন, হে পার্বতী! এক একটি ভুবনের সার গ্রহণ করে অবিমুক্তক্ষেত্রের হৃদয়-স্বরূপ আরও চোদ্দটি মুক্তিপ্রদ লিঙ্গ আমি রক্ষা করছি। সেগুলি হলেন—অমৃতেশ্বর, তারকেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর, করুণেশ্বর, মোক্ষদ্বারেশ্বর, স্বর্গদ্বারেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, লাঙ্গলেশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর, বৃষেশ্বর, চণ্ডীশ্বর, নন্দিকেশ্বর, মহেশ্বর আর জ্যোতীরূপেশ্বর। এগুলি ছাড়াও মুক্তিপ্রদ আরো চোদ্দটি লিঙ্গের সন্ধান দিয়েছিলেন দেবদেব, দেবী পার্বতীকে। সেগুলি হল—শৈলেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, স্বর্লীনেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, হিরণ্য-গর্ভেশ্বর, ঈশানেশ্বর, গোপ্রেক্ষেশ্বর, বৃষভধ্বজ, উপশান্তশিব, জ্যেষ্ঠেশ্বর, নিবাসেশ্বর, শুক্রেশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, আর জম্বুকেশ্বর।

বলে, দেব বলেছিলেন ঃ

"ক্ষেত্রস্যোপনিষচ্চৈষা মুক্তিবীজমিদং পরম্।
কর্ম্মকাননাদাবাগ্নিরেষা লিঙ্গাবলিঃ প্রিয়ে॥"—(৭৩/৬৭)

—হে প্রিয়ে এই ক্ষেত্রের এই হল উপনিষদ ও মুক্তির পরম বীজ। এই লিঙ্গগুলিই কর্মরূপ কাননের পক্ষে দাবানল-স্বরূপ।

সোৎসুকে দেবী এবার ক্রমানুসারে প্রতিটি লিঙ্গের ইতিবৃত্ত জানতে চাইলে, প্রথমে প্রণবেশ্বর সম্পর্কে মহাদেব বললেন ঃ

"কথামাকর্ণয়াপর্ণে বর্ণয়ামি তবাগ্রতঃ।
যথোঙ্কারস্য লিঙ্গস্য প্রাদুর্ভাব ইহাভবৎ॥" (৭৩/৭৬)

—হে অপর্ণে! যেভাবে এই ক্ষেত্রে ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গের আবির্ভাব হয়েছে, তা বলছি, শোন।

কোন এক সময় ব্রহ্মা এই আনন্দ-কাননে কঠোর তপস্যায় রত হলেন। এই নিশ্চল তপস্যায় যখন তাঁর হাজার যুগ অতিক্রান্ত তখন একদিন তাঁর সামনে আবির্ভূত হল সপ্তপাতাল ভেদ করে এক মহাজ্যোতি। প্রকাশমান সেই তেজের শব্দে ধীরে ধীরে নিমীলিত-নেত্র ব্রহ্মা সমাধি থেকে উঠে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখলেন আদ্যক্ষর

'অ'-কার—সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ঋকৃক্ষেত্র, তমঃপারে প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিপালক সাক্ষাৎ নারায়ণাত্মক। তারই সামনে দেখলেন অন্ধ তমসানুভূতির সদন-স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ বিধাতৃস্বরূপ রজোরূপ যজুঃক্ষেত্র। তার সামনে দেখলেন, তমোরূপ সামক্ষেত্র 'ম'-কার-কে, লয়ের কারণ রুদ্ররূপে। তার পুরোভাগে দেখলেন ঃ

"বিশ্বরূপময়াকারং সগুণং বাপি নির্গুণম্।
অনাখ্যনাদসদনং পরমানন্দবিগ্রহম্॥
শব্দব্রহ্মেতি যৎ খ্যাতং সর্ব্ববাঙ্ময়কারণম্।
অথোপরিষ্টান্নাদস্য বিন্দুরূপং পরাৎপরম্॥" (৭৩/৮৬-৮৭)

—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপ সগুণ অথচ নির্গুণ অনাখ্য নাদ-সদন, পরমানন্দ বিগ্রহ, বাঙ্ময়তনু যিনি শব্দব্রহ্মরূপে খ্যাত; তাঁর উপরে নাদের পরাৎপর বিন্দুরূপ।

কারণসমূহেরও আদিকারণ এবং জগতের উৎপত্তিস্থল, রক্ষক সেই পরমার্থ 'প্রণব'-রূপে নির্দিষ্ট হলেন।

ব্রহ্মা দেখলেন—যাঁর অনুশীলনে ভক্তগণ উন্নত হয় 'ওম্'-কে; দেখলেন—জাপকগণের সংসার-সমুদ্র হতে তারণকারী 'তার'-কে; দেখলেন—নির্বাণাভিলাষী ব্যক্তির দ্বারা যিনি সর্বাপেক্ষা বিশেষরূপে স্তুত হন, সেই 'প্রণব'-কে; দেখলেন—পরমপদে আনয়নকারী পরাৎপরকে।

"ত্রয়ীময়স্তুরীয়ো যস্তুর্য্যাতীতোঽখিলাত্মকঃ।
নাদবিন্দুস্বরূপো যঃ স প্রৈক্ষি দ্বিজগামিনা॥" (৭৩/৯৩)

—যিনি ত্রয়ীময়, তুরীয়, তুর্য্যাতীত, অখিলাত্মক, নাদবিন্দুস্বরূপ, ব্রহ্মা তাঁকেই দর্শন করলেন।

দর্শন করলেন ব্রহ্মা বেদেরও আদিপুরুষকে, পরমাত্মাকে তেজোময় বৃষভরূপে যিনি মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং কল্প—এই ত্রিবিধ বন্ধনে বারবার রোদন করেছিলেন। দর্শন করলেন সেই দেবকে—যাঁর চারটি শৃঙ্গ, সাতটি হাত, দুটি মাথা, তিনটি পা। দেখলেন বীজরহিত সেই বীজকে যাঁর মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান লীন। আব্রহ্মস্তম্ব যাঁর মধ্যে বিলীন

এবং অন্বেষিত হয়। ব্রহ্মা সেই লিঙ্গকে দর্শন করলেন।

"পঞ্চার্থা যত্র ভাসন্তে পঞ্চব্রহ্মময়ং হি যৎ।

আদি পঞ্চস্বরূপং যন্নিরৈক্ষি ব্রহ্মণা হি তৎ॥" (৭৩/৯৯)

—পঞ্চ অর্থ (সৎ, চিৎ, আনন্দ, নাম ও রূপ) যাঁর মধ্যে প্রকাশিত, যিনি নিজে পঞ্চব্রহ্মময় (চারিবেদ আর পুরাণ), যিনি আদি পঞ্চস্বরূপ (অ-কারাদি পঞ্চাক্ষর যাঁর নাম এবং রূপ), ব্রহ্মা তাঁকে দেখলেন।

ব্রহ্মা সেই আদিপুরুষ শঙ্করকে দেখে আবেগাপ্লুত স্বরচিত স্তবের দ্বারা তাঁর অর্চনা করলে, দেবদেব সেই লিঙ্গমধ্য হতে শাঙ্করী মূর্তিতে চতুরাননের সামনে আবির্ভূত হলে ব্রহ্মা গদগদস্বরে তাঁর জয় দিলেন আর প্রার্থনা জানালেন—হে শঙ্কর! এই লিঙ্গ আপনার সতত সান্নিধ্যে মুক্তিপ্রদ 'প্রণবেশ্বর' নামে আখ্যাত হক।

ব্রহ্মার এই আকুতিভরা প্রার্থনায় সম্মতি জানিয়ে ভগবান শঙ্কর বলেছিলেন—তোমার তপস্যার ফলে প্রণব-স্বরূপ অ-কার, উ-কার, ম-কার, নাদ ও বিন্দুসংজ্ঞক এবং পঞ্চায়তন শব্দব্রহ্মময় মুক্তিপ্রদ এই লিঙ্গ আনন্দ-কাননে উত্থিত হয়ে অবস্থান করছেন জীবের মুক্তির জন্য। মৎস্যোদরী তীর্থে স্নান করে এই লিঙ্গ-দর্শনে আর পুণর্জন্ম হয় না।

"যদেতৎ কাপিলং জ্যোতিরেতল্লিঙ্গে বিলোক্যতে।

অতস্তু কপিলেশাখ্যমেতল্লিঙ্গং সুতুর্লভম্॥" (৭৩/১৫৭)

—পার্বতী, যেহেতু কপিল অর্থাৎ নারায়ণ-সম্বন্ধীয় জ্যোতি এই সুতুর্লভ লিঙ্গে পরিদৃষ্ট হয়, সেহেতু এই লিঙ্গ 'কপিলেশ'।

মৎস্যোদরী যখন গঙ্গা এবং এই কপিলেশের সন্নিকটবর্তী হন, গঙ্গা ও বরণার সঙ্গে যখন এই তীর্থের মিলন ঘটে, বিশেষ করে অষ্টমী এবং চতুর্দশী তিথিতে যখন ষাটকোটি হাজার তীর্থ নিয়ে মৎস্যোদরী পুণ্যময়ী হয়ে ওঠেন, তখন এই তীর্থে স্নান এবং প্রণবেশ্বর দর্শন নিশ্চিত মুক্তির কারণ। এই প্রণবেশ্বরের পশ্চিমে তুর্গতি-নাশন শ্রেষ্ঠ 'তারতীর্থ'।

মহাদেব এইভাবে ব্রহ্মার তপস্যায় উদ্ভুত লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়ে ব্রহ্মাকে বললেন:

"সুরশ্রেষ্ঠ তপঃশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাম্নায়নিধির্ভব।
স্বষ্টেঃ করণসামর্থ্যং তবাস্তু মদনুগ্রহাৎ॥
পিতামহস্ত্বং সর্ব্বেষং সর্ব্বেষাং মান্যভূর্ভবান্।" (৭৩/১৫০-৫১)

—হে সুরশ্রেষ্ঠ, তাপসশ্রেষ্ঠ! তুমি অখিল বেদের আশ্রয় হও আর আমার অনুগ্রহবলে তোমার লোকস্বষ্টি করবার সামর্থ্য হক। তুমি সকলেরই পিতামহ এবং সকলেরই মান্য হবে।

এই বলে বিশ্বচরাচর সৃজনের আদেশ দিয়ে শঙ্কর সেই লিঙ্গ মধ্যে লীন হলেন।

আজও ব্রহ্মা স্ব-রচিত স্তোত্র-পাঠ এবং লিঙ্গের অর্চনা করে চলেছেন।

[অধ্যায় ৭৪]

দেব স্কন্দ অতঃপর মহামুনি অগস্ত্যের কাছে প্রণবেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন শুরু করলেন।

পদ্মকল্পে ঋষি-ভারদ্বাজের সর্বগুণসম্পন্ন, সর্বশাস্ত্রবিশারদ, তপোনিষ্ঠ এক পুত্র ছিলেন। তাঁর নাম দমন॥ অতি অল্প বয়সেই 'সংসারং দুঃখবহুলং জীবিতং চাপি চঞ্চলম্'—দুঃখবহ এই সংসার এবং জীবন-ও চঞ্চল—এই সত্য অনুধাবন করে শান্তিলাভের আশায় সংসার পরিত্যাগ করে বাণপ্রস্থ নিয়ে যেখানে যত তীর্থস্থান, তপোবন দেবায়তন আছে সর্বত্র পরিভ্রমণ করলেন। বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণতনয় এই পরিভ্রমণ কালেই তীর্থে তীর্থে স্নান, কোটি-কোটি মন্ত্রজপ, গিরিগহ্বরে, মহাশ্মশানে যম নিয়ম সহকারে তপস্যা, বহুবিধ আচার্যের সেবা করে বেড়ালেন দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু, এমন কোন আকাঙ্ক্ষিত তত্ত্বোপদেষ্টার সন্ধান পেলেন না, যিনি তাঁকে সেই পরমতম শান্তি-পথের সন্ধান দিতে পারলেন।

তাই বিক্ষুব্ধ চিত্তে ঋষিতনয় দমন তবুও নিরাশ না হয়ে ঘুরে

বেড়াতে-বেড়াতে একদিন দৈবযোগে উপস্থিত হলেন রেবা-তীরে অমরকণ্টক তীর্থে। তারই কাছে পরম পবিত্র প্রণবেশ্বরের বৃহৎ আয়তন। দেখলেন, সেই আয়তনে বিভূতিভূষিত বপু, শিবলিঙ্গার্চনারত, বেদান্তবিচার-পরায়ণ পাশুপাত তপস্বিগণ বসে আছেন অতি বৃদ্ধ তপঃকৃশ এক আচার্যের সামনে। দর্শন মাত্রেই দমনের অন্তর-চাঞ্চল্যের তীব্রতা যেন অনেকখানি হ্রাস পেয়ে গেল; অশান্ত মনে যেন শান্তির প্রবাহ প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। আর স্থির থাকতে না পেরে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করল দমন সেই আচার্যের সামনে নতমস্তকে। আচার্য হলেন মহামুনি গর্গ।

এক বীতরাগ তরুণকে তাঁর সামনে উপবেশন করতে দেখে গর্গ জানতে চাইলেন—কে তুমি? কোথা থেকে আসছ? দেখে মনে হচ্ছে সংসার-বন্ধনে বীতস্পৃহ—কারণ কি?।

দমন আনুপূর্বিক তাঁর কাহিনী বিবৃত করে বললেন:

"মনসঃ স্থৈর্য্যমাপন্নমিব সম্প্রাপ্তসিদ্ধিনা।
অবশ্যং ত্বন্মুখাম্ভোজাদ্ যদ্বচো নিঃসরিষ্যতি॥"
"তেনৈব মহতী সিদ্ধির্ভবিত্রী মম নান্যথা।
তদ্‌ব্রূহি সুপদেশঞ্চ কথং সিদ্ধির্ভবেন্মম॥" (৭৪/২৪-২৫)

—মনের দিক থেকে আমার স্থির বিশ্বাস, আপনার শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশ থেকে আমার পরম সিদ্ধি লাভ হবে; এছাড়া আর অন্য কোন উপায়ে হবে না। সুতরাং আপনি আমাকে সেই উপদেশ করুন, যাতে আমার সিদ্ধি লাভ হয়।—যাতে এই পার্থিব শরীরেই আমার সেই সিদ্ধি লাভ হয়।

তপঃশ্রেষ্ঠ মহামুনি গর্গ অতীব প্রীত হলেন দমনের অভীপ্সায়। বললেন,—'অনেনৈবেহ দেহেন যদি ত্বং সিদ্ধিকামুকঃ'—এই স্থূল শরীরেই যদি তোমার সিদ্ধিলাভের বাসনা জেগে থাকে তাহলে তোমায় যেতে হবে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গের একমাত্র আধার সেই অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসীতে। ব্রহ্মাণ্ডে এই একটিই মাত্র ক্ষেত্র, যা কর্মবৃক্ষের দাবাগ্নি-স্বরূপ, সংসার-সাগরের বাড়বানল-স্বরূপ, নির্বাণ-

লক্ষ্মীর ক্ষীরসমুদ্রস্বরূপ এবং নিত্যসুখের চিরস্থায়ী নিকেতন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে, এই একটিই মাত্র ক্ষেত্র আছে, যেখানে আসক্তিরূপ বীজ হতে উৎপন্ন সংসার-রূপ মহাবৃক্ষ মৃত্যুস্বরূপ কুঠারাঘাতে একবার ছিন্ন হলে আর কখনও অঙ্কুরিত হয় না। সত্য প্রভৃতি সপ্তলোকে ঐশ্বর্য ক্ষয় হয়ে থাকে, কিন্তু কাশীতেই একমাত্র তার কোনকালে ক্ষয় হয় না, যদি মহেশ্বর বিমুখ না হন। মহেশ্বরের এই ক্ষেত্র তাঁর অট্টহাস থেকে বভ্রু নামক গণশ্রেষ্ঠদের দ্বারা সুরক্ষিত। পূর্বে মণিকর্ণিকেশ্বর, দক্ষিণে ব্রহ্মেশ্বর, পশ্চিমে গোকর্ণেশ্বর, আর উত্তরে ভারভূতেশ্বর—এই সীমার মধ্যবর্তি স্থান কাশী-মধ্যে সর্বোত্তম ফলদায়ক বলে কীর্তিত।

এই ক্ষেত্রেই আছেন মহাপবিত্র 'প্রণবেশ্বর' লিঙ্গ, যাঁর উপাসনা করে অনেক মহাত্মাই পার্থিব শরীরে সিদ্ধিলাভ করেছেন। সিদ্ধি লাভ করেছেন কপিল, সাবর্ণি, শ্রীকণ্ঠ, পিঙ্গল, অংশুমান প্রভৃতি পাশুপাতগণ। প্রণবেশ্বরের পূজা এবং উদ্দণ্ড নৃত্য করতে-করতে কপিল প্রভৃতি পাশুপাতেরা সশরীরেই এই লিঙ্গ মধ্যে বিলীন হয়ে যান।

হে দমন, আমার আচার্য-শ্রেষ্ঠদের সামনেই এই স্থানে যে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল, তা বলছি শোন ঃ

প্রণবেশ্বর এই লিঙ্গের কাছে এক ভেকী বাস করত। প্রতিদিনই সে লিঙ্গের চতুর্দিক ঘুরে-ঘুরে ভক্তদের নিবেদিত অক্ষত (আতপ চাল) আর শিব-নির্মাল্য ভক্ষণ করত। সে তো আর জানে না যে—

"বরং বিষমপি প্রাশ্যং শিবস্বং নৈব ভক্ষয়েৎ।
বিষমেকাকিনং হন্তি শিবস্বং পুত্রপৌত্রকম্॥" (৭৪/৬৪)

—বরং বিষভক্ষণ ভাল কিন্তু শিব-নির্মাল্য কখনও ভক্ষণ করা উচিত নয়। বিষ একমাত্র ভক্ষণকারীরই প্রাণনাশ করে। কিন্তু শিব-নির্মাল্য ভক্ষণকারী পুত্র-পৌত্রাদির সঙ্গে বিনষ্ট হয়।

একদিন প্রণবেশ্বরের চারদিকে ভেকী যখন এইভাবে পরিভ্রমণ করছিল, তাকে দেখতে পেল এক কাক। সে ঠোঁটে ভেকীকে তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে এল কাশীর বাইরে।

কালক্রমে সেই ভেকী জন্ম নিল কাশীতে পুষ্পবটু নামে এক ব্যক্তির ঘরে কন্যারূপে। সর্বসুলক্ষণা এবং সর্বাঙ্গসুন্দরী হলেও সেই কন্যার মুখটি হয়েছিল গৃধ্রের (শকুনের) মত। কারণ আর কিছুই নয়, প্রত্যহ প্রণবেশ্বর লিঙ্গ প্রদর্শনের পুণ্যবলে মুক্তি তার সান্নিধ্যে এলেও শিব-নির্মাল্য আর অক্ষত ভক্ষণের পাপে তার মুখটি হয়েছে ঐরকম। সুমধুর-কণ্ঠী সেই কন্যা মাধবী অল্প-বয়সেই যাবতীয় রাগ-রাগিনী, সঙ্গীতে যেমন ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল, তেমনি পূর্ব-সংস্কার বশেই প্রণবেশ্বরের ভক্তাধীনা হয়ে পড়েছিল। প্রতিদিনই সে যেত প্রণবেশ্বরের কাছে। নৃত্যে-গীতে অচঞ্চল ভক্তিতে অর্চনা করত প্রণবেশ্বরের। লিঙ্গ-প্রাসাদ নির্মলিন করত, পূজাপাত্র ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করত। ক্রমে ক্রমে তার এমনি অবস্থা হল যে যৌবন-চাঞ্চল্য তার দূর হয়ে সে-যোগিজনচিত হয়ে উঠল। লিঙ্গ দর্শন, লিঙ্গ নামামৃত পান, লিঙ্গার্চনার জন্য মাল্য নির্মাণ ছাড়া, আর সবই ভুলে গেল। এমন কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রাও তার তিরোহিত হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত লিঙ্গ-প্রাঙ্গণ সে আর পরিত্যাগ করতে পারল না। আর সর্বদাই তার মুখ হতে নিঃসৃত হতে লাগল :

"ওঙ্কারং প্রণবং সারং পরং ব্রহ্মপ্রকাশকম্।
শব্দব্রহ্মত্রয়ী রূপং নাদবিন্দু কলালয়ম্॥
সদক্ষরং চাদিরূপং বিশ্বরূপং পরাবরম্।
বরং বরেণ্যং বরদং শাশ্বতং শান্তমীশ্বরম্॥
সর্ব্বলোকৈকজনকং সর্ব্বলোকৈকরক্ষকম্।
সর্ব্বলোকৈকসংহর্ত্তৃ সর্ব্বলোকৈকবন্দিতম্॥
আদ্যন্তরহিতং নিত্যং শিবম্ শঙ্করমব্যয়ম্।
একং গুণত্রয়াতীতং ভক্তস্বান্তকৃতাস্পদম্॥
নিরুপাধি নিরাকারং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
নির্ম্মলং নিরহঙ্কারং নিষ্প্রপঞ্চম্ নিজোদয়ম্॥
স্বাত্মারাম-মনস্তুষ্ট সর্ব্বগং সর্ব্বদর্শিনম্।
সর্ব্বদং সর্ব্বভোক্তারং সর্ব্বং সর্ব্বসুখাস্পদম্॥" (৭৪/৮৩-৮৮)

—ওঁকার, প্রণব, সার, পর, ব্রহ্ম, প্রকাশক, শব্দব্রহ্ম, ত্রয়ীরূপ, নাদবিন্দুকলালয়, সদক্ষর, আদিরূপ, বিশ্বরূপ, পরাবর, বর, বরেণ্য, বরদ, শাশ্বত, শান্ত, ঈশ্বর, সর্বলোকজনক, সর্বলোকরক্ষক, সর্বলোক-সংহারক, সর্বলোক-বন্দিত, আদি-অন্তহীন, নিত্য, শিব, শঙ্কর, অব্যয়, এক, গুণত্রয়াতীত, ভক্তহৃদয়বিহারী, নিরুপাধি, নিরাকার, নির্বিকার, নিরঞ্জন, নির্মল, নিরহঙ্কার, নিষ্প্রপঞ্চ, নিজোদয়, স্বাত্মারাম, অনন্ত, সর্বগ, সর্বদর্শী, সর্বদ, সর্বভোক্তা, সর্ব, সর্বসুখাস্পদ,—এই নামরূপ স্তুতি। এই নামাক্ষর-স্তুতি তার ছিল বিরামহীন।

একদিন বৈশাখ মাসের চতুর্দশী তিথি। দিনে উপবাস-ব্রত পালন করে লিঙ্গ-সমীপে রাত জাগল। সকালে পূজার্চনাদি সেরে ভক্তরা চলে গেলে প্রাসাদ-অঙ্গন পরিষ্কার করে নিত্যদিনের মত নৃত্যে-গীতে সে শুরু করল, লিঙ্গার্চনা। আমার আচার্য-শ্রেষ্ঠরা তখন সেখানে উপস্থিত। তাঁদের সামনেই ঘটে গেল সেই অত্যাদ্ভুত কাণ্ড। হঠাৎ এক-সময় সকালে দেখলেন, নৃত্য করতে-করতে মাধবী লিঙ্গ মধ্যে লীনা হয়ে গেল,—লিঙ্গ-মধ্য হতে উঠল বিশাল তেজঃপুঞ্জ আর তার মধ্যে মিলিয়ে গেল মাধবী।

গর্গমুনি এই কাহিনী বিবৃত করে বললেন, কাশীবাসিগণ এখনও এই তিথিটি প্রণবেশ্বরের সামনে ভক্তি-সহকারে পালন করে চলেছে।

হে দমন! বললেন গর্গমুনি, এই লিঙ্গের সামনেই শ্রীমুখ নামে এক গুহা আছে। সেই গুহটি হল পাতালের দ্বার—সিদ্ধগণের বাসস্থান। এই গুহার উত্তরে রসোদক কূপ, আর তারই পাশে 'নাদেশ্বর'—যাঁর প্রসাদে যাবতীয় শব্দের মর্ম-গ্রহণে মানুষ সমর্থ হয়। এই স্থানেই বরণার জলপ্লাবিত মৎস্যোদরী নদী—মহা তীর্থক্ষেত্র।

এই সব কথা বলতে-বলতে পূর্বস্মৃতির সুতীব্র আকর্ষণ অনুভব করলেন স্বয়ং গর্গ। বললেন দমনকে—চল, আমিও যাব কাশীতে। আমারও সেখানে যেতে বহুদিন থেকেই ইচ্ছা জাগছিল।

যদিও বার্ধক্য গ্রাস করেছিল গর্গকে, তবুও দমনের সঙ্গে তিনি

চলে গেলেন কাশীতে। শুরু করলেন প্রণবেশ্বরের অর্চনা। তারপর মাধবীর মতই একদিন লিঙ্গোদ্ভূত তেজোরাশিতে বিলীন হয়ে গেল তাঁরা, লীন হয়ে গেলেন প্রণবেশ্বর লিঙ্গ-মধ্যে।

[অধ্যায় ৭৫—৭৬]

দেব ষড়ানন মহামুনি অগস্ত্যকে প্রণবেশ্বর-এর কাহিনী বলে, পরম-পবিত্র ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গের আবির্ভাব কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

বারাণসীতে সর্বসিদ্ধিপ্রদ বিরজা নামে যে পীঠস্থান আছে, যার দর্শনে মানব বিরজা (নিষ্পাপ) হয়ে থাকে, যেথানকার গঙ্গাজলেই পিলিপিলা তীর্থ; সেই পীঠস্থানেই আছেন মহালিঙ্গ 'ত্রিলোচন'।

"বিষ্টপত্রিতয়ান্তর্যে দেবর্ষিমনুজোরগাঃ।
সসরিৎপর্ব্বতারণ্যাঃ সন্তি তে তত্র যম্মুনে॥
তদারভ্য চ তত্তীর্থং তচ্চ লিঙ্গং ত্রিলোচনম্।
ত্রিবিষ্টপমিতি খ্যাতমতো হেতোর্ম্মহত্তরম্॥" (৭৩/৫-৬)

—ত্রিভুবন মধ্যে যাবতীয় দেব, ঋষি, মনুষ্য, উরগ, সরিৎ, পর্বত, অরণ্য আছে, তা সবই বিদ্যমান এই তীর্থে; তাই ত্রিলোচন এই লিঙ্গ 'ত্রিবিষ্টপ' নামে খ্যাত হয়েছেন।

এখানে গঙ্গার সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে যমুনা, সরস্বতী, নর্মদা; প্রতিষ্ঠা করেছে স্ব-স্ব-নামে নামাঙ্কিত লিঙ্গ। ক্ষেত্র করেছে উষর আর লিঙ্গকে করেছে শ্রেষ্ঠতম।

"তত্রাপি সর্ব্বতীর্থানি ততোহপ্যোঙ্কারভূমিকা।
ওঙ্কারাদপি সল্লিঙ্গান্মোক্ষবর্ত্ম প্রকাশকাৎ॥
অতিশ্রেষ্ঠতরং লিঙ্গং শ্রেয়োরূপং ত্রিলোচনম্॥" (৭৫/২৪-২৫)

কাশীতে সবই শ্রেষ্ঠতীর্থ, তার মধ্যে ওঙ্কারক্ষেত্রে প্রণবেশ্বর মোক্ষপথের প্রকাশক। শ্রেয়োরূপ ত্রিলোচন-লিঙ্গ অতিশ্রেষ্ঠতর।

কেন এই লিঙ্গ অতিশ্রেষ্ঠতর, আর কেনই বা এঁর নাম ত্রিলোচন,

সেই প্রসঙ্গে মহাদেব পার্বতীকে যা বলেছিলেন এবং স্কন্দদেব মাতৃক্রোড়ে বসে যা শুনেছিলেন, তা বললেন অগস্ত্যকে। মহাদেব বলেছিলেন ঃ

"পুরা মে যোগযুক্তস্য লিঙ্গমেতদ্ভুবস্তলাৎ।
উদ্ভিদ্য সপ্তপাতালাং নিরগাৎ পুরতো মহৎ॥
অস্মিল্লিঙ্গে পুরা গৌরি সুগুপ্তং তিষ্ঠতা ময়া।
তুভ্যং নেত্রত্রয়ং দত্তং নিরৈক্ষিষ্ঠাস্তথোত্তমম্॥
তদা প্রভৃতি দেবেশি লিঙ্গমেতত্ত্রিলোচনম্।
বিষ্টপত্রিতয়াস্তস্থৈর্গীয়তে জ্ঞানদৃষ্টিদম্॥" (৭৫/৬১-৬৪)

—পুরাকালে যখন আমি সমাধিতে মগ্ন ছিলাম, সেই সময় আমার সামনে সপ্ত-পাতাল এবং পৃথিবী ভেদ করে এই লিঙ্গ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হন। এই লিঙ্গের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে আমিই তোমাকে নেত্রত্রয় প্রদান করেছিলাম, তারই প্রভাবে তোমার এই উত্তম দর্শন শক্তি। দেবি! সেইদিন থেকেই ত্রিলোকবাসী জীব এই লিঙ্গকে 'ত্রিলোচন' নামে অভিহিত করেছে। এই লিঙ্গের প্রসাদেই লোকে জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করতে সমর্থ হয়।

প্রতিমাসের অষ্টমী এবং চতুর্দশী তিথিতে এই ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গকে দর্শন করার জন্য সকলে তীর্থে আসেন।

এই ত্রিলোচনের কাছেই গঙ্গাতীরে সংসার-তাপহারী 'শান্তনব' লিঙ্গ। এবং এর দক্ষিণে কলি, কাল ও কামভয় পরিত্রাতা 'ভীমেশ্বর' মহালিঙ্গ, তাঁর পশ্চিমে জ্যোতির্ময় রূপ-প্রদায়ী 'দ্রোণেশ্বর', এর সামনেই 'অশ্বত্থামেশ্বর'। দ্রোণেশ্বরের বায়ুকোণে সর্বযজ্ঞফলদাতা 'বালখিল্যেশ্বর' আর তার বাঁদিকে শোকাপহরণকারী 'বাল্মীকেশ্বর' লিঙ্গ।

পুরাকল্পে এই বিরজা পীঠস্থানে ত্রিলোচনের সুবর্ণময় প্রাসাদের গবাক্ষে বাস করত এক কপোত-দম্পতি। চারিদিকে তখন শুরু হয়েছে প্রলয়, জেগে আছে শুধু এই প্রাসাদ। ত্রিলোচন, ত্রিবিষ্টপের ভক্তেরা যে তণ্ডুল দিত লিঙ্গদেবকে, তা প্রায়ই ছড়িয়ে পড়ে থাকত

লিঙ্গের চারদিকে। কপোত-দম্পতি একমাত্র সেই তণ্ডুলকণা আর মন্দির দক্ষিণে গঙ্গা-যমুনা-নর্মদা-সরস্বতীর মিলিত মহাপবিত্র জল ছাড়া, আর কিছুই আহার্য হিসেবে গ্রহণ করত না, বা করার জন্যে অন্য কোথাও যেত না। এইভাবেই তাদের সেখানে কেটে গেল বহুকাল নিশ্চিন্তে।

একদিন এক শ্যেন-পাখির নজরে পড়ল তারা। প্রলুব্ধ হল শ্যেন পাখি। অপর এক শিবালয়ে বসে বসে সে কপোত-দম্পতির প্রবেশ আর নির্গম পথ লক্ষ্য করতে লাগল। চিন্তা করতে লাগল কিভাবে শিকারকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দম্পতি দুর্গ মধ্যে এমনভাবে রয়েছে যে সেখান থেকে তাদের ধরা আদৌ সম্ভব নয়। লক্ষ্য পড়ল কপোতীর। সে উদ্বিগ্ন হয়ে কপোতকে সাবধান করে দিয়ে বলল—'ঐ দেখ, আমাদের শত্রু শ্যেন উড়ছে।' শুনে কপোত তাকে আশ্বস্ত করল—'কোন ভয় নেই।' পরদিন আবার এল শ্যেন। কিছুক্ষণ, তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে প্রাসাদের চূড়ায় কয়েকটা পাক খেয়ে চলে গেল। কপোতি এবারেও সাবধান করল স্বামীকে। কিন্তু কপোত তাকে ওড়ার ব্যাপারে তার থেকেও হীন-বোধে কপোতিকে নির্ভয়ে থাকতে বলল। পরদিন আবার এল শ্যেন। বহুক্ষণ অবস্থান করল তাদের সামনে। আবার উড়ে গেল। এবারে তার চোখ দেখে খুবই ভয় পেয়ে গেল কপোতি। স্বামীকে বলে শুধু তিরস্কৃতাই হল। পরদিন সকাল হতেই আবার শ্যেন এসে হাজির। বসে রইল তাদের বাসার সামনে সন্ধ্যে পর্যন্ত; তারপর উড়ে গেল। এবারে খুবই ভীতা কপোতি স্বামীকে অনুরোধ জানাল, এখান থেকে এই বেলা পালাতে। কিন্তু কিছুতেই রাজি হল না কপোত। পরদিন আবার সকাল হতেই এল শ্যেন! সঙ্গে নিয়ে এল কিছু খাবার। দম্পতির নির্গমন পথ রুদ্ধ করে আহ্বান জানাল দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করতে। বেরিয়ে এল দম্পতি; কিছুক্ষণ যুদ্ধও করল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত পারবে কেন বেশীক্ষণ? অবিলম্বে শ্যেন কপোতকে ঠোঁটে আর কপোতিকে পায়ে বেঁধে মনের আনন্দে

উড়ে পড়ল আকাশে, ভক্ষণযোগ্য নির্জন স্থানের কথা চিন্তা করতে-করতে। অসহায় কপোতকে তখন কপোতি বলল—'নাথ! স্ত্রীলোকের কথা না শোনার জন্যেই এই পরিণাম। এখন যদি অবলার একটা পরামর্শ শোনেন, তাহলে হয়ত আমরা আমাদের জীবন ফিরে পেতে পারি।'

কপোত এবার কপোতির পরামর্শমত শ্যেনের পা সজোরে কামড়াতে শুরু করল। শ্যেন বারবার সেই কামড়ের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে যেই চীৎকার করে উঠল, অমনি উন্মুক্ত চঞ্চুপুট থেকে কপোতি আর শ্লথ পা থেকে কপোত মুক্ত হয়ে আশ্রয় নিল অযোধ্যার সরযূ তীরে।

কালক্রমে গতায়ু হয়ে কাশীবাসজনোচিত পুণ্যে সেই কপোত জন্ম নিল বিদ্যাধর মন্দরদামের পুত্র পরিমলালয় নামে। শৈশব থেকে সংস্কার বশে পরিমলালয় ছিল শিবভক্তি-পরায়ণ। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করল, কাশীতে ভগবান ত্রিলোচনের আরাধনা না করে আহার গ্রহণ করবে না আর একপত্নী ছাড়া দ্বিতীয় কোন নারীতে আসক্ত হবে না। এই প্রতিজ্ঞা করে পরিমলালয় ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গ দর্শন করার জন্য কাশীতে চলে এল।

এদিকে সেই কপোতি-ও গতায়ু হয়ে পাতালে নাগরাজ রত্নদীপের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিল। নাম হয়েছিল রত্নাবলী। রূপে-গুণে-শীলে শৈশবেই সে সকলের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে-সঙ্গে ছায়ার মত থাকত তার দুই সাথী প্রভাবতী আর কলাবতী। রত্নদীপ নিজে ছিলেন শিবভক্ত। রত্নবলীও শিবভক্তিপরায়ণা হয়ে প্রতিজ্ঞা নিল, প্রতিদিন সে সখীদের নিয়ে কাশীতে ভগবান ত্রিলোচনের কাছে তাকে দর্শন করে তারপর কথা বলবে। যতক্ষণ তা না করতে পারবে ততক্ষণ মৌনী থাকবে। রত্নদীপ কন্যার প্রতিজ্ঞা শুনে সম্মতি জানালে রত্নাবলী রোজই সখীদের নিয়ে ভগবান ত্রিলোচন লিঙ্গ সমীপে এসে সুগন্ধি-কুসুমের মালা রচনা করে দিতে লাগল, গান্ধার-রাগে সঙ্গীত আর মণ্ডলাকার নৃত্যে পরিতুষ্ট করত

দেবকে, তারপর আবার ফিরে যেত নিজ আবাসে।

একদিন বৈশাখী তৃতীয়া। তিনজনেই উপবাস করে নৃত্যে-গীতে ত্রিলোচনের অর্চনা করে যাপন করল বিনিদ্র রজনী। পরদিন সকালে পিলিপিলা তীর্থে স্নান করে ত্রিলোচনের পূজা করে মণ্ডপেই ঘুমিয়ে পড়ল। নিদ্রিতাবস্থায় তারা দেখল—ত্রিনেত্র, শশিভূষণ, জটামুকুট-মণ্ডিত, ফণিভূষিত ভগবান ত্রিলোচন যেন তাদের ডেকে বলছেন—ওঠো। ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলতেই তারা স্বচক্ষেই ভগবানকে দেখে উৎফুল্লিত হৃদয়ে তাঁর স্তব করল। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলে দেব ত্রিলোচন তাদের স্নেহভরে তুলে বললেন—শোন, মন্দরদামের পুত্র বিদ্যাধর পরিমলালয় তোমাদের পতি হবে। বিদ্যাধরলোকে তোমরা সুখে কালাতিপাত করে কাশীতে এসে মুক্তিলাভ করবে। জন্মান্তরে তোমরা সকলেই ছিলে আমার ভক্ত, তারই ফলে তোমরা এই দুর্লভ জন্ম লাভ করেছ।

নাগকন্যারা সবিস্ময়ে মহেশ্বরের কাছে জানতে চাইল পূর্বজন্মের কথা, জানতে চাইল সূক্ষ্ম তত্ত্ব কথা।

ঈশ্বর বললেন, এই রত্নাবলী পূর্বজন্মে ছিল কপোতি আর এর পতি বর্তমান বিদ্যাধর পরিমলালয় ছিল কপোত। থাকতো আমারই প্রাসাদ-দুর্গে। পক্ষ বিধুননে পরিষ্কার করত প্রাসাদ-ধূলি, আকাশে উড়ে-উড়ে আমাকেই প্রদক্ষিণ করত। চতুর্নদ-তীর্থে স্নান আর জলপান করত। কিন্তু তির্যগ-যোনির জন্য কাশীতে এদের দেহান্ত না হয়ে, এদের দেহান্ত হয়েছিল কাশীপ্রাপ্তিকর অযোধ্যাপুরীতে।

এই প্রভাবতী এ-জন্মে নাগরাজ পদ্মীর আর এই কলাবতী উরগেন্দ্র ত্রিশিখের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছে। এই জন্মের তৃতীয় জন্মে এরা দুজনেই দুজনের প্রতি অনুরাগিনী মহর্ষি চারায়ণের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিল। এদেরই অনুরোধে এদের পিতা দুজনকেই দান করেছিল আমুষ্যায়ণের পুত্র ঋষিকুমার নারায়ণকে। অপ্রাপ্তযৌবন নারায়ণ সমিদ আহরণে বনে গেলে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। তখন এই দুই কন্যা ভবানী আর গৌতমী বৈধব্য অবলম্বন করে

পিতৃ-আশ্রমেই ছিল। একদিন লোভের বশে চুরি করে এরা খেল কলা। চুরি করে খাওয়ার অপরাধে এরা পরে বানরী-রূপে জন্ম নিয়েছিল এই কাশীতেই, কেননা চরিত্রকে অক্ষত রেখেছিল। ব্রাহ্মণতনয় নারায়ণও পিতৃসেবারূপ পুণ্যবলে পারাবত-রূপে কাশীতে জন্ম-পরিগ্রহ করেছিল। বানরী হয়ে এরা থাকত এই প্রাসাদের পাশেই বটবৃক্ষে। খেলার ছলে প্রদক্ষিণ করত প্রাসাদ, চতুর্নদে স্নান জলপান করত। একদিন একজন এদের দুজনকেই ধরে নিয়ে গেল বৃত্তির খাতিরে। এদের শেখাল নৃত্যাদি। কিছুকাল তার বাড়িতে থেকে এদের দেহান্ত হল। কিন্তু পূর্বার্জিত পুণ্যবলে বর্তমানে এরা নাগকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছে। এরা তিনজনেই জন্মান্তর সূত্রে বিদ্যাধরের পত্নী। এখন মিলিত হয়ে সুখী হ'ক।

মহেশ্বর এই সব বলে অন্তর্লীন হলে, নাগকন্যারা ফিরে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল নিজ-নিজ জননীর কাছে।

বৈশাখ মাসের মহাযাত্রা। বিরজা ক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন নাগকুল, বিদ্যাধর কুল। তারপর পরস্পর আলোচনা আর মহাদেবের প্রসাদে তিনকন্যাকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করল বিদ্যাধর পরিমলালয়।

তারপর পরিমলালয় নাগকন্যাদের নিয়ে বিদ্যাধরলোকে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করে কাশীতে এসে ত্রিলোচনের সেবা করে লিঙ্গ মধ্যেই অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল।

[অধ্যায় ৭৭]

পার্বতী অতঃপর কেদারেশ্বর লিঙ্গ সম্বন্ধে কৌতূহলী হলে দেবদেব যা বলেছিলেন, দেব স্কন্দ তা বললেন মহামুনি অগস্ত্যকে।

মহাদেব বলেছিলেন, কেদারেশ্বর লিঙ্গ দর্শন এবং পূজা তো দূরের কথা দর্শনের মানসিক সঙ্কল্পই মানুষকে ত্রিতাপ-জ্বালা আর সপ্ত-জন্মার্জিত পাপ থেকে মুক্তি দেয়।

পূর্বে রথন্তর-কল্পে যে ঘটনা ঘটেছিল, অপর্ণে শোন :

উজ্জয়িনীর এক ব্রাহ্মণ-তনয় উপনয়নের পরই ব্রহ্মচর্য অবস্থাতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে কাশীতে এসে অবস্থান করেছিল। বিভূতি-ভূষিত দেহ, ভিক্ষান্নে সন্তুষ্ট। জটামুকুট-শোভিত, পাশুপাত তাপসদের সেখানে দেখে সে-ও হৃষ্টান্তঃকরণে সেখানে গুরু হিরণ্যগর্ভের কাছে পাশুপত ব্রত গ্রহণ করেছিল। সেই ব্রাহ্মণ-তনয়ের নাম ছিল বশিষ্ঠ। তখন কেদারেশ্বর লিঙ্গ-রূপে আমি অবস্থান করতাম হিমালয়ে। কাশীতে তাপসেরা আমার লিঙ্গ নির্মাণ করে পূজা করত; বশিষ্ঠও তাই করতে শুরু করে দিল। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা হরপাপ-হ্রদে স্নান আর এমনভাবে লিঙ্গার্চনা করত যে গুরু এবং লিঙ্গের মধ্যে কোন পার্থক্যই সে অনুভব করত না।

তখন বারো বৎসর বয়স বশিষ্ঠের; গুরুর সঙ্গে চলল হিমালয়ে কেদারেশ্বর দর্শনাভিলাষে। পথিমধ্যে অসিধার পর্বতে গুরু হিরণ্যগর্ভ দেহ রাখলেন। আমার পারিষদেরা শিষ্যদের সামনেই গতায়ু হিরণ্যগর্ভকে স্বর্গীয় বিমানে তুলে নিয়ে গেল আমার আবাস কৈলাসে। আশ্চর্য এই ঘটনাটি দেখার পর থেকেই তাপস বশিষ্ঠ কেদারেশ্বরকেই লিঙ্গমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লিঙ্গ বোধে যাত্রাশেষে কাশীতে ফিরে এই লিঙ্গার্চনাতেই অধিকতর স্বনিষ্ঠ হল। আর স্থির নিয়ম করল—'প্রতিচৈত্র্যং সদা চৈত্র্যাং যাবজ্জীবমহং ধ্রুবম্। বিলোকয়িষ্যে কেদারং বসন্ বারাণসীং পুরীম্॥' (৭৭/২৬)—যতদিন বাঁচব, ততদিন প্রতি চৈত্রমাসে আমি কেদারেশ্বর দর্শনে যাব আর বারাণসীতে বাস করব। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে সে একষট্টিবার কেদারেশ্বর যাত্রা করেছিল। আবার যখন চৈত্র এল, যাত্রার তোড়জোড় শুরু করল বশিষ্ঠ। পথিমধ্যে পাছে প্রাণবিয়োগ ঘটে এই আশঙ্কায় সহচরেরা তাকে বারবার নিষেধ করল। কিন্তু বশিষ্ঠ অটল।

তার এই মানসিক দৃঢ়তা আমার হৃদয় জয় করেছিল। আমি তার স্বপ্নাবস্থায় তাকে দর্শন এবং আমার পরিচয় দিয়ে অভিলষিত বর প্রার্থনা করতে বলেছিলাম, কিন্তু স্বপ্ন-দর্শনকে সে বিশ্বাস করল না

দেখে তাকে বলেছিলাম, অশুচি অবস্থায় দৃষ্ট স্বপ্ন মিথ্যা হয় কিন্তু শুচিশুদ্ধ এবং জিতেন্দ্রিয়ের দৃষ্ট স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না। তাই সন্দিগ্ধ হবার কোন কারণ নেই। তুমি যা দেখেছ তা সত্য। তুমি বর প্রার্থনা কর। তখন বশিষ্ঠ প্রার্থনা জানিয়েছিল ঃ "যদি প্রসন্নো দেবেশ তদা মে সানুগা ইমে। সর্ব্বে শূলিন্নমুগ্রাহ্যা এষ এব বরো মম॥" (৭৭/৩৭) —হে দেবেশ! আমার ওপর যদি প্রসন্নই হয়ে থাকেন, তবে এখানে আমার যারা অনুচর রয়েছে, আপনি তাদের সকলকে অনুগ্রহ করুন। অপর্ণে, বশিষ্ঠের স্বার্থবুদ্ধিহীন এই প্রার্থনায় আমি অত্যন্ত প্রীত হয়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম এবং পরোপকার-জনিত পুণ্যার্জনের জন্য তাকে আরো বর দিতে চাইলে, সে প্রার্থনা জানিয়েছিল হিমশৈল থেকে এসে আমি যেন কাশীতেই অবস্থান করি। তারই প্রার্থনায়, হিমশৈলে আমার কণামাত্র রেখে চলে এলাম এখানে এবং বশিষ্ঠকে সামনে রেখে তার উপর কৃপা করে হরপাপ হ্রদে অবস্থান করলাম।

হিমালয় পর্বতে কেদারেশ্বর দর্শন, গৌরীকুণ্ডে হংসতীর্থ মধুস্রবায় স্নান করে যে পুণ্য অর্জন হয়, তারও অধিক ফললাভ হয় এখানে কেদারেশ্বর দর্শনে আর হরপাপ-হ্রদে স্নানে। গৌরী, পুরাকালে তুমিও এই হ্রদে স্নান করেছিলে বলে, এর নামও গৌরীকুণ্ড। দুটি ককোল (দাঁড়কাক) শূন্যে যুদ্ধ করতে-করতে এই হ্রদে পড়ে হংসরূপ ধারণ করেছিল, তাই হংসতীর্থ। আবার মানস-সরোবর এই স্থানে এসে বহুকাল তপস্যা করেছিল—তাই এটি আবার মানস-তীর্থও। আগে যে ব্যক্তিই এই কেদারকুণ্ডে স্নান করত সেই মুক্তিলাভ করত দেখে দেবগণ একদিন এসে আমাকে বললেন—

"সর্ব্বে মুক্তিং গমিষ্যন্তি যদি দেবেহ মানবাঃ।
কেদারকুণ্ডেষু স্নাতাস্তদোচ্ছিত্তির্ভবিষ্যতি॥
সর্ব্বেষামেব বর্ণানামাশ্রমাণাং চ ধর্ম্মিণাম্।
তস্মাত্তনুবিসর্গেঽত্র মোক্ষং দাস্যতি নান্যথা॥" (৭৭/৫৪-৫৫)

—কেদারকুণ্ডে স্নান করে যদি সব মানুষই মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম সব কিছুই উচ্ছেদ হয়ে যাবে। সুতরাং, দেবেশ,

এখানে যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করবে, একমাত্র তাকেই মুক্তি দিন।

সেই থেকে যারা ভক্তিসহকারে কেদারকুণ্ডে স্নান, কেদারেশ্বরের পুজা, নাম-জপ করে একমাত্র তাদেরই আমি মুক্তি প্রদান করে আসছি।

কেদারেশ্বরের উত্তরে আছেন স্বর্গভোগসুখদায়ী 'চিত্রাঙ্গদেশ্বর' লিঙ্গ, দক্ষিণে সর্পবিষহারী 'নীলকণ্ঠেশ্বর ; বায়ুকোণে দুঃখতাপহারী 'অম্বরীষেশ্বর' ; তার সমীপে 'ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর' আর এই লিঙ্গেরই দক্ষিণে জরা ও কালজয়ী 'কালঞ্জরেশ্বর'। আর চিত্রাঙ্গদেশ্বরের উত্তরে হলেন 'ক্ষেমেশ্বর' লিঙ্গ।

[অধ্যায় ৭৮—৮১]

আনন্দকাননে যে লিঙ্গটি অক্ষয় ফলদায়ক তাঁর বিষয় জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে দেবদেব ঈশান ঈশানীকে বলেছিলেন,—"যত্র মুক্তিস্বরূপা ত্বং স্বয়ং তিষ্ঠসি বিশ্বগে"—বিশ্বগে ! যেখানে তুমি নিজেই মুক্তিস্বরূপে বিরাজমানা, যাঁর অনুকম্পায় আমার ত্রিপুর বিজয়, ইন্দ্রের বৃত্র-বিনাশ, নরপতি দুর্দমের ধর্মে মতি লাভ, যাঁর সান্নিধ্যে তির্যককযোনি পাখিরও পরম জ্ঞান লাভ হয়, সেই ধর্মেশ্বর লিঙ্গই হল অক্ষয় ফলদাতা।

পুরাকালে সূর্যপুত্র যম এই আনন্দকাননে তোমারই সামনে সূর্যমণি-দ্বারা নির্মিত একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে দিব্য ষোল যুগ ধরে সুদুশ্চর তপস্যা করেছিলেন। সেইখানেই ছিল কাঞ্চনশাখ-নামে এক বটগাছ—বিহগকুলের আবাস। পরম সমাধিতে মগ্ন স্থিরহৃদয় শমনকে আমি যখন গিয়ে বর-প্রার্থনা করতে বললাম, তিনি আমাকে দেখে ভাবঘোরে বললেন—

"নমো নমঃ কারণকারণানাং নমো নমঃ কারণবর্জ্জিতায়।
নমো নমঃ কার্য্যময়ায় তুভ্যং নমো নমঃ কার্য্যবিভিন্নরূপ ॥" (৭৮/৩২)

—হে কারণসমূহেরও কারণ ! কারণ-রহিত ! আপনাকে নমস্কার। হে কার্যময় ! হে কার্য্যবিভিন্নরূপ আপনাকে নমস্কার।

এই সব বলে স্তুতি আর বারবার প্রণাম করতে লাগলেন। কিন্তু কোন প্রার্থনা জানাতে পারলেন না। আমি নিজেই তখন তাঁকে এই বলে বর দিয়েছিলাম—

"......সপ্তুরঙ্গসূনবে ত্বং ধর্ম্মরাজো ভব নামতোঽপি॥
ত্বমেব ধর্ম্মাধিকৃতো সমস্তশরীরিণাং স্থাবর-জঙ্গমানাম্।
ময়া নিযুক্তোঽস্য দিনাদিকৃত্যঃ প্রশাধি সর্ব্বান্মম শাসনেন॥" (৭৮/৪৩-৪৪)

—হে দিবাকর-তনয়! আজ থেকে তোমার নাম হ'ক 'ধর্মরাজ'। নিখিল স্থাবর জঙ্গম শরীরিগণের ধর্মাধিকার তোমার ওপর অর্পিত হল। আজ থেকে আমার নিয়োগ-অনুসারে আমার শাসনানুযায়ী তুমি লোকসমূহের শাসন কর!—তুমি আজ থেকে হলে দক্ষিণ দিকের অধিপতি।

এই বর দিয়েও দেবাদিদেবের তৃপ্তি হল না, স্কন্দদেব বললেন অগস্ত্যকে। তিনি তাঁকে আরও বর দিতে উদ্যত হয়ে প্রার্থনা জানাতে বললেন। যমরাজের কিন্তু বাকস্ফূর্তী হল না। দুচোখে তাঁর আনন্দাশ্রু, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ। মহাদেবের করস্পর্শে সেই আবেগ তাঁর প্রশমিত হলে, তিনি প্রার্থনা জানালেন—'হে শ্রীকণ্ঠ! আমার তপস্যার সাক্ষী এই শুক-শাবকগণ যেন মুক্তিলাভ করে। জন্ম-গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গেই এরা হয়েছে মাতৃহারা আর এদের পিতা হয়েছে শ্যেনের শিকার।'

ধর্মরাজের এই পরোপকার-মনস্কতায় প্রীত হলেন ভগবান শম্ভু। তিনি তৎক্ষণাৎ পক্ষিশাবকদের ডেকে বর চাইতে বললে, তারা বললে—'তির্যকপ্রাণী হয়েও যে আপনার দর্শন লাভ করলাম এর চেয়ে আর কি অভিলাষ থাকতে পারে? এই স্থানে থেকে ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গপূজা দেখতে-দেখতে আমরা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে গেছি; আমাদের সামনে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান অনাবৃত হয়ে গেছে। আমরা জানতে পেরেছি—দেবযোনি থেকে মনুষ্য-যোনিতে পর্যন্ত আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে পরিভ্রমণ করছি কিন্তু কোথাও শান্তি লাভ করতে পারি নি। বর্তমানে তির্যক প্রাণী হয়েও আপনার দর্শনে আমরা কৃতকৃত্য।

আপনি যদি কৃপাই করেন, তাহলে এই কৃপাই করুন—আমাদের যেন পুনর্জন্মরহিত কাশীতে মৃত্যু হয়।'

স্কন্দদেব বললেন, দেবাদিদেব বিহগকুলের ওপর এই ধর্মেশ্বর-পীঠের প্রভাব দেখে, নিজে সর্বত্র অবস্থান করা সত্ত্বেও রবিসূতকে বললেন—'আজ থেকে তোমার উত্তম তপোবন এই ধর্মেশ্বর পীঠ আমি কখনও পরিত্যাগ করব না। আর দেখ, এই শুকশাবকেরা তোমার সামনেই আমার পুরে গমন করছে।' দেবাদিদেব এই কথা বলামাত্রই শুকশাবকেরা দিব্যরূপ ধারণ করে দিব্যবিমানে আরোহণ করে ধর্মরাজকে বিদায় জানিয়ে কৈলাসে চলে গেল।

দেবী অম্বিকা সেই অনির্বচনীয় পীঠমাহাত্ম্য শুনে ধূর্জটিকে জানালেন, যে তিনি আজ থেকে এই পীঠ-সমীপেই অবস্থান করবেন এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ধর্মেশ্বর লিঙ্গের ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন। ঈশ্বর আনন্দে সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'বিশেষ করে মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রত যারা এই পীঠে বা অন্যত্র-ও উদ্‌যাপন করবে, ভক্তি-সহকারে তোমার অর্চনা করবে, তাদের মনোরথ অবশ্যই সিদ্ধ হবে।'

দেবী এই মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রত সম্বন্ধে কৌতূহলী হলে দেবদেব তাঁকে বলেছিলেন—এই ব্রতানুষ্ঠানের দেবী হলেন বিংশতিভূজা বিশ্বভূজা গৌরী। তবে এই দেবীর অর্চনার আগে করতে হবে আশাবিনায়কের পূজা। এই আশাবিনায়কের চারটি হাত—এক হাতে বর, দ্বিতীয় হাতে অভয়, তৃতীয়ে অক্ষমালা, চতুর্থে মোদক। দিনে উপবাস এবং সংযতেন্দ্রিয় থেকে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে চৈত্রমাসের শুক্লা-তৃতীয়া থেকে একবৎসর সায়ংকালে পূজা-হোম এবং প্রসাদ ভক্ষণ সেই সঙ্গে বিনায়ক-সহ বিশ্বভূজার কাছে মনোরথ-সিদ্ধির প্রার্থনা জানালে, বিশ্বভূজা অবশ্যই তাকে অভীষ্ট প্রদান করে থাকেন। পুরাকালে অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে, অনসূয়া অত্রিকে, লক্ষ্মী চতুর্ভূজকে এই ব্রতের মাধ্যমেই লাভ করেছিলেন। তাই, পুলোম-তনয়া শচী দেবগণেরও মাননীয় পরম সুন্দর পতিলাভ, ইচ্ছানুরূপ সুখ-আয়ু এবং

পতিসঙ্গ-কালে নিত্য নূতন দেহের অভিলাষে আর বৈধব্যহীনতার কামনায় দেবেশের উদ্দেশ্যে যখন দুশ্চর তপস্যা করেছিল, দেবদেব তাকেও এই ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

দেব স্কন্দ অতঃপর অগস্ত্যকে বলেছিলেন দেবাদিদেবের মুখনিঃসৃত ধর্মতীর্থের কাহিনী।

বৃত্রাসুরকে বধ করে সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপানলে দগ্ধ হয়ে যখন দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হয়েছিলেন তখন দেবগুরু তাঁকে বলেছিলেন—

"তাং কাশীং প্রাপ্য বৃত্রারে বৃত্রহত্যাপনুত্তয়ে।
সমারাধয় বিশ্বেশং বিশ্বমুক্তিপ্রদায়কম্॥" (৮১/১৩)

—হে বৃত্রারে! ব্রহ্মহত্যা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে তুমি কাশীতে গিয়ে বিশ্বমুক্তিপ্রদায়ক বিশ্বেশ্বরের আরাধনা কর। স্বয়ং ভৈরবও সেখানে ব্রহ্মার কপালমুক্ত হয়েছিলেন।

দেবগুরুর নির্দেশে ইন্দ্র কাশীতে গিয়ে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করে ধর্মেশ্বরের কাছে মহেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হলেন। মহারুদ্র জপে রত ইন্দ্র একদিন দেখলেন লিঙ্গমধ্যস্থ তেজোময় ত্রিলোচনকে। আবার বেদোক্ত রুদ্রসূক্তের দ্বারা তাঁর স্তব করতে থাকলে লিঙ্গমধ্য হতে স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হয়ে ইন্দ্রকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। ইন্দ্র বললেন—'হে সর্বজ্ঞ, আপনার কি কিছু অবিদিত আছে?' দেবাদিদেব তখন সেই স্থানেই একটি তীর্থ নির্মান করে বললেন—'ইন্দ্র, তুমি এতে স্নান কর।' ঈশ্বরের নির্দেশে সেই তীর্থে স্নান করা মাত্রই দেবরাজ পূর্বদেহকান্তি ফিরে পেলেন। তাই দেখে নারদ প্রভৃতি মুণিগণ সানন্দে সেই তীর্থে স্নান করলেন, ঘটভর্তি সেই তীর্থজল এনে ধর্মেশ্বরকেও স্নান করালেন। সেই থেকে এই তীর্থের নাম হল ধর্মকূপ। এই ধর্মকূপে স্নান করে নিষ্পাপ ইন্দ্র প্রত্যাবর্তন করেছিলেন অমরাবতীতে, কীর্তন করেছিলেন এই পীঠের মাহাত্ম্য দেবগণের কাছে। ইন্দ্র মুনিগণের সঙ্গে আবার এসেছিলেন এখানে। তারকেশ্বরের পশ্চিমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্ব-নামে 'ইন্দ্রেশ্বর' লিঙ্গ,

তার দক্ষিণে শচীদেবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'শচীশ্বর' লিঙ্গ। ইন্দ্রেশ্বরের কাছেই আছেন 'লোকপালেশ্বর'। ধর্মেশ্বরের পশ্চিমে 'ধরণীশ্বর', দক্ষিণে 'তত্ত্বেশ্বর', পুবে 'বৈরাগ্যেশ্বর', ঈশানকোণে 'জ্ঞানেশ্বর' আর উত্তরে 'ঐশ্বর্য্যেশ্বর'। এই সব লিঙ্গই দেব পঞ্চাননের মূর্তিবিশেষ।

কেবলমাত্র ধর্মেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে পাপমতি রাজা দুর্দম কিভাবে শ্রেয়োলাভ করেছিল, শোন ঃ

বিন্ধ্যপর্বতের কদম্বশিখর প্রদেশের রাজা ছিল এই দুর্দম। যেমন ছিল অধর্মাচারী, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, তেমনি ছিল কামান্ধ। রাজকার্য থেকে ব্রাহ্মণরা তার রাজত্বে বিদূরিত হয়েছিল, প্রতি পদে সাধু ব্যক্তিরা হত অপমানিত, লাঞ্ছিত। নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পরদারে তার তীব্র আসক্তির জন্যে পুরবাসীরা সব সময়ই থাকত সন্ত্রস্ত। অসাধু ব্যক্তিদের নিয়ে নিজ রাজ্যে তার উৎপীড়নের শেষ ছিল না। বেশীর ভাগ সময়ই তার কাটত ব্যাধদের নিয়ে মৃগয়ায়।

একদিন মৃগয়ায় বেড়িয়ে পিছু নিল একটি একপ্রসূতা গাভীর। অনুসরণ করতে করতে প্রবেশ করল ঘোর অরণ্যে। হারিয়ে গেল তার সঙ্গী-সাথীরা। একা ঘুরতে-ঘুরতে একসময় সে প্রবেশ করল আনন্দকাননে। খুবই শ্রান্ত। তরুলতা সজ্জিত মনোরম সেই কাননে প্রবেশ করে মুহূর্তেই তার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। তারপর এদিক-সেদিক তাকাতে-তাকাতে দেখতে পেল রত্নকিরণোজ্জ্বল এক গগনচুম্বী প্রাসাদ। রাজা দুর্দম কৌতূহল দমন করতে না পেরে এল সেখানে। নামল অশ্ব হতে। জানত না সে যে এটি সেই ধর্মেশ্বরের মণ্ডপ। দেখতে-দেখতে এমনি বিহ্বল হয়ে পড়ল যে দর্শনের তৃষ্ণা যেন তার আর কিছুতেই মিটতে চায় না। সেই সঙ্গে তার মনে শুরু হয়ে গেল তোলপাড়। বারবার নিজের মনেই সে নিজেকে ধিক্কার দিতে শুরু করল। ভিতরের পাপবোধগুলো যেন তাকে বারবার পীড়া দিতে আরম্ভ করল। সেই অবস্থাতেই ধর্মেশ্বরকে দর্শন করে আবার সে ফিরে গেল নিজের রাজ্যে। আহ্বান জানাল প্রাচীন অমাত্যদের; সসম্মানে ব্রাহ্মণদের ডেকে পদে অধিষ্ঠিত করল, পুরবাসিদের আশ্বাস

দিল। অসাধুদের নির্মম সাজা দিল। রাজার এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে সকলেই বিস্মিত হল।

রাজা দুর্দম কিন্তু একাগ্রচিত্তে রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করে, পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে বনিতা, বিষয়, সবকিছু ত্যাগ করে চলে এল কাশীতে। আর বাকি জীবন ধর্মেশ্বরের পূজায় কাটিয়ে অন্তে মোক্ষলাভ করল।

[অধ্যায় ৮২—৮৪]

দেবদেব মহেশ্বর অতঃপর বীরেশ্বর লিঙ্গের আবির্ভাব কাহিনী যা বলেছিলেন পার্বতীকে, দেব ষড়ানন তা বললেন অগস্ত্যকে।

পুরাকালে অমিত্রতেজ নামে এক নরপতি ছিলেন। বহুবিধ বলবাহন-সম্পন্ন রূপবান যুবক সেই নরপতি ছিলেন অশেষ গুণের আধার। যেমন প্রজাবৎসল, তেমনি ধার্মিক। সত্যাশ্রয়ী সেই নৃপতির রাজত্বে যেমন ছিল সুখ, তেমনি শান্তি। রাজা নিজে ছিলেন অতীব বিষ্ণুভক্তপরায়ণ। তাঁর কাছে "কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ কৃষ্ণ এব পরাগতিঃ। কৃষ্ণ এব পরো বন্ধুস্তস্যাসীদবনীপতেঃ॥" (৮২/৩৪)—কৃষ্ণই পরমদেব, কৃষ্ণই পরম গতি, কৃষ্ণই ছিলেন পরম বন্ধু। রাজ্যের প্রজারাও ছিল তাই। আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে-মুখে সদা-সর্বদা গোবিন্দ, গোপালের নাম, তুলসী সেবা, আর ফলাকাঙ্ক্ষাহীন বাসুদেব-চরণে সমর্পিত কাজ নিয়েই সম্পূর্ণ নিরামিশাষী ছিল তারা।

একদিন দেবর্ষি নারদ এলেন তাঁর কাছে। রাজা মধুপর্কবিধানে তাঁর যথোচিত আপ্যায়ন করলে নারদ বললেন—'রাজা, তুমি সমস্ত ভূতেই ভগবান গোবিন্দকে দর্শন করে নিজে যেমন ধন্য হয়েছ, দেবগণের কাছেও তেমনি মাননীয় হয়েছ।'

"অনয়া বিষ্ণুভক্ত্যা তে সন্তুষ্টেন্দ্রিয়মানসঃ।
উপকর্তুমনা ব্রূয়াৎ তন্নিশাময় ভূপতে॥" (৮২/৪৬)

—তোমার অনন্য বিষ্ণুভক্তিতে আমার মন ও ইন্দ্রিয় সন্তুষ্ট হয়েছে। তাই তোমার উপকার করবার ইচ্ছায় কিছু বলছি, শোন।

'হাটকেশ্বর থেকে আসার পথে মলয়গন্ধিনী নামে এক বিদ্যাধর কন্যা আমাকে দেখতে পেয়ে সজল নয়নে বললে, গন্ধমাদন পর্বতে সে যখন খেলা করছিল তখন দানব কপালকেতুর দুর্বৃত্ত পুত্র কঙ্কালকেতু মায়াবলে তাকে হরণ করে এনে রেখেছে চম্পকাবতী নগরীতে। আগামী তৃতীয়াতে সে তাকে জোর করে বিয়ে করবে। পরিত্রাণের আশায় সেই কন্যা ভগবতীর কাছে আকুল আবেদন জানালে, ভগবতী তাকে আশ্বাস দিয়েছেন—আগামী তৃতীয়াতে বিষ্ণুভক্ত এক বুদ্ধিমান যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। ভগবতীর এই কথা যাতে সত্য হয়, কন্যা আমাকে তার চেষ্টা করতে বলেছে। দুর্বৃত্ত কঙ্কালকেতু কিন্তু নিজের ত্রিশূল ছাড়া আর কোন অস্ত্রেই বধ্য নয়।

কন্যার এই কথা শুনে, অমিত্রজিৎ, আমি তোমার কাছেই এসেছি। কারণ, তুমিই একমাত্র সেই বুদ্ধিমান এবং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ যুবক। তুমি সত্বর গিয়ে সেই দুর্বৃত্তকে বিনাশ করে মলয়গন্ধিনীকে গ্রহণ কর।'

অমিত্রজিৎও চম্পকাবতী নগরীতে যাবার উপায় জিজ্ঞেস করলে নারদ বললেন—'তুমি অর্ণবপোত নিয়ে এখনি সমুদ্রে যাও। অর্ণবপোতে থাকতে থাকতেই পূর্ণিমার দিন দেখবে সমুদ্রজল ভেদ করে উঠবে এক রথ। সেই রথে থাকবে এক কল্পবৃক্ষ। সেই কল্পবৃক্ষে দেখবে দিব্য-পর্যঙ্কে শায়িতা এক দেবকন্যা বীণা নিয়ে মধুর স্বরে এই গাথা গান করছে!

"যৎকর্ম্ম বিহিতং যেন শুভং বাথ শুভেতরম্।
স এব ভুঙ্‌ক্তে তত্তথ্যং বিধিসূত্রনিয়ন্ত্রিতঃ॥" (৮৩/৬৩)

—যে ব্যক্তি শুভ বা অশুভ কর্ম করেছে, বিধাতার নিয়মে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই তার ফলভোগ করবে।

এই গাথা গান করেই সেই দেবী রথ কল্পবৃক্ষ এবং পর্যঙ্ক-সহ সমুদ্র-মধ্যে প্রবেশ করবে। তুমিও তৎক্ষণাৎ নিঃশঙ্কচিত্তে অর্ণবপোত থেকে ভগবান যজ্ঞবারাহকে স্মরণ করে ঝাঁপ দিয়ে সমুদ্রে সেই দেবীর অনুগমন

করবে। দেখবে, তুমি পৌঁছে গেছ চম্পকাবতী নগরীতে আর সামনেই দেখতে পাবে সেই কন্যাকে।' এই কথা বলে নারদ চলে গেলেন।

রাজা অমিত্রজিৎও আর কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ অর্ণবপোত নিয়ে সমুদ্রে গেলেন। নারদ যেমনটি বলেছিলেন, রাজাও ঠিক তাই দেখলেন এবং তাকে অনুসরণ করে সমুদ্রমধ্যে এসে, গেলেন সেই নগরীতে। দোলা-পর্যঙ্কে শুয়ে ছিল কন্যা। হঠাৎ ভুজদ্বয়ে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন, বিশাল বক্ষে তুলসীমালা শোভিত বিশালকায় যুবা-পুরুষকে দেখে সচকিতে দোলা থেকে উঠে, তাঁকেই তার পরিত্রাতা-জ্ঞানে সলজ্জ অথচ নির্ভীক আপ্যায়ন জানাল। রাজাও তাকে দেখে রীতিমত মোহিত হলেন। কঙ্কালকেতু তখন প্রাসাদে ছিল না। পাছে এসে দেখা-মাত্রই দুর্বৃত্ত তার পরিত্রাতাকে ত্রিশূল প্রহার করে এই আশঙ্কায় সে নৃপতিকে লুকিয়ে রাখল গোপন শস্ত্রাগারে।

সন্ধ্যায় ফিরল উন্মত্ত কঙ্কালকেতু। সুপ্রচুর দিব্যরত্ন এনে রাখল কন্যার-সামনে। কন্যার পাণিগ্রহণ করতে এখনও মাঝে দুটো দিন। অস্থির কঙ্কালকেতু প্রকাশ করল অনেক প্রগলভতা। তারপর নিজের কোলে ত্রিশূল রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

মলয়গান্ধনী তাকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেখে, তার কোল থেকে ত্রিশূল তুলে নিয়ে রাজার হাতে দিয়ে বলল—'এই ত্রিশূল-ছাড়া ও বধ্য নয়। রাজা, এবার সত্বর আপনি ওকে বধ করুন।'

ঘুমন্ত কঙ্কালকেতুকে কিন্তু আঘাত হানলেন না অমিত্রজিৎ। চক্রধারী শ্রীহরিকে স্মরণ করে বাঁ-পা দিয়ে সজোরে তাকে লাথি মারতেই ধড়মড় করে উঠে আগন্তুককে দেখে যেমন বিস্মিত হল, তেমনি ক্রোধারুণ হয়ে উঠল। শত্রুজয়ী ত্রিশূল তার পরহস্তগত। বারবার চেয়েও যখন সে তা পেল না, তার ভুজবলের ওপরই অসীম আস্থা নিয়ে রাজার বুকে হানল এক ভীম-আঘাত। চক্রধারী যাঁর রক্ষক, আঘাত তার কি করতে পারে? যে আঘাতে শিলাও খণ্ড-খণ্ড হয়ে যায় সে আঘাতেও অটল সামান্য একজন ভক্ত্য মানুষ। অতঃপর অমিত্রজিতের এক চপেটাঘাতে কঙ্কালকেতু যখন লুটিয়ে পড়ল, তখন সে বুঝল তার

প্রতিপক্ষ সামান্য মানুষ নয় ; সন্দেহ হল বুঝিবা সেই নররূপী চতুর্ভুজ। বলল—'ছলে কৌশলে ত্রিশূল যখন তুমি হস্তগত করেছ, তখন মৃত্যু আমার নিশ্চিত। তবে বিনা যুদ্ধে নয়। তোমারই জন্য লক্ষ্মীস্বরূপা এই বিদ্যাধর-কন্যাকে আমি এখানে এনে অক্ষতা অবস্থায় রক্ষা করে রেখেছি। কিন্তু আমাকে না মেরে তুমি একে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবে না।' এই বলে কঙ্কালকেতু রাজাকে বাম হাত দিয়ে আঘাত হানতেই রাজা তারই ত্রিশূল তারই বুকে আমূল বিদ্ধ করলে, দানব প্রাণত্যাগ করল।

ঠিক সেই সময়েই নারদ আবার সেখানে এসে হাজির হলেন এবং বিবাহ-বিধির দ্বারা তাদের অভিষিক্ত করে প্রস্থান-পথ দেখিয়ে দিলেন। সেই পথে মলয়গন্ধিনী-সহ অমিত্রজিৎ ফিরে এলেন বারাণসীতে। স্বরাজ্যে স্বধর্ম কামসেবায় বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর রাজ্ঞী মলয়গন্ধিনী স্বামীর অনুমতি নিয়ে পুত্র-কামনায় অভীষ্ট-তৃতীয়া ব্রত উদ্‌যাপন করলেন।

স্তনপানকারী শিশুর সঙ্গে গৌরীর যথাবিহিত পূজা এবং ব্রত উদ্‌যাপনের পর রাজ্ঞী হলেন সন্তানসম্ভবা। দেবী গৌরীর কাছে প্রার্থনা জানালেন রাজ্ঞী ঃ

"পুত্রং দেহি মহামায়ে সাক্ষাদ্বিষ্ণ্বংশসম্ভবম্ ॥
জাতমাত্রো ব্রজেৎ স্বর্গং পুনরায়াতি চাত্র বৈ।
ভক্তঃ সদাশিবেঽত্যর্থং প্রসিদ্ধ সর্ব্বভূতলে ॥
বিনৈব স্তন্যপানেন ষোড়শাব্দাকৃতিঃ ক্ষণাৎ।
এবম্ভূতঃ সুতো গৌরী যথা মে স্যাত্তথা কুরু ॥" (৮৩/২০-২২)

—হে মহামায়ে! আপনি আমাকে বিষ্ণুর অংশসম্ভূত একটি পুত্র দিন। যে বালক জন্মগ্রহণ করেই স্বর্গে যাবে আবার এখানে ফিরে আসবে, সদাশিবের পরমভক্ত বলে প্রসিদ্ধ হবে। হে গৌরী! স্তন্যপান ছাড়াই সেই বালক ক্ষণকালমধ্যেই ষোল বছরের বালকের আকৃতি ধারণ করবে, এমনি একটি সন্তান আমার যাতে হয়, তাই করুন।

মৃড়ানীও ভক্তিমতী রাজ্ঞীর অভিলাষ যাতে পূর্ণ হয় সেই বর

দিয়ে চলে গেলেন।

যথাসময়ে রাজ্ঞীর পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। হিতৈষী মন্ত্রীরা দেখলেন, জাতকের জন্ম হয়েছে মূলা-নক্ষত্রে। রাজ্ঞীর কাছে এসে মন্ত্রীরা বললেন,—'যদি পতির মঙ্গল চান, তাহলে দুষ্ট নক্ষত্রে-জাত এই পুত্রকে আপনায় পরিত্যাগ করতে হবে।' রাজ্ঞী হলেন রাজ্ঞী। ধাত্রীকে ডেকে বললেন—'পঞ্চমুদ্রা নামে যে মহাপীঠ আছে সেখানে বিকটা নামে এক মাতৃকা আছে। এই পুত্রকে সেখানে রেখে মাতৃকাকে বলে আসবে—"গৌর্য্যা দত্তঃ শিশুরসৌ তবাগ্রে বিনিবেদিতঃ॥ রাজ্ঞ্যা পত্যুঃ প্রিয়ৈষিণ্যা মন্ত্রিবিজ্ঞপ্তিমুন্নয়া।" (৮৩/২৭-২৮)—গৌরীপ্রদত্ত এই শিশুটিকে পতিপ্রিয়ৈষিণী রাজ্ঞী মন্ত্রিগণের প্রেরণায় আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। রাজ্ঞীর আজ্ঞায় ধাত্রীও জাতককে রেখে এল বিকটাদেবীর কাছে। দেবীও সঙ্গে-সঙ্গে যোগিনীদের ডেকে শিশুটিকে মাতৃগণের কাছে নিয়ে সযত্নে রক্ষা করার আদেশ দিলেন। যোগিনীরাও আকাশপথে শিশুকে নিয়ে গেল ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা, চণ্ডী প্রভৃতি মাতৃকাগণের কাছে। অনুপম এই শিশুকে দেখা মাত্রই তাঁরা বুঝলেন, লক্ষণাক্রান্ত এই শিশু পরে রাজা হবে। জানতে চাইলেন জাতকের কাছে তার বাবার নাম। নিরুত্তর শিশু। মাতৃগণ তখন যোগিনীদের বললেন—'একে কাশীতে মহাসিদ্ধপীঠ কামদা পঞ্চমুদ্রাদেবীর কাছে নিয়ে যাও।' যোগিনীরাও সঙ্গে-সঙ্গে তাকে আবার মর্ত্যে নিয়ে এসে কাশীতে সেই মহাপীঠে রেখে গেল। জাতকও সেখানে স্থিরচিত্তে তপস্যামগ্ন হল। তার তপস্যার প্রভাবে সর্ব-জ্যোতির্ময় উমাপতি সপ্তপাতাল ভেদ করে লিঙ্গরূপে তার সামনে আবির্ভূত হয়ে তাকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। তপস্যাক্লিষ্ট রোমাঞ্চিত-তনু বালক প্রার্থনা জানালেন :

"দেববেদ মহাদেব যদি দেয়ো বর মম।
তদত্র ভবতা স্থেয়ং ভবতাপ্যন্থতা সদা॥
অস্মিঁল্লিঙ্গে স্থিতং শম্ভো কুরু ভক্তসমীহিতম্।

বিনা মুদ্রাদিকরণং মন্ত্রেণাপি বিনা বিভো ॥
দিশ সিদ্ধিং পরমাত্র দর্শনাৎ স্পর্শমাত্রতেঃ।
অস্য লিঙ্গস্য যে ভক্তা মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥” (৮৩/৪৯-৫১)

—দেবদেব মহাদেব, আমাকে যদি বরই দেন, তাহলে আমার ইচ্ছা আপনি সর্বদা এই লিঙ্গমধ্যে অবস্থান করুন। হে শম্ভু, হে বিভু এইখানে অবস্থান করে মুদ্রাদি এবং মন্ত্র-ব্যতিরেকেই কেবল দর্শন, স্পর্শন এবং প্রণামে আপনি ভক্তদের অনুগ্রহ করুন। কায়মনোবাক্যে-ও কর্মে যাদের এই লিঙ্গে ভক্তি আছে তাদের আপনি কৃপা করুন।

লিঙ্গরূপ মহাদেব বালকের এই প্রার্থনায় সম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন—‘তুমি বৈষ্ণবপ্রধান অমিত্রজিতের পুত্র। আমার এই লিঙ্গ তোমারই নামে ‘বীরেশ্বর’ লিঙ্গরূপে আখ্যাত হবে। তুমি রাজাদেরও দুর্লভ রাজ্য লাভ করে; উপভোগ করে, অন্তে সিদ্ধিলাভ করবে। কাশীমধ্যে হয়গ্রীব, গজ, হংস, চৌর, সাগর, সপ্তসাগর প্রভৃতি যাবতীয় তীর্থ এবং তিনকোটি লিঙ্গ বিদ্যমান রয়েছে। তার মধ্যে বীরেশ্বর লিঙ্গ হবে মহাশ্রেষ্ঠ এবং জীবিতাবস্থাতেই তারকজ্ঞানের মহাক্ষেত্র হবে।’

[অধ্যায় ৮৫]

“অতঃপর স্কন্দদেব মহামুনি অগস্ত্যকে বললেন ‘কামেশ্বর’-এর ইতিবৃত্ত।

পুরাকালে একদিন মহাতেজা, মহাক্রোধী, মহাতপস্বী দুর্বাসা সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে-করতে উপস্থিত হলেন আনন্দকাননে। বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদ, কুণ্ড, ঋষিদের রমণীয় কুটীর; বিভূতিভূষিত জটাজুটধারী, কৌপীনবাস তাপস, তার ওপর শান্ত পরিবেশ দেখে, স্থানটি খুবই ভাল লেগে গেল দুর্বাসার এবং চঞ্চল চিত্তবৃত্তিকে শান্ত করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র মনে করে সেখানেই তপস্যা আরম্ভ

করলেন। বহুকাল কাটল তপস্যায়। কিন্তু কোন ফলোদয় ঘটল না দেখে, দুর্বাসার সুপ্ত ক্রোধ গর্জন করে উঠল। নিজেকে তো ধিক্কার দিলেনই, উপরন্তু শিবক্ষেত্র কাশীকে ধিক্কার দিয়ে শাপ দিতে উদ্যত হলেন। অনন্ত ক্রোধের আধার হলেও মহাতাপস দুর্বাসার এই কাণ্ড দেখে, মহেশ্বর হাসতে-হাসতে লিঙ্গরূপে সেখানে আবির্ভূত হলেন। সেই লিঙ্গের নাম হল, প্রহসিতেশ্বর।

কিন্তু দুর্বাসাকে শাপদান থেকে নিরত করার আগেই তাঁর ক্রোধানল কাশীর আকাশে-বাতাসে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

"তৎক্রোধানলধূমৌঘৈর্ব্ব্যাপিতং যন্নভোঽঙ্গনম্।
তদ্দধাতি নভোঽদ্যাপি নীলিমানং মহত্তরম্॥" (৮৫/২৮)

—সেই ক্রোধানলের ধোঁয়া গগন পরিব্যাপ্ত করে যে নীলিমা ধারণ করেছিল, আজ পর্যন্ত গগন সেই মহত্তর নীলিমাকে ধারণ করে আছে।

মহাক্ষেত্রে হঠাৎ এমন একটা বিপর্যয় দেখে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসে উঠল প্রমথের সেই নন্দী, নন্দিষেণ, মহোদর প্রভৃতি শতকোটি গণেরা, যারা ছিল সবসময়ই সজাগ পাহারার মধ্যে। বিরাট কোলাহলে সেই ধূমাগ্নি নিবারণ করতে-করতে প্রভঞ্জনের গতি রোধ করে তারা সরোষে এগিয়ে আসতে লাগল উৎপত্তিস্থলের দিকে। প্রহসিতেশ্বর সেই লিঙ্গের কাছে আসা-মাত্রই দেব উমাপতি তাদের নিরস্ত করে বললেন—"মদংশ এব হি মুনিরানুসূয়েয় এষ বৈ।" (৪৯)—এই অনুসূয়া-পুত্র মুনি (দুর্বাসা) আমারই অংশ; এর কোন ক্ষতি তোমরা করো না। তারপর, মুনির শাপে কাশীতে যাতে নির্বাণলাভের বিঘ্ন না ঘটে, তার জন্যে সেই লিঙ্গ থেকে মহাতেজোময়রূপে দুর্বাসার সামনে আবির্ভূত হয়ে মহেশ্বর তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। দুর্বাসার তখন মোহ ভঙ্গ হল। নিজেই ক্রোধের জন্যে লজ্জিত হয়ে মনপ্রাণ দিয়ে কাশীর স্তুতি করলেন। দেব মহেশ্বর তাঁকে বললেন—'একমাত্র কাশীর স্তুতিই হল, শতকোটি যজ্ঞের ফল। তুমি মহামোহ থেকে মুক্ত হয়ে অবশ্যই পরমজ্ঞান লাভ করবে।' আর ক্রোধ!

"যস্যাস্ত্যেব হি সামর্থ্যস্তপসঃ ক্রুধ্যতীহ সঃ।
কুপিতোঽপ্যসমর্থস্তু কিং কর্তা ক্ষীণবৃত্তিবৎ ॥" (৮৫/৬৯)

—যার তপোবল আছে, তার ক্রোধ সাজে? অসমর্থ ব্যক্তির ক্রোধ হীনবৃত্তিরই পরিচায়ক।

রোমাঞ্চিত-তনু দুর্বাসা তখন কৃত্তিবাসের স্তুতি করে এই বর চাইলেন:

"দেবদেব জগন্নাথ করুণাকর শঙ্কর।
মহাপরাধবিধ্বংসিন্নন্ধকারে স্মরান্তক ॥
মৃত্যুঞ্জয়োগ্র ভূতেশ মৃড়ানীশ ত্রিলোচন।
যদি প্রসন্নো মে নাথ যদি দেয়ো বরো মম ॥
তদিদং কামদং লিঙ্গমস্ত্বিহ ধূর্জ্জটে।
ইদং চ পল্বলং মেঽত্র কামকুণ্ডাখ্যমস্তু বৈ ॥ (৮৫/৭১-৭৩)

—হে দেবদেব, জগন্নাথ, করুণাকর শঙ্কর! হে মহাপরাধবিধ্বংসি, অন্ধকরিপো, স্মরান্তক, মৃত্যুঞ্জয়, উগ্র, ভূতেশ, মৃড়ানীশ, ত্রিলোচন! হে নাথ! হে ধূর্জটে, যদি প্রসন্নই হয়ে থাকেন, তবে এই বর দিন, যে এই লিঙ্গ কামপ্রদ হবে এবং এই ক্ষুদ্র জলশয় কামকুণ্ড নামে খ্যাত হবে।

মহেশ্বর দুর্বাসার অভিলষিত প্রার্থনা পূরণ করে বলেছিলেন 'দুর্বাসেশ্বর' নামে তোমার প্রতিষ্ঠিত যে লিঙ্গ তা 'কামেশ্বর' নামে বিখ্যাত হবে আর এই কূপমধ্যে স্নান করলে বহুজন্মাকৃত পাপ থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করবে।

এই বলে মহেশ্বর অন্তর্হিত হয়েছিলেন। আর এই লিঙ্গের আরাধনা করে দুর্বাসারও কামনা পূরণ হয়েছিল।

[অধ্যায় ৮৬]

পার্বতী অতঃপর 'বিশ্বকর্মেশ্বর' লিঙ্গের উৎপত্তি-বিবরণ শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে দেবদেব মহাদেব তাঁকে যা বলেছিলেন, পার্বতী-নন্দন

ষড়ানন এবার তা বললেন মহামুনি অগস্ত্যকে।

ত্বষ্টৃ নামে প্রজাপতির এক পুত্র ছিল, নাম তার বিশ্বকর্মা। যথাকালে উপনয়ন দিয়ে মাতা-পিতা তাকে পাঠালেন জ্ঞানার্জনের জন্যে গুরুকুলে। দিবারাত্র বালক বিশ্বকর্মা গুরুসেবায় রত হল। তুলনা-রহিত সে গুরুসেবা। কিছুকাল চলার পর এল বর্ষাকাল। গুরুদেব শিষ্য বিশ্বকর্মাকে ডেকে বললেন—'বর্ষায় যাতে কোন কষ্ট না পাই, সেইরকম একটা পর্ণকুটীর নির্মাণ করে দাও। যেন কোনদিনই তা ভেঙ্গে না যায় বা জীর্ণ হয়ে না পড়ে।' গুরুপত্নী বললেন—'বিশ্বকর্মা, তুমি আমার জন্যে কেবলমাত্র বল্কল দিয়ে এমন একটা কঞ্চুক (জামা) তৈরী করে দাও যা আমার শরীরের ঠিক উপযুক্ত হয়,—আঁট-সাট হবে না, ঢিলেও হবে না আর কোনদিন ময়লা হবে না।' গুরুপুত্র বললে,—'তুমি চামড়া-ছাড়া এমন একটা জুতো আমায় তৈরী করে দাও, যা পায়ে দিয়ে গেলে কাদা লাগবে না, আরামবোধ হবে। জলে হক আর ডাঙাতেই হক, তাড়াতাড়ি যেতে পারি।' গুরুকন্যাও তাকে ডেকে বললে,—'বিশ্বকর্মা, আমার কানের উপযুক্ত দুটো সোনার অলঙ্কার নিজের হাতে তৈরী করে দাও। খেলা করার উপযোগী হাতির দাঁতের কিছু খেলনা আর ঘরের কাজ-কর্মের উপযোগী মুষল, উদুখল, পীঠ (পিঁড়ে), স্থালী (হাঁড়ি) কিছু-কিছু এমনভাবে তৈরী করে দাও, যাতে তা কখনও না ভাঙ্গে। আর, একখণ্ড কাঠ দিয়ে একথামওয়ালা এমন একটা ঘর তৈরী করে দাও, যাকে আমি ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে নিয়ে যেতে পারি।'

বিশ্বকর্মা তখন সবেমাত্র বালক আর এসব কিছুই করতে জানতেন না। অথচ গুরুর আদেশ। সম্মতি জানিয়ে মহাচিন্তায় পড়লেন। সেই সঙ্গে ভয়ে আকুল হলেন এই ভেবে যে, এগুলি করতে না পারলে হবে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন। তাতে গুরু বিরক্ত হবেন। আর শিষ্যের প্রতি গুরু বিরূপ হলে তার নরকেও স্থান হবে না।

উদ্বেলচিত্তে বিশ্বকর্মা উপায় চিন্তা করতে-করতে গুরুকুল থেকে বেরিয়ে প্রবেশ করলেন এক বনে। উদ্‌ভ্রান্ত, ঘুরছেন একা-একা

বনের মধ্যে। হঠাৎ দেখতে পেলেন এক সৌম্যকান্তি তাপসকে।

ব্রহ্মচারী বিশ্বকর্মা তাঁকে দেখা-মাত্র যেন মানসিক-আকুলতামুক্ত হলেন। মনে-মনে যেন একটু ভরসা পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—'তাপস, আপনি যে-ই হন, গুরুর আদিষ্ট এইসব কাজ করে কিভাবে গুরুকে সন্তুষ্ট করব, আমায় বলুন। আমায় সাহায্য করুন, তাপস।'

বিশ্বকর্মার সেই সকাতর অনুরোধে তাপস বললেন—'তুমি যদি আনন্দকানন কাশীতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের শরণাপন্ন হতে পার, তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারে, তাহলে তোমার অসাধ্য বলে কিছু থাকবে না। ব্রহ্মা যে সৃষ্টিকর্মে নিপুণ, তা একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহে। উপমন্যু তাঁর কাছে দুধ চেয়ে পেয়েছিলেন ক্ষীরসমুদ্র। তুমি যদি তাঁকে কাশীতে গিয়ে তুষ্ট করতে পার, তাহলে, তাঁর অনুগ্রহে তোমার বিশ্বকর্মা নাম সার্থক হবে।'

শুনে বিশ্বকর্মা আকুল হয়ে উঠলেন। বললেন,—'শম্ভুর সেই আনন্দকানন কোথায় তা তো আমি জানি না। কে আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে? কিভাবে সেখানে যাব?'

তাপস বললেন—'আমিও কাশীতে যাচ্ছি আমার এই মনুষ্য-জীবন সার্থক করার জন্যে। তুমি আমার সঙ্গেই যেতে পার।'

প্রফুল্লচিত্তে তাপস তাঁর অনুসরণ করে কাশীতে এলেন। কাশী প্রবেশের পরই সেই তাপস বিশ্বকর্মার চোখের সামনেই হঠাৎ যেন অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। আর কোথাও তিনি তাঁকে খুঁজে পেলেন না। পুলকিত বিশ্বকর্মা ভাবলেন, ইনি নিশ্চয়ই সেই অকুলের কাণ্ডারী স্বয়ং বিশ্বেশ্বর অনুগ্রহ করে তাপসের বেশে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে। ঈশ্বরের মহিমা বোঝে সাধ্য কার?

আর কালক্ষেপ না করে বিশ্বকর্মা অঙ্গারেশ্বরের উত্তরে একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে ফল-মূলভোজী হয়ে সংযতচিত্তে তিন বছর মহেশ্বরের পূজা করলেন। গুরুগত-চিত্ত বিশ্বকর্মার সেই সুদৃঢ় ভক্তি দেখে সন্তুষ্ট দেবদেব তাঁকে গুরু, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র ও কন্যার আদিষ্ট বস্তু

তৈরী করার সামর্থ্য দান তো করলেনই, তার ওপর সোনা প্রভৃতি ধাতু, কাঠ, পাথর, মণি, রত্ন, ফুল, বস্ত্র, জল, কন্দ, ফল, বল্কল থেকে শিল্পসম্মত দ্রব্য তৈরী, দেবালয় প্রাসাদ থেকে শুরু করে যতরকমের শিল্পকর্ম, নৃত্যগীত, যন্ত্রাদি, অস্ত্র-শস্ত্রাদি নির্মাণের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করে বললেন ঃ

"সর্ব্বেষাঞ্চ মনোবৃত্তিং ত্বং জ্ঞাস্যসি বরান্মম।
কিং বহূক্তেন যৎ স্বর্গে যৎ পাতালে যদত্র চ॥
অতিলোকোত্তরং কর্ম্ম তৎসর্ব্বং বেৎস্যসি স্বয়ম্॥
বিশ্বেষাং বিশ্বকর্ম্মাণি বিশ্বেষু ভুবনেষু চ।
যতো জ্ঞাস্যসি তন্নাম বিশ্বকর্ম্মেতি তেঽনঘ॥" (৮৬/৮২-৮৪)

—তুমি আমার বরে সকলের মনোবৃত্তি জানতে পারবে। এর বেশী আর কি বলব—স্বর্গে, পাতালে, মর্তে যত লোকোত্তর কর্ম আছে, তুমি আপনা থেকেই তা জানতে পারবে। হে অনঘ! বিশ্বভুবনের বিশ্বকর্মনিচয় তোমার যেহেতু গোচরে থাকবে, সেহেতু তোমার নাম বিশ্বকর্মা।

বিশ্বকর্মা প্রার্থনা জানালেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের প্রভাবে যেন ব্যক্তিমাত্রেরই সদ্বুদ্ধির উদয় হয়। আর বিশ্বেশ্বরের জন্যে তিনি নিজে একটা প্রাসাদ নির্মাণ করতে ইচ্ছুক, কবে তা তিনি করতে পারবেন।

দেবদেব তাঁর প্রথম প্রার্থনা মঞ্জুর করে বললেন,—'ব্রহ্মার বরে দিবোদাস হবেন কাশীর রাজা। গণেশের মায়ায় রাজ্য থেকে বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে, বিষ্ণুর সদুপদেশে তিনি যখন রাজ্য পরিত্যাগ করে মোক্ষ লাভ করবেন, তখন তুমি আমার জন্যে নতুন প্রসাদ নির্মাণ করে দেবে।

এখন গুরুকুলে গিয়ে গুরুর আদিষ্ট কাজ শেষ কর তারপর এখানে এসে অবস্থান করবে।' এই বলে দেবদেব লিঙ্গমধ্যে অন্তর্হিত হলেন।

বিশ্বকর্মা ফিরে গুরুর, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র এবং কন্যার অভিলাষ পূরণ করে আশীর্বাদ নিয়ে গৃহে মাতা-পিতার কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন। তারপর তাঁদের অনুমতি নিয়ে সেই যে কাশীতে ফিরে অবস্থান করতে

শুরু করলেন, আজও সেখানেই আছেন। আর সেই থেকে আজও বিশ্বকর্মেশ্বর লিঙ্গ ভক্তজনের সুবুদ্ধিদায়ক হয়ে বিরাজ করছেন ক্ষেত্রে।

[অধ্যায় ৮৭—৮৯]

মহামুনি অগস্ত্য অতঃপর উৎসুক হলেন দক্ষেশ্বর-আদি লিঙ্গের বৃত্তান্ত শোনার জন্য। জিজ্ঞেস করলেন ঃ

যো দক্ষো গর্হয়ামাস মধ্যেদেবসভং বিভুম্।
স কথং লিঙ্গমীশস্য প্রত্যস্থাপয়দদ্ভুতম্॥" (৮৭/৫)

—যে দক্ষ দেবসভার মধ্যে মহেশ্বরের নিন্দা করেছিলেন, তিনি কেন মহেশ্বরের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? এতো বড় অদ্ভুত ব্যাপার?

দেব স্কন্দ বললেন, একসময় ব্রহ্মাকে পুরোভাগে রেখে বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি লোকপাল, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিদ্যাধর, উরগ, ঋষি, অপ্সরা, যক্ষ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ আর চারণগণ একবার কৈলাসে গিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর শম্ভুর পূজা করতে। মহেশ্বরের দর্শন লাভ করে, পুলকিত অন্তরে তাঁরা স্তব-স্তুতি করে তাঁরই সামনে নিজ নিজ আসনে বসলেন। ভগবান শঙ্কর বিষ্ণুর হাত ধরে সাদর-সম্ভাষণে জানতে চাইলেন তাঁর কুশল-বার্তা; জানতে চাইলেন, কোথাও কোন অধর্মাচার দেখা দিয়েছে কি না। অতঃপর সেইভাবেই কুশল-বার্তা নিলেন ব্রহ্মার, ইন্দ্রাদি-লোকপালের। কুশল-বিনিময় শেষ করে মহেশ্বর নিজ আসন থেকে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে গেলে দেবতারাও যে যার নিজ ধামে প্রস্থান করলেন।

পথিমধ্যে, দক্ষের মনে জাগল দারুণ ক্ষোভ। সম্পর্কে তিনি মহেশ্বরের শ্বশুড়,—তাঁর কন্যা সতীর পতি, সুতরাং সম্মানীয়। মহেশ্বর তাঁকে সেই যোগ্য সম্মান না দেখিয়ে দেবগণের সঙ্গে সমান চোখে দেখে, তাঁকে প্রকারান্তরে অপমানই করলেন। মনে-মনে ভাবতে লাগলেন, তিনকুলের কোন পরিচয়ই যাঁর নেই, নেই যাঁর কোন নির্দিষ্ট আবাস,

শ্মশান-মশানবাসী, অর্ধনারীমূর্তিধারী, নাগভূষণ, মহেশ্বর আমার কন্যাকে লাভ করে এতই গর্বোদ্ধত যে, গুরুজন দেখলে আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে সম্ভাষণ জানাতে হয়, সেই ভদ্রতা-বোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন! নির্গুণ, কুলহীন, কর্মভ্রষ্টের এই ধৃষ্টতা অসহ্য! আমি স্বয়ং দক্ষ—আমার কন্যা রোহিনীর প্রেমানুরক্ত চন্দ্র, কৃত্তিকাদির প্রতি অনাদর করার ফলে আজও আমার শাপে ক্ষয়গ্রস্ত হয়ে রয়েছে। আর তার কাছে এই শ্মশানবাসী ত তুচ্ছ। এই ঔদ্ধত্যের যোগ্য জবাব আমি মহেশ্বরকে দেব।

কিভাবে সেই জবাব দেওয়া যায়, তার উপায় উদ্ভাবন করে তিনি একদিন ইন্দ্রাদি দেবগণকে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে বললেন,—'আমি একটা যজ্ঞ করতে ইচ্ছে করেছি। আপনারা তার যাবতীয় সামগ্রী যোগাড় করে দিয়ে আমাকে যজ্ঞকালে সাহায্য করুন। এরপর তিনি শ্বেতদ্বীপে গিয়ে যজ্ঞপুরুষ নারায়ণকে যজ্ঞের উপদেষ্টার পদে, ব্রহ্মবাদী সব ঋষিদের যজ্ঞে ঋত্বিক পদে বরণ করে এলেন।

শুরু হল দক্ষের সেই মহাযজ্ঞ। শুভদীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছেন দেবী শতরূপা-সহ স্বয়ং দক্ষ। ইন্দ্রাদি দেবগণ, সাক্ষাৎ অগ্নি, নিখিল মন্ত্র, যজ্ঞপুরুষ নারায়ণ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, কর্মকাণ্ডবিদ স্বয়ং ভৃগু সকলেই সমাগত হয়েছেন সেই যজ্ঞে। দেবাচার্য বৃহস্পতি নিজে হয়েছেন আচার্য। সূর্য, প্রসূতি, দিকপালেরা যজ্ঞ রক্ষা করছেন। দক্ষ-জামাতা ধর্ম, তাঁর দশ-পত্নীসহ, অপর জামাতা ওষধিনাথ দ্বিজরাজ, সাতাশ পত্নী-সহ, মহর্ষি মারীচ, প্রজাপতি শ্রেষ্ঠ কশ্যপ সকলেই যজ্ঞকালে স্ব-স্ব কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন। কামধেনু সুরভি এসে দিচ্ছেন ঘি, কল্পবৃক্ষ একাই যুগিয়ে চলেছেন সমিধ, কুশ, কাঠের পাত্র, শকট, মণ্ডপ। বিশ্বকর্মা অভ্যাগত আর ঋত্বিকদের জন্যে নির্মাণ করে চলেছেন অলঙ্কার; অষ্টবসুগণ ধন এবং বস্ত্র প্রদান করছেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী রমণীদের সাজিয়ে দিচ্ছেন।

সেই মহতী যজ্ঞক্ষেত্রে এলেন দধীচি। তিনি সব কিছু ভালভাবে দেখে ব্রতী দক্ষকে বললেন,—'তুলনাহীন এই যজ্ঞ সচরাচর কেউ করতে

পারেন না। আপনি তা করতে পেরেছেন দেখে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে। সকলকেই এই যজ্ঞে উপস্থিত দেখতে পেলেও, সব কিছু দিয়ে একে আপনি সম্পূর্ণ করলেও, আমার কাছে একে প্রাণহীন লাগছে।

"জীবহীনো যথা দেহো ভূষিতোঽপি ন শোভতে।

তথেশ্বরং বিনা যজ্ঞঃ শ্মশানমিব লক্ষ্যতে॥" (৮৭/৬৭)

—প্রাণহীন দেহ ভূষিত হলে যেমন শোভা পায় না, সেইরকম ঈশ্বর বিনা এই যজ্ঞ (আমার কাছে) শ্মশানের মত মনে হচ্ছে।'

দধীচির এই মন্তব্যে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন দক্ষ। বললেন,—

"ভবান্ কেন সমাহূতো যদত্রাগান্মহাজড়ঃ।

আগতোঽপি হি কেন ত্বং পৃষ্ট ইত্থং ব্রবীষি যৎ॥" (৮৭/৭২)

—অরে মহাজড়! তুমি কার আহ্বানে এখানে এসেছ? এসে এসব কথা কেন বলছ? যজ্ঞের ভাল-মন্দ বিষয় কে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে?

সর্বমঙ্গলের মঙ্গলভূত যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরি সাক্ষাৎ যেখানে বিরাজমান, তেত্রিশ কোটি দেবতার অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র, ধর্ম-অধর্মের তত্ত্বজ্ঞাতা স্বয়ং ধর্মরাজ, কুবের, অগ্নি যেখানে স্বয়ং বর্তমান, দেবাচার্য যে যজ্ঞের আচার্য, বসিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিরা যে যজ্ঞের ঋত্বিক, তাকে তুমি শ্মশান ক্ষেত্র বলে অপমান কর, কোন স্পর্ধায়।

দধীচি বললেন,—'দক্ষ প্রজাপতি, ক্রোধ সংবরণ করে আমি যা বলি, শোন। শ্রীহরি যজ্ঞপুরুষ হলেও বেদ এঁকে বলেছেন শাম্ভবী শক্তি। "বামাঙ্গং স্রষ্টুরাদ্যস্য হরিস্তদিতরদ্বিধিঃ॥" (৮০)—আদিপুরুষ ভগবান মহেশ্বরের বামাঙ্গ বিষ্ণু আর দক্ষিণাঙ্গ হলেন বিধাতা ব্রহ্মা। দেবরাজ ইন্দ্র দুর্বাসার কোপে রাজ্যশ্রী হারিয়ে ভূতনাথকে সন্তুষ্ট করে তবে তো আবার অমরাবতী ফিরে পেয়েছিলেন। শ্বেত-নামে এক ভক্তকে নিজ সভায় আনতে গিয়ে ধর্মরাজের ধর্মজ্ঞান যে কতখানি, তার পরিচয় তিনি দিয়ে রেখেছেন। বসিষ্ঠাদি মুনিরা যে আপনার যজ্ঞে ঋত্বিক কর্ম করছেন, এ আপনার সৌভাগ্য। আপনি এই যে যজ্ঞ করছেন, এই যজ্ঞের একমাত্র ফলদাতা হলেন যজ্ঞাধিপতি

বিশ্বেশ্বর। তাঁর অনুপস্থিতির কারণেই এ যজ্ঞ এত আয়োজন সত্ত্বেও নিস্ফলা হবে। হয়ত আপনি বিস্মৃত হয়েছেন তাঁকে আহ্বান জানাতে। শুনুন দক্ষ, অর্থহীন বাক্য, ধর্মবিহীন শরীর, পতিহীনা নারী, গঙ্গাহীন দেশ, পুত্রহীন গৃহ, দানহীন সম্পত্তি, মন্ত্রিহীন রাজ্য, স্ত্রীহীন সুখ, কুশবিহীন সন্ধ্যা, তিলহীন তর্পণ, ঘৃতহীন হোম যেমন নিষ্ফল—শিবহীন ক্রিয়া, শিবহীন যজ্ঞও সেইরকম। যজ্ঞের যদি সুফল চান দক্ষ, তবে, এই ব্রাহ্মণের কথা শুনে সেই এক এবং অদ্বিতীয় ভূতভাবনকে যজ্ঞস্থলে আনুন।'

দক্ষ প্রজাপতি এইসব শুনে আরও রেগে গিয়ে বললেন—'আমার যজ্ঞ-সম্বন্ধে তোমার অত চিন্তা কেন? কে বলেছে, ঈশ্বর ফলদাতা? ঈশ্বর সাক্ষীমাত্র। যজ্ঞ কাজ যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হলে তার ফল অবশ্যই পাওয়া যায়।'

দধীচিও প্রত্যুত্তর দানে বিরত নন। ঐশ্বর্যমদে মত্ত দক্ষ প্রজাপতির রাগও উত্তরোত্তর এমনি বেড়ে গেল যে লোকজন ডেকে দধীচিকে যজ্ঞভূমি থেকে বের করে দিলেন। তাই দেখে, দুর্বাসা, চ্যবন, উতঙ্ক, উদ্দালক, উপমন্যু, ঋচীক, মাণ্ডব্য, বামদেব, গালব, গর্গ, গৌতম এবং আরো অনেক শিবতত্ত্ববিদ, বেরিয়ে এলেন যজ্ঞস্থল থেকে। বেরিয়ে আসার সময় নিরহঙ্কারী, নির্মল-হৃদয় দধীচি হাসতে-হাসতে দক্ষকে বলে গেলেন—

"কিং মাং দূরয়সে মূঢ় দূরীভূতো ভবানপি।
সর্ব্বেভ্যো মঙ্গলেভ্যশ্চ সর্বৈর্রেভিঃ সমং ধ্রুবম্॥
অকাণ্ডে ক্রোধজো দণ্ডস্তব মূর্দ্ধ্নি পতিষ্যতি।
মহেশিতুস্ত্রিজগতী পরিশাস্তুঃ প্রজাপতে॥" (৮৭/১১২-১১৩)

—আরে মূঢ়! আমাকে দূর করে দিলে? জেনো তুমিও আজ থেকে মঙ্গল থেকে দূরীভূত হলে। প্রজাপতি, অচিরেই তোমার মস্তকে ত্রিজগৎ পরিশাসক মহাদেবের ক্রোধদণ্ড এসে পড়বে।

দধিচীর সঙ্গে সবাই চলে গেলে, অন্যান্য যেসব ব্রাহ্মণ সেখানে ছিলেন, তাঁদের দ্বিগুণ দক্ষিণা দিয়ে, জামাতৃগণকে বহু ধন দান করে,

দিগঙ্গনাদের পরিতৃপ্ত করে মহা-সমারোহে শুরু হল যজ্ঞ।

এদিকে নারদমুনি আকাশমার্গ অবলম্বন করে উপস্থিত হলেন শিব-সদন কৈলাসে। দেখলেন, সতীর সঙ্গে মহাদেব অক্ষক্রীড়ায় রত। মহাদেব একপলক নারদকে দেখে, সম্ভাষণ জানিয়ে আবার খেলায় তন্ময় হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ তা বসে বসে দেখলেন নারদ তারপর শুরু করলেন বাকচাতুর্য।

দেবদেব! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই তো আপনার খেলা। সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয় নিয়ে আপনাদের এ খেলা চিরন্তন।

"দেবীজয়ে ভবেৎ সৃষ্টিরসৃষ্টির্ধূর্জ্জটের্জ্জয়ে॥" (৮৮/৭)

—এই খেলায় যখন দেবীর জয় হয়, তখন হয় সৃষ্টি, ধূর্জটির যখন জয় হয়, তখন হয় প্রলয়।

"ভবতোঃ খেলসময়ো যঃ সা স্থিতিরুদাহৃতা।
ইত্থং ক্রীড়ৈব সকলমেতদ্ ব্রহ্মাণ্ডমীশয়োঃ॥" (৮৮/৮)

—যত কাল চলবে আপনাদের এই খেলা, ততকালই স্থিতি। তাই এ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই আপনাদের ঈশ্বর-ঈশ্বরীর খেলা।

এখন, হে জগজ্জননী, আপনাকে কিছু বলতে চাই। আপনি পাতিব্রত্যে এতই বিভোরা যে পতির চরণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। এইখানেই আমার যত ব্যথা। আপনার পতি মহেশ্বর তো সব জেনেও কিছুই জানেন না, সকলের মধ্যে থেকেও উদাসীন, নির্বিকার। আপনি তাঁরই শক্তি, দক্ষ কন্যা হলেও দক্ষেরও মাননীয়া।

তবুও দক্ষালয়ে যা দেখলাম, যা শুনে এলাম তা আপনাদের না বলে যে থাকতে পারছি না। নীলপর্বত থেকে তাই তো ছুটে এলাম এখানে।

দক্ষালয়ে দক্ষ এক সুবিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। ত্রিভুবনে যত পুরুষ আছেন তাঁদের সকলকেই সস্ত্রীক সেই মণ্ডপে দেখলাম। দেখলাম নতুন-নতুন বসন-ভূষণে, নতুন-নতুন অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে সকলেই আনন্দে বিভোর। যাঁর ঐশ্বর্য নিয়ে তাঁরা ঐশ্বর্যমণ্ডিত, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের যাঁরা অধীশ্বর, সেই আপনাদের সেখানে দেখতে না পেয়ে,

আমার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু তাদের সেদিকে কোন দৃকপাতই নেই। দধীচি সহ্য করতে না পেরে তো দক্ষকে অভিশাপ দিয়ে মণ্ডপ থেকে চলে গেলেন, ব্রহ্মাও মণ্ডপ ত্যাগ করেছেন। শিবনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দুর্বাসা-প্রমুখ আরো কিছু ঋষি চলে গেলেন। সে নিন্দাবাক্য শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। এত বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে দক্ষ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন দেখে আমিও আর সহ্য করতে না পেরে এখানে চলে এলাম। দেবাদি-দেব মহেশ্বর, আপনাকে ছাড়াই দক্ষ যদি যজ্ঞে সাফল্য লাভ করে, তাহলে এরপর থেকে আপনাকে কে আর গ্রাহ্য করবে। সকলে দক্ষকেই মেনে চলবে যে।

মন দিয়ে সব শুনলেন সতী। এ-ও শুনলেন একমাত্র তিনি আর তাঁর স্বামী ছাড়া, তাঁর সবই ভগিনীই স্বামী-সহ সেখানে উপস্থিত। অক্ষ-গুটিকা হাত থেকে ফেলে নিশ্চুপে কিছুক্ষণ ভাবলেন সতী। তারপর উঠে শঙ্করকে প্রণাম করে বললেন ঃ

"বিজয়সান্ধকধ্বংসিংস্ত্র্যম্বক ত্রিপুরান্তক।
চরণৌ শরণন্তে মে দেহ্যনুজ্ঞাং সদাশিব ॥" (৮৮/৩২)

"মা নিষেধীঃ প্রার্থয়ামি যাস্যামি পিতুরন্তিকম্।" (৮৮/৩৩)

"মনো মে চরণদ্বন্দ্বে তব স্থাস্যতি নিশ্চলম্।
ক্রতুং দ্রষ্টুং পিতুর্যামি নৈক্ষি যজ্ঞো ময়া ক্বচিৎ ॥" (৮৮/৩৯)

—হে অন্ধকধ্বংসিন্! হে ত্র্যম্বক! হে ত্রিপুরারে! আপনি বিজয়ী হন, হে সদাশিব! আপনার চরণযুগল আমার অবলম্বন, আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি পিত্রালয়ে যাব। আমার মন আপনার চরণে নিশ্চল থাকবে। আমি কখনো যজ্ঞ দেখি নি। পিতার যজ্ঞ দেখতে যাব।

বাধা দিলেন ত্রিপুরারি। বললেন, 'যজ্ঞ যদি দেখার অভিলাষ থাকে, তুমি বল, আমি এখানেই যজ্ঞের আয়োজন করছি। তাছাড়া,

তুমি তো শক্তিময়ী, ইচ্ছে করলে তুমি নিজেই তো যজ্ঞের সৃষ্টি করতে পার। নতুন করে যজ্ঞপুরুষ, লোকপাল সৃষ্টি হতে পারে, অন্যান্য ঋষিরা আসতে পারে ঋত্বিকের কাজে। তবু তুমি কেন আমাকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছ? এ-যাত্রায় তোমার শুভ হবে না দেবী। অতীব অশুভ এই সময়। তুমি যদি এই সময়েই যাও তাহলে আমাদের যে চির-বিচ্ছেদ ঘটে যাবে, মিলন যে আমাদের আর হবে না।'

কিন্তু সতী-র সুদৃঢ় মনোরথ, বললেন ঃ

"পিতুর্যজ্ঞোৎসবো নাথ দ্রষ্টব্যোঽত্র ময়া ধ্রুবম্।
দেহ্যানুজ্ঞাং গমিষ্যামি সা মে কার্য্যৈর্বচোঽন্যথা॥" (৮৮/৪৩)

"অবশ্যং যদ্যহং রক্তা তব পাদাম্বুজদ্বয়ে।
তথা ত্বমেব মে নাথো ভবিষ্যসি ভবান্তরে॥" (৮৮/৫৩)

—নাথ! পিতার যজ্ঞ আমি দর্শন করতে যাব। আমার কথা অন্যথা হবে না। আমায় অনুমতি দিন, আমি যাই। আপনার চরণ-পঙ্কজদ্বয়ে যদি আমার অনুরক্তি থাকে, তাহলে জন্মান্তরে আপনিই আমার পতি হবেন,—"...সা যদি নাম্নাপ্যহং সতী॥ তদা তন্বন্তরেণাপি করিষ্যে তব দাসতাম্।"—আমার নাম যদি সতী হয়, তবে অন্য দেহ ধারণ করেও আমি আপনারই দাসী হব।

এই বলে মহেশ্বরকে প্রণাম, প্রদক্ষিণ সব ভুলে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন দেবী সতী। মন বিক্ষুব্ধ হলে তাকে শান্ত করে সাধ্য কার?

পদব্রজেই চলেছেন দেবী। দেখে ব্যাথাতুর হল মহেশের হৃদয়। গণদের ডেকে বললেন ঃ

"গণা বিমানং নয়ত মনঃপবনচক্রিণম্।
পঞ্চাস্যাযুতসংযুক্তং রত্নসানুধ্বজোচ্ছ্রিতম্॥
মহাবাতপতাকঞ্চ মহাবুদ্ধ্যক্ষলক্ষিতম্।
নর্ম্মদালকনন্দা চ যত্রেষাদণ্ডতাঙ্গতে॥
ছত্রীভূতৌ চ যত্র স্তঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবপি।
যস্মিন্ মকরতুণ্ডশ্চ বারাহীশক্তিরুত্তমাঃ॥

ধূঃ স্বয়ং চাপি গায়ত্রী রজ্জবস্তক্ষকাদয়ঃ।

সারথিঃ প্রণবো যত্র ক্রেঙ্কারঃ প্রণবধ্বনিঃ॥

অঙ্গানি রক্ষকা যত্র বরূথশ্ছন্দসাং গণঃ।" (৮৮/৬৩)

—হে গণসমূহ! তোমরা এমন এক বিমান নিয়ে এস যা মন এবং পবনের মত, দশ হাজার সিংহ যাতে যোজিত থাকবে; সুমেরু হবে যার উন্নত ধ্বজদণ্ড, মহাবাত হবে যার পতাকা, মহত্তত্ত্ব হবে যার অক্ষ (চাকার মাঝের লম্বা লম্বা কাঠ), নর্মদা, অলকানন্দা হবে যার ঈষাদণ্ড, সূর্য আর চন্দ্র হবে যার ছাতা, বারাহী শক্তি যাতে মকরতুণ্ড হয়ে থাকবে। স্বয়ং গায়ত্রী হবে সেই রথের যুগপৃষ্ঠ ভাগ, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ হবে যার রজ্জু। প্রণব হবে তার সারথি, প্রণবধ্বনি হবে তার ক্রেঙ্কার (রথের ঘর্ঘর শব্দ), অঙ্গসমূহ (শিক্ষা প্রভৃতি) হবে তার রক্ষক, আর ছন্দসমূহ হবে বরূথ (রথগুপ্তি)।

প্রভুর আদেশমাত্রই গণেরা নিয়ে এল সেই রথ। উঠলেন দেবী সপার্ষদ আর ক্ষণকাল মধ্যেই পৌঁছে গেলেন পিত্রালয়ে। গগণাঙ্গন থেকে সবেগে অবতরণ করলেন দেবী। অনাহূতা হয়েও সতী যে এইভাবে এখানে আসতে পারে, ভাবতে না পেরে সালঙ্কারে-ভূষিতা স্বামী-সহ তাঁর ভগিনীরা বেশ অবাক হল। কারো দিকে না তাকিয়ে সতী সোজা চলে গেলেন যজ্ঞব্রতে ব্রতী জনক-জননীর কাছে। তাকে দেখে তাঁরা বললেন,—'তুমি যে আসবে, তা জানতাম। এসে মঙ্গলই করেছ।' দেবী প্রশ্ন রাখেন পিতার কাছে, 'আমার আসায় যদি তোমাদের মঙ্গল হয়ে থাকে তবে আর সব ভগিনীদের মত আমাকেও নিমন্ত্রণ করনি কেন?'

দক্ষ বললেন, 'এতে তোমার কোন দোষ নেই। দোষ আমাদেরই। ব্রহ্মার কথায় বিশ্বাস করে, আর 'শিব' এই নামে সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে এমন এক পাত্রে সমর্পণ করেছিলাম, জানতাম না যে সে বিরূপাক্ষ, বৃষবাহন, বিষভোজী, কখনো কৌপীনধারী, কখনো নগ্ন; জানতাম না যে ভিক্ষাই তার একমাত্র অবলম্বন। জানতাম না, সে স্থাণু, উগ্র, তমোগুণযুক্ত রুদ্র, নিরীশ্বর; জানতাম না, তার পরিজন যারা, তারা

রুদ্র, গোত্রবর্জিত। কেউ ভালভাবে তার পরিচয় জানে না
যারা জানে বলে মনে করে, তারাও প্রতারিত।

"কিং বহূক্তেন তনয়ে সমস্তলয়শালিনী॥
ক্ব পাংসুলপটচ্ছন্নো মহাশঙ্খবিভূষণঃ।
প্রবদ্ধসর্পকেয়ূরঃ প্রলম্বিত জটাসটঃ॥
ডমড্‌ডমরুকব্যগ্রহস্তাগ্রঃ খণ্ডচন্দ্রভৃৎ।
তাণ্ডবাড়ম্বররুচিঃ সর্ব্বামঙ্গলচেষ্টিতঃ॥
মৃড়ানি স হরঃ ক্বায়মধ্বরো মঙ্গলালয়ঃ।
অতএব সমাহূতা নেহ ত্বং সর্ব্বমঙ্গলে॥" (৮৮/৮১-৮৪)

—হে সমস্ত লয়শালিনি তনয়ে মৃড়ানি। এর বেশী আর কি বলব? কোথায় পাংশুল-পটচ্ছন্ন, শব-কপালবিভূষণ, সর্পবলয়, দীর্ঘ জটাজুটধারী, ডমরুবাদনে ব্যগ্রহস্ত, চন্দ্রখণ্ডধারী, তাণ্ডবনৃত্যের আড়ম্বরে অনুরক্ত, অশুভ কার্যসমূহে রত সেই হর, আর কোথায়ই বা মঙ্গলালয় এই যজ্ঞ। হে সর্বমঙ্গলে! এইজন্যেই তুমি নিমন্ত্রিতা হওনি।

কন্যা, তুমি আসবে জেনে, তোমার জন্যে বস্ত্র-অলঙ্কার সবই রেখে দিয়েছি তুমি নাও,—তুমি মঙ্গলময়ী। কিন্তু ত্রিশূলধারী বিষমনেত্র তোমার স্বামীর উপস্থিতি এখানে শোভা পায় না। যেখানে মঙ্গলময় দেবশ্রেষ্ঠগণ রয়েছেন।'

প্রত্যুত্তরে সতী বললেন,—'বাবা, একটা কথা আপনি ঠিকই বলেছেন, জ্ঞানবান হয়েও কেউ তাঁকে সম্যক জানতে পারেনি বরং প্রতারিত হয়েছে। যখন সব জেনেও আপনি তার হাতে আমার সমর্পন করেছেন, তখন আগেই প্রতারিত হয়েছেন আবার এখনও প্রতারিত হচ্ছেন। যাই হোক,

"অথোক্তৈবং বহুতরং ত্বং জনেতাস্য বর্ম্মণঃ।
শ্রুতানেন চ দেহেন পত্যুঃ পরিবিগর্হণা॥
পুরশ্চরণমেবৈতদ্ যদস্যৈব বিসর্জ্জনম্।
সুশ্লাঘ্যজন্ময়া তাবৎ প্রাণিতব্যং সুযোষিত।
যাবজ্জীবিতনাথস্যাশ্রবণীয়া বিগর্হণা॥" (৮৮/৯৩-৯৪)

—এই রকম বাক্যের আর প্রয়োজন নেই। আপনি এই শরীরের জনক, আমিও এই শরীরে পতিনিন্দা শুনলাম। এই শরীর পরিত্যাগ করাই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। যতক্ষণ পতিনিন্দা শুনতে না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্তই ধন্যজন্মা সতী স্ত্রী-র জীবনধারণ করা উচিত।

এই বলে সতী সেখানে প্রাণরোধ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সেই যজ্ঞভূমি যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। ইন্দ্রাদি দেবগণ বিবর্ণ হয়ে গেলেন, অগ্নি ম্লান হয়ে গেলেন, উচ্চারিত মন্ত্রও অশ্রুত হয়ে পড়ল। কেঁপে উঠল ভূমণ্ডল, আকাশে বজ্র-বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, উল্কাপাত হল, উঠল প্রবল ঝঞ্ঝা। চতুর্দিকে যেন পৈশাচিক নৃত্য শুরু হয়ে গেল। যজ্ঞের দ্রব্য-সামগ্রী উচ্ছিষ্ট করল শৃগাল-কুকুরে। দক্ষ-পরিবারের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে গেল। মনে হল, যজ্ঞভূমি মুহূর্তে যেন শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে। কোনরকমে সেই ঘোর কাটিয়ে ব্রাহ্মণেরা আবার যজ্ঞ শুরু করলেন।

নারদ, দেবীর আগেই সেখানে গিয়ে সব দেখে-শুনে আবার ছুটে এলেন মহাদেবের কাছে। বিষাদগ্রস্ত নারদকে দেখে সর্বজ্ঞ মহেশ্বর সব জেনেও জিজ্ঞেস করলে, নারদ বললেন—'পতি-নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী-সাধ্বী সতীদেবী তৃণজ্ঞানে আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।' শোনামাত্রই মহাকাল প্রজ্বলিত প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নিতে রুদ্রমূর্তী ধারণ করলেন মহেশ্বর। সেই ক্রোধানল থেকে আবির্ভূত হল বিকটাকার এক ভূশণ্ডী (ত্রিকালদর্শী কাক)-মূর্তি। আবির্ভূত হয়েই সে মহেশ্বরের আদেশ প্রার্থনা করল।

মহেশ্বর বললেন ঃ

"মহাবীরোঽসি রে ভদ্র মম সর্ব্বগণেশ্বিহ।
বীরভদ্রাখ্যয়া ত্বং হি প্রথিতিং পরমাং ব্রজ॥
কুরু মে সত্বরং কার্য্যং দক্ষযজ্ঞং ক্ষয়ং নয়।
যে ত্বাং তত্রাবমন্যন্তে তৎসাহায্যবিধায়িনঃ॥
তে ত্বয়াপ্যবমন্তব্যা ব্রজ পুত্র শুভোদয়।" (৮৯/৩০-৩২)

—হে ভদ্র! আমার গণসমূহের মধ্যে তুমিই মহাবীর; তুমি বীরভদ্র নামে সম্যক প্রসিদ্ধি লাভ কর। হে শুভোদয়! তুমি সত্বর এক কাজ কর—দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট কর। সেখানে যারা দক্ষের সাহায্য করে তোমার অবমাননা করবে তুমি তাদেরও অবমাননা করতে ছাড়বে না।

বীরভদ্র পরমেশ্বরের আজ্ঞা শিরোধার্য করে, দেবদেবকে প্রদক্ষিণ করে দ্রুতবেগে প্রস্থান করলেন। সেই সঙ্গে তার চতুর্দিকে চলল মহাদেবের নিঃশ্বাস-জাত শতকোটি উগ্র গণ। মুহূর্তমধ্যে গণেরা যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হয়ে শুরু করে দিলে তাণ্ডব-লীলা। শূল দিয়ে যজ্ঞবেদী খুঁড়ে তছনছ করে ফেলল। অন্নসামগ্রী বিনষ্ট হল। মৃগরূপ ধারণ করে যজ্ঞকে পলায়নপর দেখে দূর থেকেই চক্র দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলল। লাঞ্ছিত হলেন বায়ু, যম, নৈঋত, কুবের। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র ময়ূররূপ ধারণ করে পর্বতের আড়ালে আত্মগোপন করলেন। রেহাই পেলেন শুধু একাদশ রুদ্র আর ব্রাহ্মণেরা। যজ্ঞভূমী শ্মশানে পরিণত হয়েছে দেখে বীরভদ্র বললে:

"ক্ব স দক্ষো দুরাচারঃ ক্ব চ যজ্ঞভুজঃ সুরাঃ।
ধৃত্বা সর্ব্বানানয়ত যাত দ্রুততরং গণাঃ॥" (৮৯/৫৮)

—কোথায় সেই দুরাচার দক্ষ আর কোথায়ই বা সেই যজ্ঞভোজী দেবগণ? গণসমূহ, তোমরা সত্বর গিয়ে তাদের সকলকে ধরে নিয়ে এস।

প্রমথেরা বীরভদ্রের আজ্ঞা যে মুহূর্তে পালন করতে ছুটবে অমনি যজ্ঞরক্ষক স্বয়ং গদাধর তাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে, তাদের এমনি প্রকম্পিত করে তুলল, যে তারা পালাতে শুরু করলে। তাই দেখে প্রলয়জ্বালা নিয়ে এগিয়ে এল বীরভদ্র। দেখলে অসংখ্য নিজ-গণে পরিবেষ্টিত শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গধারী। তাঁকে দেখেই হুঙ্কার ছাড়লে বীরভদ্র—'আপনিই তো এখানে যজ্ঞপুরুষ, যজ্ঞের প্রবর্তক, দক্ষের রক্ষাকর্তা। সহস্র পদ্মের একটা কম হওয়াতে মাতৃচরণে দেবার জন্যে নিজের নয়নকমল অর্পণ করতে গিয়েছিলেন বলে শম্ভু আপনাকে ভক্ত-শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে সুদর্শন চক্র দিয়েছিলেন, যার জোরে দৈত্যনিসূদন হিসেবে

অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন। এখন তাঁকেই ভুলে ভুজবলে মদমত্ত হয়ে দক্ষকে রক্ষা করতে এসেছেন। হয় দক্ষকে আমার হাতে সমর্পণ করুন, নতুবা যুদ্ধ করুন।'

বিষ্ণু তার পরাক্রম জানতে ইচ্ছুক হয়ে বললেন—'ক্ষমতা থাকে, তুমি দক্ষকে হরণ করে নিয়ে যাও।'

বীরভদ্র ইঙ্গিত জানালে প্রমথেরা বিষ্ণুর গণদের অবস্থা তৃণসম করে ফেলল দেখে, ক্রুদ্ধ গদাধর সহস্র-সহস্র বাণে সমরাঙ্গনে তাদের নিপাতিত করলেন। এবার এগিয়ে এল বীরভদ্র। বললে—'তুমি যে সমর-কুশলী তা জানি। কিন্তু এতদিন দৈত্যগণের সঙ্গেই সংগ্রাম করেছ—শিব-পার্ষদের সঙ্গে নয়।' এই বলে বীরভদ্র যে-মুহূর্তে হাতে ভুশুণ্ডী নিল, অমনি গদাধারীর গদা এসে ভুশুণ্ডীকে শতধা বিদীর্ণ করে প্রচণ্ড আঘাত হানল বীরভদ্রকে। কৌমোদকী গদার সে আঘাতে বীরভদ্র কিছুমাত্র বেদনা বোধ না করে, খট্বাঙ্গ প্রহারে বিষ্ণুর হাত থেকে সেই গদা মাটিতে ফেলে দিলে। বিষ্ণু এবার তুলে নিলেন সুদর্শন চক্র। নিশ্চিত মৃত্যুকে ছুটে আসতে দেখে বীরভদ্র প্রভু মহেশ্বরকে স্মরণ করলে সেই চক্র এসে দ্বিখণ্ডিত করা তো দূরের কথা, যেন তার গলার মালা হয়ে গেল। তাই দেখে খানিকটা চমকে উঠে বিষ্ণু মুচকি হেসে এবার তুললেন নন্দক। বীরভদ্র প্রলয়হুঙ্কারে বিষ্ণুর নন্দক-হস্তকে স্তম্ভিত করে দিয়ে দীপ্তিময় শূলহাতে ছুটে এল তাঁকে বিদ্ধ করতে। যেমনি আঘাত হানতে যাবে, অমনি বীরভদ্র শুনলে আকাশবাণী—"মা কার্ষীঃ সাহসং স্থিতি"—অমন সাহস কোরো না। নিবারিত হল গণরাজ। পরাভূত বিষ্ণু।

এইবার সে পেল দক্ষকে। বললে, 'তুমি যে মুখে শিবনিন্দা করেছ সেই মুখ আমি চপেটাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করব' এবং করলও তাই। তারপর যারা মুখ বুজে দেবেশের নিন্দা শুনেছিল অদিতি-প্রমুখ সেইসব দেবগণের জিব কান কেটে দুভাগ করে দিলে বীরভদ্র। মহাদেবকে বর্জন করে যারা মহাহবি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অধোমুখে ঝুলিয়ে রাখলে। চন্দ্র, ধর্ম, ভৃগু, মারীচি প্রভৃতি দক্ষের জামাতারা যার-পর-নাই তিরস্কৃত

হলেন, নিজেদের শিব থেকেও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেছিলেন বলে।

এদিকে পাছে বিধি লোপ পায় এই ভয়ে ব্রহ্মা মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে অনেক অনুনয় করে নিয়ে এলেন দক্ষালয়ে। মহেশ্বরকে প্রসন্ন করে তিনি বললেন ঃ

"অপরাধ্যপ্যয়ং দক্ষঃ সম্প্রসাদ্যঃ কৃপানিধে।
যথাপূর্ব্বং পুনরমূন্ সর্ব্বান্ কারয় শঙ্কর॥
যথাবিধিঃ প্রবর্ত্তেতি বৈদিকঃ পুনরেব হি।
তথাজ্ঞা দীয়তাং শম্ভো কর্ম্ম সিধ্যতি সেশ্বরম্॥" (৮৯/১০৪-১০৫)

—হে কৃপানিধে! এই দক্ষ অপরাধী হলেও (আপনার পরম ভক্ত) আপনি এর ওপর প্রসন্ন হোন, হে শঙ্কর! আবার আগের মত সবকিছু প্রতিষ্ঠিত করুন। যাতে বৈদিক বিধি আবার প্রবর্তিত হয়, সেরকম আদেশ দিন। হে শম্ভো! ঈশ্বর-সহ ক্রিয়াই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

বিধি ব্রহ্মার অনুরোধে মৃদু হেসে মহেশ্বর বীরভদ্রকে আদেশ দিলেন—সব যেমন ছিল, তেমনটি করে দিতে। বীরভদ্র একমাত্র দক্ষের বদন ছাড়া বাকী সব কিছুই আগের মত করে দিলে। দক্ষ মেষবক্ত্র হয়ে রইলেন। আর যিনি স্বয়ং সব তপস্যার ফলদাতা, তিনি নিজেই পরিষদদের নিয়ে চলে গেলেন হিমালয়ে তপস্যা করতে। কেননা,—"অনাশ্রমবতা পুংসা যতঃ কালো মনাগপি। মুধা কলয়িতব্যো ন তস্মচ্ছ্রেয়ঃ সদাশ্রমঃ॥" (১১৪)—আশ্রম-ছাড়া ক্ষণকালও বৃথা কাটানো উচিত নয়, আশ্রমই সর্বদা সুখকর।

অতঃপর ব্রহ্মা দক্ষকে বললেন, তুমি যদি বারাণসীতে গিয়ে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে শম্ভুকে সন্তুষ্ট করতে পার, তাহলে হরনিন্দা-জনিত পাপ থেকে তুমি অবশ্যই মুক্তি পাবে। কারণ এই বিশ্বচরাচরে বারাণসীই তাঁর প্রিয় ক্ষেত্র।

ব্রহ্মার পরামর্শে দক্ষ আর কালক্ষেপ না করে বারাণসীতে গিয়ে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে পূজা-জপ-আরাধনায় তদগত-চিত্ত হয়ে কাল কাটাতে লাগলেন। এইভাবে একাগ্রচিত্তে লিঙ্গধ্যানে দক্ষের কেটে গেল বারো হাজার বছর।

"মেনাং যাবৎ সতী প্রাপ্য হিমাচলপতিব্রতাম্।
উমারূপাতি-তপসা পতিং প্রাপ পিনাকিনম্॥
তাবৎ স দক্ষস্তপসি নিশ্চলো লিঙ্গমার্চ্চয়ৎ।" (৮৯/১২৫-১২৬)

—যে পর্যন্ত না হিমাচল-পতিব্রতা মেনকাকে আশ্রয় করে উমারূপে সতী সাতিশয় তপস্যা-দ্বারা পিনাকিকে পতিরূপে লাভ করেছিলেন,—সেই পর্যন্ত দক্ষ নিশ্চল লিঙ্গার্চনা করেছিলেন।

পতি-সহ সতী পার্বতী কাশীতে এসে দক্ষকে তপস্যাক্লিশ দেখে, মহাদেবকে অনুরোধ জানালেন, দক্ষের মনোভিলাষ পূর্ণ করতে।

দক্ষকে বললেন মহেশ্বর—'তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।'

দক্ষ প্রার্থনা জানালেন—'আমার অপরাধ আপনাকে ক্ষমা করতে হবে আর আমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গে আপনি সর্বদা অবস্থান করবেন।'

দেবদেব প্রসন্নচিত্তে সম্মতি জানিয়ে বললেন—

"যত্ত্বয়া স্থাপিতং লিঙ্গমেতদ্দক্ষেশ্বরাভিধম্॥
অস্য সংসেবনাৎ পুংসামপরাধ সহস্রকন্।
ক্ষমিষ্যেঽহং ন সন্দেহস্তস্মাৎ···॥" (৮৯/১৩৪-১৩৫)

—তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গ 'দক্ষেশ্বর' লিঙ্গ নামে অভিহিত হবে। সম্যকরূপে এর যে সেবা করবে, নিঃসন্দেহে তার সহস্র অপরাধ আমি ক্ষমা করব।

স্কন্দদেব এই কাহিনী অগস্ত্যকে বলে, বললেন,—"নরো ন লিপ্যতে পাপৈরপরাধালয়োঽপি হি।"—অপরাধের আলয় হলেও, মানুষ (দক্ষেশ্বর সমুদ্ভব কাহিনী শুনলে) কোন পাপে লিপ্ত হয় না।

[অধ্যায় ৯০]

দক্ষেশ্বর লিঙ্গ-কাহিনী শোনার পর অগস্ত্যের কৌতূহল জাগল 'পার্বতীশ্বর' লিঙ্গ সম্বন্ধে। অর্ধাঙ্গিনী হয়েও মহাদেব-জায়া পার্বতী

কেন লিঙ্গ স্থাপন করলেন !

ষড়ানন মিত্রাবরুণ-নন্দন অগস্ত্যের কৌতূহল মেটাতে বললেন সেই পুরা কাহিনী। পার্বতী-সহ মহাদেব তখন হিমালয়ে পতিগৃহে। একদিন পার্বতী-জননী মেনকা নাগরাজ-নন্দিনীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "কিং স্থানং বসতির্ব্বা কা কো বন্ধুবের্বৎসি কিঞ্চন। প্রায়ো গৃহং ন জামাতুরস্য কোঽপি চ কুত্রচিৎ॥ (৩) —জামাই-এর আমাদের বাসস্থান কোথায়? বন্ধুই বা কে? এর ঘর বা আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নেই বলেই তো মনে হয়। তুমি কিছু জান কি?

খুবই লজ্জা পেলেন গৌরী। মহেশ্বরকে গিয়ে বললেন—'এখানে আর এক মুহূর্ত-ও থাকা উচিত নয়। আমাকে নিয়ে আজই তোমার ঘরে চল।'

শৈলরাজ-সুতার কথা শুনে সবই বুঝতে পারলেন মহেশ্বর। তিনিও তখনি তাঁকে নিয়ে হিমগিরি পরিত্যাগ করে চলে এলেন নিজের ভবনে—আনন্দকাননে। উপস্থিত হবামাত্রই পরমানন্দের জোয়ারে যেন ভেসে গেলেন পার্বতী; ভুলেই গেলেন পিতৃগৃহের কথা। জিজ্ঞেস করলেন মহেশকে—'এখানে নিরবচ্ছিন্ন এত আনন্দ-প্রবাহ কেন?'

গৌরীর প্রশ্নে পিনাকপাণি বললেন—পাঁচক্রোশ পরিমিত এই কাশীক্ষেত্রের কোথাও এতটুকু এমন স্থান নেই যেখানে চতুর্দশ ভুবনের কেউ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন নি। স্বয়ং অনন্তদেব, যিনি গণনায় বিশেষজ্ঞ, তিনিও জানেন না, সেই লিঙ্গের সংখ্যা কত। সেই সব লিঙ্গই এখানে পরমানন্দের হেতু।

শুনে গিরিজাও সাগ্রহে লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠার অনুমতি জানালেন পতির কাছে। মহেশের অনুমতি নিয়ে মহাদেবের কাছে পার্বতী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলে দেবদেব সেই লিঙ্গে যে বর প্রদান করেছিলেন, অগস্ত্য তা শোন ঃ

> "লিঙ্গং যঃ পার্ব্বতীশাখ্যং কাশ্যাং সম্পূজয়িষ্যতি।
> তদ্দেহাবসিতিং প্রাপ্য কাশীলিঙ্গং ভবিষ্যতি॥
> কাশীলিঙ্গত্বমাসাদ্য মামেবান্তপ্রবেক্ষ্যতি।" (৯০/২১-২২)

—কাশীতে যে এই 'পার্বতীশ্বর' লিঙ্গের সম্যক অর্চনা করবে, দেহান্তে সে-ই কাশীতে লিঙ্গরূপে প্রাদুর্ভূত হবে। আর লিঙ্গত্ব লাভ করে সে আমাতেই অনুপ্রবিষ্ট হবে।

[অধ্যায় ৯১]

পার্বতীশ্বর লিঙ্গের মহিমা কীর্তনের পর ষড়ানন অগস্ত্যকে বললেন সুদুর্লভ গঙ্গেশ্বর লিঙ্গের বিবরণ, যা শুনলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করা যায়।

দিলীপ-তনয় ভগীরথ গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে আনার সময় যখন চক্র-পুষ্করিণী তীর্থে মিলিতা হলেন, গঙ্গা তখন ক্ষেত্রের অতুলনীয় প্রভাব অবগত হয়ে লোকোত্তর ফলের বিষয় স্মরণ করে বিশ্বেশ্বরের পূবে মঙ্গলময় এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই লিঙ্গই হল অতি দুর্লভ 'গঙ্গেশ্বর' লিঙ্গ। দশহরা তিথিতে যে এই গঙ্গেশ্বরের অর্চনা করে তার হাজার জন্মের পাপ মুহূর্তে নাশ হয়ে যায়। কিন্তু কলিকালে এই লিঙ্গ গুপ্তপ্রায়।

ষড়ানন বললেন:

"কলৌ সুদুর্লভা গঙ্গা সর্ব্বকল্মষহারিণী ॥
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মিত্রাবরুণনন্দন।
ততোঽপি তিষ্যে সম্প্রাপ্তে কাশ্যাত্যন্তং সুদুর্লভা ॥
ততোঽপি দুর্লভং কাশ্যাং লিঙ্গং গঙ্গেশ্বরাভিধম্।
যস্য সন্দর্শনং পুংসাং ভবেৎ পাপক্ষয়ায় বৈ ॥" (৯১/৮-১০)

—হে মিত্রাবরুণনন্দন! কলিকালে সর্বকলুষনাশিনী গঙ্গা সুদুর্লভা হবেন, সন্দেহ নেই; কলিযুগ এলে কাশী তার চেয়ে বেশী সুদুর্লভ হবে। আর যাঁর দর্শনে পাপক্ষয় হয়ে থাকে সেই গঙ্গেশ্বর লিঙ্গও হবেন অধিকতর সুদুর্লভ।

[অধ্যায় ৯২]

অতঃপর অগস্ত্যের কাছে ষড়ানন উত্থাপন করলেন নর্মদেশ্বর লিঙ্গ-প্রসঙ্গ।

বারাহকল্প সবে শুরু হয়েছে, মুনিশ্রেষ্ঠরা মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞেস করলেন—'মুনিবর ! নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?'

মুনিবর বললেন,—'শত-শত নদী রয়েছে সবাই পাপহারিণী, ধর্মপ্রদায়িনী। তবে যে সব নদী সমুদ্রগামী তারাই শ্রেষ্ঠ। আবার তাদের মধ্যেও—

"গঙ্গা চ যমুনা চাথ নর্ম্মদা চ সরস্বতী।
চতুষ্টয়মিদং পুণ্যং ধুনীষু মুনিপুঙ্গবাঃ॥
ঋগ্বেদমূর্ত্তির্গঙ্গা স্যাদ্ যমুনা চ যজুর্ধ্রুবম্।
নর্ম্মদা সামমূর্ত্তিস্তু স্যাদথর্ব্বা সরস্বতী॥
গঙ্গা সর্ব্বসরিদ্‌যোনিঃ সমুদ্রস্যাপি পূরণী।
গঙ্গায়া ন লভেৎ সাম্যং কাচিদত্র সরিদ্বরা॥" (৯২/৫-৭)

—হে মুনিপুঙ্গবগণ ! গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, সরস্বতী—নদীমধ্যে এই চারটি (সবিশেষ) পবিত্র। গঙ্গা ঋগ্বেদের মূর্তি, যমুনা অবশ্যই যজুর্বেদের, নর্মদা সামবেদের আর সরস্বতী হল অথর্ববেদের মূর্তি। গঙ্গা আবার সমস্ত নদীর উৎপত্তিস্থল এবং সমুদ্রপূরণকর্ত্রী ; কোন নদীশ্রেষ্ঠই তাই গঙ্গার সমান নয়।'

পুরাকালে রেবা (নর্মদা) নদী একবার গঙ্গার সমান মর্যাদা পাবার জন্যে কঠোর তপস্যা করেছিল। ব্রহ্মা তাকে বর দিতে এলে নর্মদা যখন তার অভিলাষ জানাল তখন ব্রহ্মা হেসে বলেছিলেন—

"যদি ত্র্যক্ষসমত্বঞ্চ লভ্যতেঽন্যেন কেনচিৎ।
তদা গঙ্গাসমত্বঞ্চ লভ্যতে সরিতান্যয়া॥
পুরুষোত্তমতুল্যঃ স্যাৎ পুরুষোঽন্যো যদি ক্বচিৎ।

স্রোতস্বিনী তদা সাম্যং লভতে গঙ্গয়া পরা ॥
যদি গৌরীসমা নারী ক্বচিদন্যা ভবেদিহ।
অন্যা ধুনীহ স্বর্ধুন্যস্তদা সাম্যমুপৈষ্যতি ॥
যদি কাশীপুরীতুল্যা ভবেদন্যা ক্বচিৎ পুরী।
তদা স্বর্গতরঙ্গিণ্যাঃ সাম্যমন্যা নদী লভেৎ ॥" (৯২/১০-১৩)

—যদি ত্রিলোচনের তুল্য অন্য কেউ হতে পারে তাহলে অন্য নদীও গঙ্গার সমান হতে পারবে। যদি অন্য কোন পুরুষ পুরুষোত্তমের তুল্য হতে পারে, তাহলে স্রোতস্বিনী গঙ্গার সমান হতে পারে। এ জগতে অন্য কোন নারী যদি গৌরীর সমান হতে পারেন, তাহলে অন্য নদীও গঙ্গার সমান হতে পারে। অন্য কোন পুরী যদি কাশীর সমান হতে পারে, তাহলে অন্য নদীও গঙ্গার সমান হতে পারবে।

ব্রহ্মার বর প্রত্যাখ্যান করে নর্মদা এরপর কাশীতে গিয়ে পিলিপিলা তীর্থে ত্রিবিষ্টপের কাছে বিধিপূর্বক একটি লিঙ্গ স্থাপন করলে মহেশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর প্রার্থনা করতে বললে, নর্মদা জানালে, তাঁর (মহাদেবের) চরণযুগলে তার (নর্মদার) যেন একনিষ্ঠ ভক্তি থাকে।

প্রসন্ন হলেন মহেশ্বর। তার প্রার্থনা পুরণ তো করলেনই তার ওপর বললেন:

"সদ্যঃপাপহরা গঙ্গা সপ্তাহেন কলিন্দজা।
ত্র্যহাৎ সরস্বতী রেবে ত্বং তু দর্শনমাত্রতঃ ॥" (৯২/২৩)

—গঙ্গা সদ্যপাপহরা, যমুনা এক সপ্তাহে, সরস্বতী তিন দিনে পাপ হরণ করে। হে রেবে (নর্মদে)! তুমি দর্শনমাত্রেই পাপ হরণ করবে।

আর তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গ মহাপবিত্র, মুক্তিপ্রদাতা, সর্বপাপহন্তা 'নর্মদেশ্বর' রূপে পূজিত হবে।

মহেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে নর্মদা আবার ফিরে এসেছিল নিজের দেশে প্রফুল্ল অন্তরে।

[অধ্যায় ৯৩]

অগস্ত্য বললেন, "ইদানীং কথয় স্কন্দ সতীশ্বর সমুদ্ভবম্"—স্কন্দদেব অতঃপর সতীশ্বর লিঙ্গের সমুদ্ভব কিভাবে হল বলুন।

স্কন্দদেব বললেন, পুরাকালে একবার ব্রহ্মা সুকঠোর তপস্যা করলে মহেশ্বর এলেন তাঁকে বরদান করতে।

ব্রহ্মা বললেন :

"যদি প্রসন্নো দেবেশ বরং দাস্যসি বাঞ্ছিতম্।

তদা ত্বং মে ভব সুতো দেবী দক্ষসুতাস্তু চ॥" (৯৩/৫)

—হে দেবেশ! যদি প্রসন্ন হয়ে আমাকে আমার অভিলষিত বর দেন, তাহলে, আপনি আমার পুত্র আর দেবী দক্ষকন্যা হোন।

ঈষৎ হেসে দেবদেব দেবীকে অবলোকন করে তাতেই সম্মতি জানালেন। পরে ব্রহ্মার ভালদেশ (কপাল) থেকে আবির্ভূত হলেন পুত্ররূপে শশাঙ্কভৃৎ আর দেবী জন্ম নিলেন দক্ষ-দুহিতা রূপে। শিশু আবির্ভূত হয়েই ব্রহ্মার মুখ দেখতে-দেখতে কাঁদতে লাগলেন। তাই দেখে রোরুদ্যমান শিশুকে জিজ্ঞেস করলেন ব্রহ্মা—'আমাকে জনকরূপে লাভ করেও তুমি কাঁদছ কেন?' তখন সেই বালক বলেছিলেন, "নাম্নে রোদিনি মে স্রষ্টর্নাম দেহি পিতামহ।"—হে সৃষ্টিকর্তা পিতামহ, আমি নামের জন্য রোদন করছি, আমাকে নাম দিন। সেই রোদনের জন্যই বালকের নাম হয়েছিল 'রুদ্র'।

'স্বয়ং ঈশ্বর শিশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাহলে তাঁর রোদন করার কারণ? আমার এ ব্যাপারে খুবই কৌতূহল জাগছে স্কন্দদেব। নিশ্চয়ই এর কোন গূঢ় রহস্য আছে।' স্কন্দদেব বললেন, ব্রহ্মার অভিলাষের মর্মার্থ উপলব্ধি করেই শিশু-শঙ্কর বাষ্পাকুলিত হয়েছিলেন। যাঁকে দর্শন, স্পর্শ করলে অপার আনন্দ, নিশ্চিত মুক্তি, তাঁকে যদি সন্তানরূপে সব সময়ের জন্য আহারে-বিহারে-শয়নে কাছে-কাছে পাওয়া যায়,

তার তুল্য তৃপ্তি আর কী থাকতে পারে! এছাড়াও পুত্র ব্যতিরেকে কে হবে পিতার উদ্ধারকর্তা? চতুরানন পরমেষ্ঠির এই বুদ্ধি-বৈভবের বিষয় ভেবেই শঙ্কর আবেগে ক্রন্দনরত হয়েছিলেন।

যাই হোক, দক্ষ-কন্যা সতী সুপাত্রস্থ হবার বাসনায় তপস্যার উদ্দেশ্যে কাশীতে এসে সামনেই লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে দেখলেন আর লিঙ্গমধ্য হতে শুনতে পেলেন স্পষ্টোক্তি—দেবী, তোমার তপস্যার প্রয়োজন নেই, "ইতোঽষ্টমে চ দিবসে ত্বজ্জনেতা প্রজাপতিঃ॥ মহ্যং দাস্যতি কন্যাং ত্বাং সফলস্তে মনোরথঃ"—আজ থেকে অষ্টম দিবসে, তোমার পিতা দক্ষ প্রজাপতি, তোমাকে আমায় সমর্পণ করবেন। তোমার মনোরথ সফল হবে।

আর মনোরথ-পূরণকারী এই লিঙ্গ তোমার নামে 'সতীশ্বর' লিঙ্গরূপে বিখ্যাত হবে।

মহেশ্বর এই বলে লিঙ্গমধ্যে অন্তর্হিত হলেন। দক্ষসুতা সতীও বরলাভ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। আর পিতা দক্ষও অষ্টম দিবসে কন্যাকে রুদ্রর হাতে সমর্পন করলেন।

[অধ্যায়—৯৪]

অতঃপর স্কন্দদেব পরপর কাশীর কয়েকটি মোক্ষপ্রদ লিঙ্গের উদ্ভব-কাহিনী শোনালেন অগস্ত্যকে।

একসময় কাশীতে সনারু নামে একজন গৃহস্থাশ্রমী ঋষি ছিলেন। ব্রহ্মযজ্ঞ, অতিথিসেবা আর লিঙ্গপূজাতেই তিনি সবসময় তন্ময় হয়ে থাকতেন। একদিন তাঁর পুত্র উপজঙ্ঘানি, বনে গিয়ে সর্পদষ্ট হয়ে প্রাণত্যাগ করল। বন্ধু-বান্ধবেরা তাকে বাড়িতে নিয়ে এল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিতা সনারু পুত্রের নশ্বর দেহকে সংকার করার জন্যে নিয়ে গেলেন স্বর্গদ্বারের কাছে মহাশ্মশানে। সেখানে বিশেষ একটি জায়গায় পুত্রের নিশ্চল দেহকে রাখামাত্রই অবাক হয়ে সনারু দেখলেন, চোখ

মেলে পুত্র তাঁর সচল হয়ে উঠল—যেন এইমাত্র নিদ্রাভঙ্গ ঘটল তার। দেখে যখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে স্থানটির দিকে স্থিরদৃষ্টি রেখে ভাবতে লাগলেন, এর কারণ কি, তখন দেখলেন আরো এক আশ্চর্য ব্যাপার। একটা পিঁপড়ে আর একটা মরা-পিঁপড়েকে মুখে করে এনে সেখানে রাখা মাত্রই সে-ও প্রাণ ফিরে পেয়ে চলে গেল। কৌতূহল দমন করতে না পেরে সনারু তৎক্ষণাৎ সেখানকার মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। খানিকটা মাটি সরাবার পরই দেখলেন শ্রীফলাকার একটি লিঙ্গ। রহস্যের সমাধান হল সনারুর। তিনিই সেই অনাদিলিঙ্গকে 'অমৃতেশ্বর' নামে অভিহিত করলেন। তারপর অমৃতত্ব প্রদানকারী সেই লিঙ্গের পূজা করে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। বর্তমানে কিন্তু এটি গুপ্ত।

মোক্ষদ্বারের কাছে মোক্ষদ্বারেশ্বর শিবের কাছে আছেন 'বরুণেশ্বর' নামে অপর এক মহালিঙ্গ। সোমবারে একভক্ত-ব্রত আচরণ করে করুণা (কমলালেবুর) ফুল অথবা কমলালেবু দিয়ে এই লিঙ্গের অর্চনা এবং করুণা ভিক্ষা করলে, তাকে কখনও কাশী পরিত্যাগ করতে হয় না।

স্বর্গদ্বারেশ্বর এবং মোক্ষদ্বারেশ্বর—স্বর্গ এবং মোক্ষপ্রদায়ী এই দুটি লিঙ্গ ছাড়া এখানে অপর একটি লিঙ্গ আছেন—'জ্যোতিরূপেশ্বর'। বিষ্ণু যখন চক্র-পুষ্করিণীর তীরে তপস্যা করেছিলেন, তখনই এই তেজোময় লিঙ্গ স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন।

স্কন্দ বললেন :

"ওঙ্কারাদি লিঙ্গানি যান্যুক্তানি চতুর্দ্দশ।
তথা দক্ষেশ্বরাদীনি লিঙ্গান্যষ্টৌ মহান্তি চ॥
শৈলেশাদীনি লিঙ্গানি তথা যানি চতুর্দ্দশ।
পুনঃ ষট্‌ত্রিংশদেতানি ক্ষেত্রসংসিদ্ধিহেতবে॥
ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বরূপোঽসৌ লিঙ্গেষ্বেষু সদাশিবঃ।
অস্মিন ক্ষেত্রে বসন্নিত্যং তারকং জ্ঞানমাদিশেৎ॥
ক্ষেত্রস্য তত্ত্বমেতদ্ধি ষট্‌ত্রিংশল্লিঙ্গরূপাহো।
এতেষাং ভজনাৎ পুংসাং ন ভবেদ্দুর্গতিঃ ক্বচিৎ॥" (৯৪/৩৬-৩৯)

—হে মিত্রাবরুণনন্দন অগস্ত্য! প্রণবেশ্বর প্রভৃতি যে চোদ্দটি

লিঙ্গের কথা আগে বলেছি, তার সঙ্গে এই আটটি মহালিঙ্গ এবং শৈলেশ্বর প্রভৃতি আরো চোদ্দটি লিঙ্গ—এই ছত্রিশটি লিঙ্গের কারণেই কাশীক্ষেত্র মোক্ষপ্রদ। ছত্রিশটি তত্ত্ব এই লিঙ্গগুলির মধ্যে সদাশিব-রূপে অবস্থান করে এই ক্ষেত্রে তারকজ্ঞান উপদেশ করছেন। এই ক্ষেত্রের লিঙ্গরূপী* এই ছত্রিশটি তত্ত্বের সেবা করলে মানুষের কখনো দুর্গতি হয় না।

এই সব লিঙ্গই হল কাশীর রহস্য। এছাড়া আরো অনেক সিদ্ধ লিঙ্গ আছেন, তাঁরা যুগে-যুগে আবির্ভূত হন। তাই নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির স্থান এই কাশী।

[অধ্যায় ৯৫—৯৬]

ব্যাসদেব অতঃপর সূতের কাছে বিবৃত করলেন দেবষড়ানন, মিত্রাবরুণ-তনয় অগস্ত্যের কাছে, তাঁর (ব্যাসদেবের) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন।

স্কন্দদেব বলেছিলেন :

> "নিশাময় মহাভাগ ত্বং মৈত্রাবরুণে মুনে।
> পারাশর্য্যো মুনিবরো যথা মোহমুপৈষ্যতি॥" (৯৫/১)

—হে মহাভাগ মৈত্রাবরুণে মুনে! মুনিবর পরাশর-নন্দন যেভাবে মোহপ্রাপ্ত হবেন, তা শোন।

---

* প্রণেশ্বর, ত্রিলোচন, মহাদেব, কৃত্তিবাস, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদারেশ্বর, ধর্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্মেশ্বর, মণিকর্ণিকেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, শৈলেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, স্বর্লীনেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, হিরণ্যগর্ভেশ্বর, ঈশানেশ্বর, গোপেক্ষেশ্বর, বৃষভধ্বজ, উপশান্তশিব, জ্যেষ্ঠেশ্বর, নিবাসেশ্বর, শুক্রেশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, জম্বুকেশ্বর, দক্ষেশ্বর, পার্বতীশ্বর, গঙ্গেশ্বর, নর্মদেশ্বর, সতীশ্বর, অমৃতেশ্বর, করুণেশ্বর, আর জ্যোতীরূপেশ্বর—কাশীক্ষেত্রের মোক্ষপ্রদ এই ছত্রিশটি লিঙ্গ ছত্রিশটি তত্ত্ব।

মহামুনি পরাশর-নন্দন বেদব্যাস নানা শাখায় বেদসমূহকে ভাগ করে, সূত-প্রভৃতিকে অষ্টাদশ পুরাণ অধ্যয়ন করিয়ে, শ্রুতি, স্মৃতি, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করে একবার সশিষ্য বের হলেন পৃথিবী পরিভ্রমণে। ঘুরতে-ঘুরতে এলেন নৈমিষারণ্যে। সেখানে এসে দেখলেন শৌনক-প্রমুখ রুদ্রভক্ত অষ্টাশী তপস্বী রুদ্র-জপ আর শিব-নামে তন্ময় হয়ে বিশ্বেশ্বরে মগ্ন। তাদের সকলকেই শিবগত-চিত্ত দেখে ব্যাসদেব তর্জনী তুলে জোর গলায় বলে উঠলেন—বেদ, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতি যেখানে যত শাস্ত্রগ্রন্থ আছে সবকিছু মন্থন করে আমি স্থির নিশ্চিত ঃ

"সতং সত্যং পুনঃসতং ত্রিসত্যং ন মৃষা পুনঃ।
ন বেদাদপরং শাস্ত্রং ন দেবোঽচ্যুততঃ পরঃ॥" (৯৫/১৩)

—বেদের বাইরে কোন শাস্ত্র নেই, অচ্যুতের বাইরে কোন দেব নেই। একথা সত্য, সত্য, সত্য—ত্রিসত্য ; মিথ্যা নয়।

"এক এব হি সর্ব্বেশো হৃষীকেশঃ পরাৎপর।
তং সেবমানঃ সততং সেব্যস্ত্রিজগতাং ভবেৎ॥
একো ধর্মপ্রদো বিষ্ণুস্ত্বেকো বহ্বর্থদে হরিঃ।
একঃ কামপ্রদশ্চক্রী ত্বেকো মোক্ষপ্রদোঽচ্যুতঃ॥" (৯৫/১৭-১৮)

—একমাত্র পরাৎপর হৃষীকেশই সকলের ঈশ্বর, তাঁর যারা সতত সেবাপরায়ণ ত্রিজগতে তাঁরাই সেবনীয়। একমাত্র বিষ্ণুই ধর্মপ্রদ, একমাত্র হরিই প্রভূত বিত্তদাতা, একমাত্র চক্রীই কামপ্রদ, আর একমাত্র অচ্যুতই মোক্ষপ্রদ।

এর বাইরে যাঁরা অন্য দেবতার উপাসনা করেন তাঁরা বেদহীন ব্রাহ্মণের মতই অচ্ছ্যুৎ।

বেদব্যাসের এই সোচ্চার ঘোষণায় কেঁপে উঠল তাপসদের বুক। বিনীত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁরা বললেন—'আপনার মত প্রাজ্ঞ এবং তত্ত্বজ্ঞ এখানে কে আছে! আমাদের কাছে তর্জনী তুলে এই যে আপনার নিশ্চিত প্রতিপাদ্য রাখলেন, আপনি যদি এই কথা বিশ্বেশ্বরের ধাম বারাণসীতে গিয়ে বলতে পারেন, তাহলে, আপনার এই প্রতিপাদ্যে

আমাদের অবশ্যই প্রত্যয় জন্মাবে।'

ব্যাসদেব এই কথা শুনে বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দশ-হাজার শিষ্য নিয়ে চলে গেলেন কাশীতে। পঞ্চনদে স্নান করে, মাধবের পূজা সেরে এলেন পাদোদক-তীর্থে। সেখানে স্নান করে আদিকেশবকে দর্শন করলেন এবং পঞ্চরাত্রের অনুষ্ঠান করে বৈষ্ণবগণ-মধ্যে যথেষ্ট সমাদৃত হলেন।' সামনে-পিছনে শঙ্খধ্বনি-সহ অতঃপর ব্যাসদেব শ্রীভগবান অচ্যুতের জয়গান আর "সহস্রশীর্ষ-পুরুষ পুরুহূত-সুখপ্রদ। যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং বৈ তত্রৈকঃ পুরুষো ভবান্॥" (৯৫/৩৯) —হে সহস্রশীর্ষ! হে পুরুহূতসুখপ্রদ! যা হয়ে গেছে, যা হবে সব-কিছুর মধ্যে একমাত্র আপনিই বিরাজমান—এই কথা বলতে বলতে এলেন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে। তারপর সেখানে গীতারাধনা সমাপ্ত করে ঐভাবেই অচ্যুতের আবার জয়ধ্বনি দিয়ে ডানহাত তুলে সোচ্চারে বললেন—"ইদমেকং পরিজ্ঞানং সেব্যঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ॥" (৯৫/৪৫) —সর্বশাস্ত্র বারবার মন্থন করে আমি নিশ্চিত যে সর্বেশ্বর হরিই একমাত্র সেবনীয়।

ইতিমধ্যে নন্দী সেখানে এসে ঐকথা শুনে ব্যাসদেবের হাত এমন-ভাবে অবলীলাক্রমে স্তম্ভন করে দিলেন যে, তিনি হাত আর নামাতে পারলেন না। সেই সঙ্গে তাঁর বাক্যও এমনিভাবে রুদ্ধ হয়ে গেল যে তিনি আর একটি কথাও বলতে পারলেন না।

তখন গোপনে বিষ্ণু এসে ব্যাসদেবকে বললেন,—'এ তুমি কী দারুণ অপরাধ করে বসলে? তোমার কাণ্ড দেখে আমিও ভীত হয়ে পড়েছি। তুমি জাননা, আমার যা কিছু সবই বিশ্বেশ্বরের কৃপায়। বিশ্বেশ্বর ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছুই নেই। তাঁরই অনুগ্রহে আমি চক্রী, আমি লক্ষ্মীশ্বর। যদি আমার মঙ্গল চাও, তবে তাঁর স্তব কর।' ব্যাসদেব ইঙ্গিতে বললেন, নন্দীর দৃষ্টিমাত্রে তাঁর হাত স্তম্ভিত হয়ে গেল দেখে, তাঁরই ভয়ে তাঁর বাক পর্যন্ত রোধ হয়ে গেছে। দয়া করে তিনি যদি তাঁর কণ্ঠ স্পর্শ করেন, তাহলে, তাঁর আদেশ তিনি পালন করতে পারেন। অলক্ষিতে বিষ্ণু তাঁর কণ্ঠ স্পর্শ করে প্রস্থান

করলে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাসাষ্টক স্তোত্রে শিবের স্তুতি করে বললেন—
"নান্যং দেবং বেদ্ম্যহং শ্রীমহেশান্নান্যং দেবং স্তৌমি শম্ভোর্ঋতেঽহম্।
নান্যং দেবং বা নমামি ত্রিনেত্রাৎ সত্যং সত্যং সত্যমেতন্মৃষা ন॥'
(৯৫/৬৩)—আমি শ্রীমহেশ ছাড়া অন্য কোন দেবকে জানি না ; শম্ভু ছাড়া অন্য কোন দেবের স্তব করি না ; আর, ত্রিলোচন ছাড়া অন্য কোন দেবকে প্রণতিও করি না—সত্য সত্য, সত্য, মিথ্যা নয়।

তখন শম্ভুর ইঙ্গিতে নন্দী আবার ব্যাসদেবের হাত স্বাভাবিক করে দিলেন। ব্যাসদেবও শিবভক্ত হয়ে ঘণ্টাকর্ণ হ্রদের কাছে ক্ষেত্রতত্ত্বরূপী 'ব্যাসেশ্বর' লিঙ্গ স্থাপন, বিভূতি-লেপন, রুদ্রাক্ষ ধারণ আর রুদ্র-সুক্তনিষ্ঠ হয়ে লিঙ্গার্চনা আর ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করে কাশীতেই থেকে গেলেন।

অতঃপর অগস্ত্য জিজ্ঞেস করলেন স্কন্দদেবকে—ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করার পর শিবের অসীম প্রভাব জেনেও ব্যাসদেব কেন বারাণসী পুরীকে শাপ দিলেন ?

ষড়ানন বললেন—ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করে শিষ্যদের মধ্যে ধর্মব্যাখ্যা, ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, শিব-মাহাত্ম্য কীর্তন আর ভিক্ষার উপর নির্ভর করে অনন্যচিত্তে শিব-পরায়ণ হয়েই দিন কাটাচ্ছিলেন ব্যাসদেব।

একদিন ঋষিকে পরীক্ষা করার জন্যে মহেশ্বর দেবীকে বললেন ঃ

"অদ্য ভিক্ষাটনং প্রাপ্তে ব্যাসে পরমধার্মিকে।
অপি সর্ব্বগতে ক্বাপি ভিক্ষা মা যচ্ছ সুন্দরি।" (৯৬/৮২)

—আজ পরমধার্মিক ব্যাস ভিক্ষার জন্যে দ্বারে-দ্বারে ঘুরলেও, হে সুন্দরি, তুমি তাকে ভিক্ষা দিও না।

দেবীও যথারীতি পালন করলেন পতির আদেশ। প্রতি দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সশিষ্য ব্যাসদেব ঘুরলেন ভিক্ষার জন্যে। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হলেন। অপরাপর ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা পাচ্ছে, কিন্তু সারাদিন দ্বারে-দ্বারে ঘুরেও তাঁরা কিছুই পেলেন না। ফিরে এলেন নিজেদের আবাসে, সায়াহ্ন-ক্রিয়াদি সারলেন। সারাটা দিন এবং রাতটাও কাটাতে হল অনাহারে। পরদিন আবার শিবার্চনা, স্তব-স্তোত্রাদি পাঠ

এবং আনুষঙ্গিক কাজকর্ম সেরে শিষ্যদের নিয়ে বের হলেন ভিক্ষার জন্যে। দ্বারে-দ্বারে আজও ঘুরলেন কিন্তু গতদিনের মত আজও প্রতি বাড়ি থেকেই বিমুখ হলেন। এমন কি সারাদিন ঘুরে পরিশ্রান্ত শিষ্যেরাও কিছুমাত্র সংগ্রহ করে আনতে পারল না। পর-পর দুটো দিন এই-ভাবে চলে যাচ্ছে দেখে ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব মনে-মনে ভাবলেন—এমন তো কখনো হয় নি, তবে আজ দুদিন ধরে এমনটি হল কেন? রাজ্যে কি কোন বিপর্যয় দেখা দিয়েছে? "বারিতা ভিক্ষা কেনাপাস্মাসু চের্ষ্যয়া" —কেউ ঈর্ষাপ্রযুক্ত আমাদের ভিক্ষা দেওয়া নিষেধ করেছে? না, পুরবাসিরা কোন দুরবস্থায় পড়েছে। শিষ্যদের ডেকে বললেন, তোমাদের মধ্যে দু-তিনজন সারা নগর ভ্রমণ করে ব্যাপারটা কী দেখে এস।

গুরুর আদেশে সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল দু-তিনজন, ঘুরে এল সারা নগরী এবং যে বর্ণনা দিল তাতে ব্যাসদেব দেখলেন, কোথাও কোন বিপর্যয় ঘটেনি। স্নান-জপ-ধর্ম-কর্ম নিয়ে নগরী আগেও যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনটিই আছে—কোন ব্যতিক্রমই কোথাও ঘটেনি। শিষ্যরা বললে: "বিদ্যানাং চাশ্রয়ঃ কাশী কাশী লক্ষ্যাঃ পরালয়ঃ। মুক্তিক্ষেত্রমিদং কাশী কাশী সর্ব্বা ত্রয়ীময়ী" (৯৬/১২৩)—সমস্ত বিদ্যার আশ্রয় কাশী, মোক্ষলক্ষীর পরম ধর্ম কাশী, মুক্তিক্ষেত্র কাশী এবং কাশী সর্বদাই ত্রয়ীময়ী। ব্যাসদেবের আদেশে শিষ্যেরা এই শ্লোকটি আবার পুনরাবৃত্তি করলে, ক্ষুধাকাতর ব্যাস রাগে জ্বলে উঠলেন, আর মনে-মনে বললেন, কাশীবাসির বিদ্যা এবং ধনের ওপর এত গর্ব যে তারা ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষা পর্যন্ত দেয় না। এই ভেবে ব্যাসদেব কাশীর ওপর দিলেন শাপ—

"মা ভূত্ত্রৈপুরুষী বিদ্যা মা ভূত্ত্রৈপুরুষং ধনম্।
মা ভূত্ত্রৈপুরুষী মুক্তিঃ……॥" (৯৬/১২৫)

—এখানে ত্রৈপুরুষী বিদ্যা, ত্রৈপুরুষী ধন, ত্রৈপুরুষী মুক্তি কিছুই থাকবে না।

শাপ দেবার পরও আবার বের হলেন ভিক্ষাপাত্র নিয়ে। ঘুরলেন দ্বারে-দ্বারে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল দেখে শূণ্য পাত্রেই ফিরে চললেন

নিজের আশ্রমের দিকে। পথিমধ্যে কোন এক গৃহদ্বারে পতিব্রতা সুগৃহিণীর ছদ্মবেশে স্বয়ং ভবানী তাঁকে আহ্বান জানালেন তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য। বললেন—'আজ সারাদিন কোথাও কোন ভিক্ষুক দেখিনি। অতিথি-সেবা করাতে না-পারার জন্যে আমার স্বামীও অতিথির পথ চেয়ে অভুক্ত রয়েছেন। মুনিবর, আপনি দয়া করে অতিথি সেবারূপ গার্হস্থ্য-ধর্ম যাতে রক্ষা পায়, তা করুন।'

সেই রমণীর কমনীয় কান্তি, সুমধুর সম্ভাষণে ক্ষণিকের জন্যে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন ব্যাসদেব। বারাণসীর প্রতিটি বাড়িই প্রায় তাঁর গোচরে, কিন্তু এযাবৎ এঁকে কোথাও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। যদিও রমণীর আবেদনে তিনি সাড়া দিলেন, তবুও জিজ্ঞেস করলেন—'হে ভদ্রে! আপনি কে? কি আপনার পরিচয়?'

ছদ্মবেশিনী দেবী ভবানী ব্যাসদেবকে তখন বললেন:

"অত্রত্যস্যৈব হি মুনে গৃহিণী গৃহমেধিনঃ।
নিত্যং বীক্ষ্যে চরন্তং ত্বাং ভিক্ষাং শিষ্যগণৈর্বৃতম্॥
ত্বমেব মাং নো জানীষে জানে ত্বামহমেব হি।
তপস্বিন্ কিং বহূক্তেন যাবন্নাস্তং ব্রজেদ্রবিঃ॥" (৯৬/১৫০-১৫১)

—মুনিবর, আমি এখানকার গৃহস্বামীরই গৃহিণী। শিষ্য-পরিবৃত হয়ে আপনাকে প্রত্যেকদিনই ভিক্ষার জন্য পর্যটন করতে দেখি। আপনি আমাকে জানেন না, কিন্তু আমি আপনাকে জানি। হে তপস্বি! বেশী কথায় সময় অতিবাহিত করে লাভ কি? সূর্যাস্তের পূর্বেই আতিথ্য সফল করুন।

ব্যাসদেব বললেন—'আমার একটা শর্ত আছে, তা যদি আপনি পালন করতে পারেন, তবেই আপনার আতিথ্য আমি গ্রহণ করতে পারি।' শুনে দেবী বললেন—'আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন, আমার স্বামী অবশ্যই আপনার শর্ত পালন করবেন।' পরাশর-নন্দন বললেন,—'আমি একা নই, আমার দশ হাজার শিষ্য রয়েছে। তাদের ছেড়ে আমি একা আতিথ্য গ্রহণ করতে পারব না। আপনার স্বামী কি পারবেন আমার সবশিষ্য-সহ সূর্যাস্তের আগেই অতিথি-সৎকার করতে?

সে সামর্থ্য কি আপনাদের আছে?' শুনে দেবী বললেন—'এতে আপনার দ্বিধার কিছু নেই। আপনি নিঃসঙ্কোচে সকলকে নিয়ে সত্বর আসুন। বললেনঃ "পতির্মে বহুকালীনঃ কালং ন সহতে চিরম্। প্রিয়াতিথিঃ প্রিয়তমস্তদাতিথ্যসমৃদ্ধয়ে॥ আশু গত্বা সমাগচ্ছ যাবন্নস্তমিতো রবিঃ।" (৯৬/১৬৩-১৬৪)—আমার স্বামী অতি প্রাচীন, বেশী বিলম্ব তিনি সহ্য করতে পারেন না। অথচ আতিথ্য-পরায়ণ আমার পতি প্রিয়তম অতিথিকে অত্যন্ত ভালবাসেন। যাতে সূর্য্য অস্ত যাবার আগেই অতিথি সেবা সম্পন্ন করা যায়, আপনি সত্বর তাঁদের ডেকে আনুন।'

ব্যাসদেব সঙ্গে-সঙ্গে শিষ্যদের ডেকে গৃহস্বামীর সৌধে প্রবেশ করতেই কেউ এসে তাঁদের পা ধুইয়ে দিতে লাগল, কেউ তাঁদের সযত্নে উত্তম অন্নাদি পরিবেশন করে খাওয়াতে লাগল, যতক্ষণ না তাঁরা পরিতৃপ্ত হন। তারপর আহারাদি শেষ হলে মালা, চন্দন, বস্ত্র দিয়ে তাঁদের সম্মান রাখা হল। প্রথমে, কিছুটা বিস্মিত হলেও একসঙ্গে বসে ব্যাসদেবও আতিথ্য গ্রহণের পর সায়ংকৃত্য শেষ করে গৃহস্বামীর সামনে বসে তাঁদের প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে উঠতে যাবেন, এমন সময় বৃদ্ধরূপী স্বামী মহেশ্বরের ইঙ্গিতে দেবী ভবানী ব্যাসদেবকে জিজ্ঞেস করে বললেন—'মুনিবর, আপনি ধর্মজ্ঞ এবং শাস্ত্রজ্ঞ। বলুন, তীর্থবাসিগণের প্রধান ধর্ম কি? যা পালন করে আমরা এখানে বসবাস করতে পারি?'

প্রশ্ন শুনে ঈষৎ হেসে ব্যাসদেব বললেন—'আপনি নিজে যথেষ্ট ধর্মজ্ঞান-বিশিষ্টা। তবু যখন জিজ্ঞেস করলেন, তখন বলতেই হয়—আপনি যে ধর্মের অনুশীলন করছেন, এটিই ধর্ম, এছাড়া অন্য কোন ধর্ম নেই। আপনার এই প্রবীন স্বামী যাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তা পালন করাই আপনার ধর্ম।'

দেবী বললেন—'মুনিবর, আমি সাধারণ পালনীয় ধর্মের কথাই জিজ্ঞেস করছি।'

ব্যাসদেব বললেন:

"অনুদ্বেগকরং বাক্যং পরোৎকর্ষসহিষ্ণুতা ॥
বিচার্য্যকারিতা নিত্যং স্বধিষ্ণ্যোদচিন্তনম্।" (৯৬/১৭৯-১৮০)

—অনুদ্বেগকর বাক্য, পরের উৎকর্ষ-সহিষ্ণুতা, সব সময় বিচার করে কাজ করা আর নিজ গৃহের শুভচিন্তা।—এগুলিই হল গৃহস্থের পালনীয় সাধারণ ধর্ম।

দেবী বললেন—'তাই যদি ধর্ম হয়, তাহলে সবকিছুই নিজের আয়ত্বাধীন। আর তাই যদি সত্য হয়, তাহলে, দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি স্বার্থসিদ্ধি না-হওয়ার কারণে কেউ ক্রুদ্ধ হয়ে কাউকে শাপ দেয়, তাহলে সে শাপ কার লাগে?'

হঠাৎ এমন একটা কথা শুনে খানিকটা স্তম্ভিত থেকে ব্যাসদেব বললেন—'যে শাপ যে দেবে, তারই লাগবে।'

গৃহস্থ এরপর বললেন—'মুনিবর, তোমার মধ্যেই যদি সবকিছু রয়েছে, তখন দ্বারে-দ্বারে ঘুরেও যখন ভিক্ষা পেলে না, তখন তাকে দুর্ভাগ্য মনে করে সংযতবাক্ না থেকে নিরপরাধ ক্ষেত্রবাসিদের শাপ দিলে কেন? তাদের প্রতি এমন উদ্বেগকর বাক্য প্রয়োগ করলে কেন? শোন মুনি ঃ

"অদ্যপ্রভৃতি ন ক্ষেত্রে মদীয়ে শাপবর্জ্জিতে।
আবাস ক্রোধনমুনে ন বাসে যোগ্যতাত্র তে ॥
ইদানীমেব নির্গচ্ছ বহিঃ ক্ষেত্রাদিতো ভব।
ত্বদ্বিধানাং ন যোগ্যং মে ক্ষেত্রং মোক্ষৈকসাধনম্ ॥
অত্রাল্পমপি যদ্দৌষ্টং কৃতং মৎক্ষেত্রবাসিনাম্।
তদ্দৌষ্ট্যস্য পরীপাকো রুদ্রপিশাচ্যমেব হি ॥" (৯৬/১৯০-১৯২)

—হে ক্রোধনমুনে (ক্রোধসম্পন্ন মুনি)! আজ থেকে তুমি আমার এই শাপবর্জ্জিত ক্ষেত্রে বাস করো না; এখানে বাস করার যোগ্যতা তোমার নেই। তুমি এক্ষুণি এই ক্ষেত্রের বাইরে যাও। মোক্ষের একমাত্র সাধন আমার এই বারাণসী তোমার মত ব্যক্তির বাসযোগ্য নয়। এখানে আমার ক্ষেত্রবাসিদের প্রতি যারা সামান্যতম কটাক্ষপাতও করে তারা পরিণামে হয় রুদ্রপিশাচ।'

শুনে কেঁপে উঠল ব্যাসদেবের বুক। ভুল ভাঙ্গল। জননী গৌরীর চরণপ্রান্তে লুটিয়ে আকুল নয়নে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ব্যাসদেব। কিন্তু অলঙ্ঘ্য মহেশ্বরের নির্দেশ জেনে শুধু একটিমাত্র আবেদন রাখলেন পার্বতীর কাছে—যাতে প্রতি অষ্টমী আর চতুর্দশী তিথিতে তিনি এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারেন।

ব্যাসের আবেদন শুনে দেবী তাকালেন মহেশ্বরের মুখের দিকে তারপর তাঁর নির্বাক সম্মতি পেয়ে ব্যাসদেবকে বললেন—'তা-ই হবে।'

অনুমতি দিয়েই অন্তর্হিতা হলেন পার্বতী মহেশ্বর-সহ আর ব্যাসদেবও বিষন্ন অন্তঃকরণে ক্ষেত্রের বাইরে চলে গেলেন—গঙ্গার পূর্ব-পাড়ে লোলার্কের অগ্নিকোণে।

সেই থেকে একমাত্র অষ্টমী আর চতুর্দশী তিথি ছাড়া ব্যাসদেব অবস্থান করবেন সেখানেই।

[অধ্যায় ৯৭—১০০]

ব্যাসদেবের বৃত্তান্ত শোনার পর মহাশক্তিধর তত্ত্বজ্ঞ অগস্ত্যমুনি আনন্দকাননে অবস্থিত লিঙ্গস্বরূপ তীর্থসমূহের পরিচয় জানতে উৎসুক হলে, পার্বতীকে মহেশ্বর পুরাকালে যা বলেছিলেন, স্কন্দদেবও অগস্ত্যকে সেই সবই বললেন।

দেবদেব মহাদেব দেবী বিশালাক্ষীকে বলেছিলেন :

"মূর্ত্তয়ো ব্রহ্মবিষ্ণ্বর্কশিববিঘ্নেশ্বরাদিকাঃ।
লিঙ্গং শৈবমিতি খ্যাতং যত্রৈতত্তীর্থমেব তৎ ॥
বারাণস্যাং মহাদেবঃ প্রথমং তীর্থমুচ্যতে।
তদুত্তরে মহাকূপঃ সারস্বতপদপ্রদ ॥" (৯৭/৬-৭)

—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য, শিব. বিঘ্নেশ প্রভৃতি সব মূর্তিই শৈবলিঙ্গ বলে খ্যাত। এই লিঙ্গ যেখানে আছেন, তা-ই তীর্থ। বারাণসীতে মহাদেবই প্রথম তীর্থ, তার উত্তরে যে মহাকূপ তা হল সারস্বত

পদ-প্রদায়ী।

এই মহাকূপের পিছনে আছেন স্বয়ং বারাণসী দেবী। মহাদেবের পিছনে আছেন গোপ্রেক্ষ লিঙ্গ—শম্ভুর আদেশে গোলোক থেকে গো-সমূহ এইখানেই এসেছিলেন। এছাড়াও, দধীচীশ্বর, অত্রীশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, বরণার পূর্বতটে কুন্তীশ্বর, মুণ্ডাসুরেশ্বর, শিলাদেশ্বর, হিরণ্যাক্ষেশ্বর, যাজ্ঞবল্ক্যেশ্বরের পশ্চিমে প্রহ্লাদেশ্বর তার পূবে স্বর্লীনেশ্বর।

ক্ষেত্রের যেখানে শৈলেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তার উত্তরে কোটি গোদানের ফলদাতা কোটিশ্বর লিঙ্গ। এরই অগ্নিকোণে মহাশ্মশান স্তম্ভ; যার মধ্যে বাস করেন মহেশ্বর উমার সঙ্গে। বিশ্বকর্মেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে মহামুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ। দেবীকে দেবদেব বলেছিলেন—'এখানে আমি অতিশয় সুন্দর আমার মুণ্ডময়ী মালা নিক্ষেপ করেছিলাম, উৎপন্না হয়েছিলেন পাপনাশিনী মহামুণ্ডা দেবী আর খট্বাঙ্গ রেখেছিলাম বলে উদ্ভূত হয়েছিলেন খট্বাঙ্গেশ্বর লিঙ্গ।'

"ওঙ্কার এষ এবাসাবাদিবর্ণময়াত্মকঃ।
মৎস্যোদর্যুত্তরে কূলে নাদেশস্ত্বহমেব চ॥
নাদেশঃ পরমং ব্রহ্ম নাদেশঃ পরমা গতিঃ।
নাদেশঃ পরমং স্থানং দুঃখসংসারমোচনম্॥" (৯৭/৭৯-৮০)

—মৎস্যোদরীর উত্তরে প্রণবস্বরূপ আদিবর্ণময়াত্মক 'নাদেশ্বর' লিঙ্গ; হে দেবী, আমিই সেই নাদেশ্বর। নাদেশ্বরই পরম ব্রহ্ম, নাদেশ্বরই পরম গতি, নাদেশ্বরই দুঃখ ও সংসার বিমোচনের পরম ধাম।

কপালেশ্বরের দক্ষিণে শ্রীকণ্ঠ কুণ্ড, এরই কাছে মহালক্ষ্মীশ্বর লিঙ্গ। স্বর্গ হতে দেবগণ যখন মৎস্যোদরীতে আসেন তখন তাঁরা সস্ত্রীক এই পথ দিয়েই যাতায়াত করে থাকেন বলেই, এর নাম 'স্বর্গদ্বার।'

এই কুণ্ড এবং লক্ষ্মীশ্বরকে ঘিরে রয়েছেন সত্যবতীশ্বর, উগ্রেশ্বর, করবীরেশ্বর, মরীচীশ্বর, অগ্নিশ্বর।

এছাড়াও কাশীতে কোথাও এতটুকু এমন স্থান নেই যেখানে লিঙ্গ নেই, তীর্থ নেই। এখানকার লিঙ্গ, কূপ, সরোবর, জলাশয়, মূর্তি

গণনা করে শেষ করা যাবে না।

"স্বর্গাপবর্গয়োর্দাত্রী দৃষ্টা দেহান্তসেবিতা।
মম প্রিয়তমা দেবি ত্বমেব তপসো বলাৎ॥
স্বভাবতস্ত্বিয়ং কাশী সুখবিশ্রামভূর্মম।
যে কাশ্যা নাম গৃহ্ণন্তি যেঽনুমোদন্ত এব হি॥
তে মে শাখবিশাখাভ্যাং স্কন্দনন্দীগজাস্যবৎ।
ত এব ভক্তা মে দেবি ত এব মম সেবকাঃ॥" (৯৭/২৭০-২৭২)

—দর্শন করলে কাশী স্বর্গ প্রদান করেন, অন্তিমকালে তার সেবা করলে তিনি অপবর্গ দান করেন। দেবি! তুমি তপস্যাবলে আমার প্রিয়তমা হয়েছ; কিন্তু সুখবিশ্রামভূমি কাশী স্বভাবতই আমার প্রিয়তমা। যারা কাশীর নাম গ্রহণ করে, কাশীর সুখ্যাতি করে, তারা আমার শাখ, বিশাখ, স্কন্দ, নন্দী আর গণেশের সমান। দেবি, তারাই আমার ভক্ত, তারাই আমার সেবক।

কাশী সর্বতীর্থসার। কাশী সর্বধর্মসার। "অন্ত্যজোঽপি বরঃ কাশ্যাং নান্যত্র শ্রুতিপারগঃ।"—স্থানান্তরের বেদপারগামী ব্রাহ্মণ চেয়ে কাশীতে অন্ত্যজ-ও শ্রেষ্ঠ।

মহেশ্বর যখন দেবীকে এইসব কথা বলছিলেন, তখন নন্দী এসে প্রণতি জানিয়ে নিবেদন করলেন দেবদেবকে:

"জাতা পরিসমাপ্তিশ্চ মহাপ্রাসাদনির্ম্মিতেঃ।
সজ্জীকৃতো রথশ্চায়ং ব্রহ্মাদ্যা মিলিতাঃ সুরাঃ॥
তার্ক্ষ্যগঃ পুণ্ডরীকাক্ষো দ্বারি তিষ্ঠতি সানুগঃ।
প্রতীক্ষমাণোঽবসরং পুরস্কৃত্য মুনীশ্বরান্॥
চতুর্দ্দশসু লোকেষু যে যে তিষ্ঠন্তি সুব্রতাঃ।
তে নিশম্যাত্র মিলিতাঃ প্রাবেশিকমহোৎসবম্॥" (৯৭/২৯৪-২৯৬)

—মহাপ্রাসাদ নির্মাণ শেষ হয়েছে, সজ্জিত রথও প্রস্তুত, ব্রহ্মা-প্রভৃতি দেবগণও হাজির হয়ে গেছেন। নিজ অনুচরবর্গের সঙ্গে গরুড়-বাহন পুণ্ডরীকাক্ষ মুনীশ্বরগণকে পুরোভাগে নিয়ে দ্বারে অপেক্ষমান। চতুর্দশ-ভুবনের যত ধার্মিক আছেন, আপনার কাশী

প্রবেশ উপলক্ষ্যে মহোৎসবের কথা শুনে সকলেই এখানে সমাগত।

নন্দীর কাছ থেকে এই কথা শুনে মহেশ্বর ত্রিবিষ্টপ ক্ষেত্র থেকে বের হয়ে দেবীকে নিয়ে সেই দিব্য রথে আরোহণ করলেন নবনির্মিত প্রাসাদে গমনের জন্যে। সঙ্গে-সঙ্গে স্বর্গ-মর্ত্য জুড়ে উঠল আনন্দের হিল্লোল,—মঙ্গলবাদ্য, বেদধ্বনি, বিচিত্র-বর্ণের বিভিন্ন-আকৃতিযুক্ত পতাকা, চন্দন, সুর-অসুর-গন্ধর্ব-উরগ-বিদ্যাধর, সাধ্য, কিন্নর—সকলেই যেন আনন্দমুখর হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল, জড় পদার্থও যেন জড়ত্ব পরিত্যাগ করে সপ্রাণ হয়ে উঠেছে।

কুমারদের নিয়ে ভগবান মহেশ্বর ভবানীর সঙ্গে মুক্তিমণ্ডপে প্রবেশ করে আসনে উপবেশন করলে চতুরানন ব্রহ্মা তাঁর অভিষেক করলেন। দেব এবং উরগ-শ্রেষ্ঠগণ রত্ন, বস্ত্র, মাল্য, গন্ধাদির দ্বারা তাঁর পূজা করলেন। ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণ তাঁর অর্চনা করলেন।

মহাদেব মুনিদের অভিলাষ পূরণ করে ব্রহ্মাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বিষ্ণুকে বললেন,—আমার এই আনন্দকাননে প্রত্যাবর্তন করার মূলে তুমি আর গণপতি। তোমারই উপদেশে দিবোদাস লাভ করেছে পরম-সিদ্ধি, আমিও ফিরে পেয়েছি আমার আনন্দ-নিকেতন। বিষ্ণু, তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। শুনে, বিষ্ণু, বললেন, "যদি প্রসন্নোঽসি পিনাকপাণে তদা পদাদ্দূরমহং ন তে স্যাম্॥" (৯৮/২৯)—হে পিনাকপাণি, যদি প্রসন্নই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে যেন কখনো আপনার চরণ থেকে দূরে অবস্থান করতে না হয়।

মধুসূদনের আবেদনে পরিতুষ্ট দেবদেব, বিষ্ণুর অভিলাষ পূরণ করে বললেন: তুমি আমার কাছেই অবস্থান কর। ভক্তিযুক্ত যে ব্যক্তি আগে তোমার পূজা না করে আমার পূজা করবে, পরাৎপর-হানি হয়ে সে অভীষ্ট লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। মহাদেব বললেন—এই স্থানে যত মণ্ডপ আছে, তার মধ্যে এই মুক্তিমণ্ডপই সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বাপরযুগে এই মুক্তিমণ্ডপই 'কুক্কুটমণ্ডপ' নামে খ্যাত হবে।

এই মুক্তিমণ্ডপ দ্বাপর যুগে কেন কুক্কুটমণ্ডপ-রূপে খ্যাত হবে

চতুর্ভুজ শ্রীহরি তা জানতে উৎসুক হলে ভূতভব্যেশ ভগবান মহাদেব সেই ভবিষ্যৎ কাহিনী বর্ণনা করলেন তাঁর কাছে।

দ্বাপরযুগে এখানে মহানন্দা নামে এক ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণের জন্ম হবে। প্রথম জীবনে সে হবে নিরহংকারী, নিরভিমানী, আচারনিষ্ঠ। কিন্তু যৌবন সমাগত হলে, পিতার মৃত্যুর পর, অভিভাবকহীন অবস্থায়, সে যৌবনের মাদকতা কাটিয়ে উঠতে না পেরে, তাতেই গা-ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হবে। কন্দর্পশরে ব্যাকুল হয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে দেহজ কামনার পরিতৃপ্তি ঘটাতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, সুযোগ বুঝে তার ভার্যাটিকে নিজের অনুকূলে এনে তাকে অপহরণ করবে এবং সেই মদালসা যৌবনবতীর উৎসাহেই অভক্ষ-ভক্ষণ, অপেয়-পানে রত হয়ে পড়বে। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কখনো বৈষ্ণবদের দলে ভীড়ে শিবনিন্দা আবার কখনো শৈবদের দলে ভীড়ে বৈষ্ণবদের নিন্দা করা তার অভ্যাসগত হয়ে দাঁড়াবে। যখন যেখানে যেভাবে পেকে প্রতিগ্রহের সুবিধা হবে, সেইভাবেই তার ব্রাহ্মণ্য সত্ত্বাকে জলাঞ্জলি দিয়ে কপটতার দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করতে থাকবে। এইভাবে চলতে-চলতে তার দুটি পুত্র-ও হবে।

এই সময়ে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে পার্বত্য-প্রদেশ থেকে এক ধনী আসবে কাশীতে। চক্র-সরোবরে স্নানান্তে সেই ধনী দানেচ্ছু হয়ে সকলকে ডেকে-ডেকে বলবে, বিশ্বেশ্বরের প্রীতির জন্যে সে দান করতে ইচ্ছুক। কিন্তু জাতিতে সে চণ্ডাল—চণ্ডাল-প্রধান। এমন কোন ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি তার দান গ্রহণ করে তার অভিলাষ পূরণ করতে পারেন ? চণ্ডাল শুনে, প্রতিগ্রহকামী সব ব্রাহ্মণই পিছিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিল মহানন্দাকে। মহানন্দা তখন জপমালা হাতে জপে নিরত। ব্রাহ্মণদের কথায় ধনী ব্যক্তিটি আসবে তার কাছে, জানাবে তাঁর একান্ত প্রার্থনা শুনে, মহানন্দা তার কপট ধ্যান পরিত্যাগ করে জপমালা কানে রেখে হাতের ইশারায় জানতে চাইবে, কত ধন সে দান করবে। তাই শুনে ধনী বলবে :

"তস্য সংজ্ঞাং স বৈ বুদ্ধা প্রোবাচাতি প্রহৃষ্টবৎ।
সন্তৃপ্তির্থবতা তে স্যাত্তাবদ্দাস্যামি নান্যথা॥" (৯৮/৫৫)

—তার সেই ইঙ্গিত বুঝতে পেরে প্রহৃষ্টচিত্তে চণ্ডাল প্রধান বলবে—যত ধন পেলে আপনি পরিতৃপ্ত হবেন, তত পরিমান ধনই আপনাকে দেব। এর অন্যথা হবে না।

তার কথা শুনে মহানন্দা মৌন ভঙ্গ করে বলবে, যদিও ক্ষেত্রে প্রতিগ্রহ নেওয়া আমার ইচ্ছাবিরুদ্ধ, তবুও তোমার অনুরোধে, তোমার ব্রতরক্ষার জন্যে আমি দান গ্রহণ করতে পারি একটা শর্তে, তা হল, তোমার যত ধন আছে, তার কণামাত্র-ও অপর কাউকে দিলে চলবে না।

ধনী তাতেই সম্মত হলে, মহানন্দার নির্দেশে চণ্ডাল-প্রধান তখনি কুশহস্তে তার যাবতীয় ধন সমর্পন করবে মহানন্দাকে আর মহানন্দা-ও তা সাগ্রহে গ্রহণ করবে। ধনী বিশ্বেশ্বরের জয়ধ্বনি দিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলে কাশীতে মহানন্দার অবস্থা হয়ে উঠবে দুর্বিষহ। কাশীবাসী ব্রাহ্মণেরা তাকে দেখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করবে আর এই বলে ধিক্কার দেবে—চণ্ডালের দান-গ্রহণকারী এই ব্রাহ্মণ হল চণ্ডালের ব্রাহ্মণ। শেষে এমন অবস্থা হবে যে দিনের আলোয় তার বাইরে বের হওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

পরিশেষে একদিন এই ধিক্কার সহ্য করতে না পেরে সস্ত্রীক এবং পুত্র-সহ সে বারাণসী ত্যাগ করে কিক্কটদেশ (গয়া প্রদেশ) অভিমুখে প্রস্থান করবে। পথিমধ্যে তারা আক্রান্ত হবে দস্যুদের দ্বারা। তারা তার সোনা-দানাই শুধু লুঠ করে নেবে না, বনমধ্যে নিয়ে গিয়ে তাদের সকলকে হত্যা করবে বলেও মনস্থ করবে, যাতে লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ তারা নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারে।

তখন তারা মহানন্দাকে বলবে—আমরা তোমাদের সকলকে বধ করব। সুতরাং, তোমাদের যদি কাউকে স্মরণ করার থাকে তো করে নাও।

ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে কাশীর জন্যে তখন শোকাতুর

হয়ে উঠবে মহানন্দা। তার দুষ্কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হবে। কাশী-বাসী না হয়েও কাশীতে মৃত্যু না-হওয়ার জন্যে মনে-মনে তীব্র অনুশোচনা ভোগ করবে। তারপর দস্যুরা তাদের হত্যা করলে গয়ায় তারা জন্ম-পরিগ্রহ করবে কুক্কুট-রূপে। আর মৃত্যুকালে কাশী-নাম, কাশীবাসের কথামাত্র স্মরণ করার ফলে জাতিস্মরও হবে।

বেশ কিছুকাল এইভাবে চলবার পর, যে পথে ওরা বিচরণ করে বেড়াবে সেই পথ দিয়েই জনকয় কার্পটিক (সাধু) আসবে বারাণসীর উদ্দেশ্যে। কাশী-কথা ছাড়া আর কোন আলোচনাই থাকবে না তাদের মুখে। স্বামী স্ত্রী আর দুই শাবক নিয়ে এই চারিটি কুক্কুটের কানে কাশী-কথা যাওয়া-মাত্রই তাদের মধ্যে জন্মান্তরের স্মৃতি জেগে উঠবে আর তারা বিনা দ্বিধায় সেই কার্পটিকদের অনুসরণ করতে থাকবে।

এই কুক্কুট চারটিকে এইভাবে তাদের অনুসরণ করতে দেখে মায়া জাগবে কার্পটিকদের মনে। সুদীর্ঘ পথে যাতে তারা ক্ষুধাতুর হয়ে না পড়ে, তার জন্যে নিজেদের তণ্ডুলাদি থেকে, তাদের তণ্ডুলও দেবে। তাই খেতে-খেতে আর কাশীকথা শুনতে-শুনতে একসময় তারা এসে হাজির হবে এই অবিমুক্তক্ষেত্রে। এসেই তারা এই মুক্তিমণ্ডপে চলে আসবে আর এই মণ্ডপের চারদিকেই ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে—অন্য কোথাও একপা-ও যাবে না। এইভাবে তারা ক্রমশঃই মুক্তিমণ্ডপের প্রতি, অনন্যচিত্ত হয়ে উঠবে। ক্ষেত্রবাসিরাও তাদের করুণা করবে। তারাও ক্রমে-ক্রমে সংযমী, জিতেন্দ্রিয় হয়ে এইখানেই একসময় প্রাণত্যাগ করবে। ঠিক সেই সময়েই, সকলের সামনে, আমার অনুগ্রহে আকাশপথে দিব্য-বিমান এসে তাদের নিয়ে যাবে কৈলাসে। এই সমস্ত দেখার পর থেকেই জ্ঞানী-ব্যক্তিরা আমার এই মুক্তিমণ্ডপকে 'কুক্কুটমণ্ডপ' নামে আখ্যাত করবে।

ভগবান শম্ভু শ্রীহরিকে এই ভবিষ্যৎ কথা যখন বলছিলেন সেই সময়ই ঘণ্টাধ্বনির বিপুল শব্দ উঠছিল। নন্দীকে ডেকে তিনি এর তত্ত্ব নিতে বলেছিলেন। ভবিষ্যৎ কাহিনী শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গেই নন্দী

এসে জানাল—এখানে কেউ কেউ মোক্ষলক্ষ্মীর বিলাসের পূজায় রত হয়েছে। শুনে, মহাদেব ঈষৎ হেসে নন্দীকে বললেন—নন্দী আমাদের অভীষ্ট তাহলে পূরণ হয়েছে।

এরপর বৃষভধ্বজ দেবদেব মহাদেব সেখান থেকে উঠে পার্বতি, হরি আর ব্রহ্মাকে নিয়ে মুক্তিমণ্ডপ থেকে এলেন শৃঙ্গারমণ্ডপে। ডানদিকে ব্রহ্মা, বাঁদিকে বিষ্ণুকে নিয়ে দেবী পার্বতি-সহ অপত্যদের (স্কন্দ দেবদের) নিয়ে পূবমুখে উপবেশন করলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর। ঋষিরা তাঁদের ঘিরে দাঁড়ালেন, মহেন্দ্র তাঁকে ব্যজন করতে লাগলেন, হাতের অস্ত্র-শস্ত্রাদি শূন্যে তুলে মৌনাবলম্বন করে শিবের গণেরা দাঁড়ালেন তাঁর পিছনে। দেবদেব শম্ভু অতঃপর ডান হাত তুলে সামনে সপ্তপাতালভেদী স্বয়ম্ভু বিশ্বেশ্বর লিঙ্গকে দেখিয়ে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে বললেন—"ইদমেব পরং জ্যোতিরিদমেব পরাৎপরম্ ॥" (৯৯/৭) —ইনিই আমার পরমজ্যোতি, ইনিই পরাৎপর—ইনি আমারও পূজ্য। বললেন—"অয়ং বিশ্বেশরঃ সাক্ষাৎ স্থাবরাত্মা জগৎপ্রভুঃ ॥ (৯৯/১৬)—এই বিশ্বেশ্বর আমার সাক্ষাৎ স্থাবরাত্মা এবং জগৎপ্রভু। সর্বসিদ্ধিবিধায়ক ইনি কখনো হবেন দৃশ্য, কখনো বা অদৃশ্য, দেবগণ এবং ঋষিগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন—সব লিঙ্গ মধ্যেই আমি আছি, সন্দেহ নেই কিন্তু এই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গই আমার সর্বপাপ-নাশন শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ।

"যেন লিঙ্গমিদং দৃষ্টং শ্রদ্ধয়া শুদ্ধচক্ষুষা।
সাক্ষাৎকারেণ তেনাহং দৃষ্ট এব দিবৌকসঃ ॥" (৯৯/২১)

—হে দেবগণ, যে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশুদ্ধ নয়নে এই লিঙ্গ দর্শন করে, তার সেই দর্শন হয় আমারই সাক্ষাৎকার।

এই লিঙ্গের সেবা, পূজা হল আমারই সেবা-পূজা এবং সব সময়ই তা অভীষ্ট ফলদাতা।

"বিশ্বেশাখ্যা তু জিহ্বাগ্রে বিশ্বনাথকথা শ্রুতৌ।
বিশ্বেশশীলনং চিত্তে যস্য তস্য জনিঃ কুতঃ ॥" (৯৯/৪৩)

—জিহ্বাগ্রে যার বিশ্বেশ্বরের নাম, কর্ণ যার বিশ্বনাথ-কথা শ্রবনরত,

চিত্ত যার বিশ্বেশ্বর-চিন্তায় মগ্ন—তার আর পুনর্জন্ম কোথায় ?

অতঃপর সমস্ত দেব এবং ঋষিগণকে উদ্দেশ্য করে দেবাদিদেব শম্ভু বললেন—সমস্ত বারাণসীই তীর্থময়ী, বারাণসীর নামও তীর্থের তীর্থ কিন্তু আমার রাজভবনের কিছুটা ঈশান-কোণ আশ্রয় করে বামে এবং দক্ষিণে যথাক্রমে তিনশো আর দুশো হাত আর গঙ্গামধ্যে পাঁচশো হাত পরিমিত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত মণিকর্ণিকার তুল্য তীর্থ ভূলোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, সত্যলোক, তপোলোক, বৈকুণ্ঠে, কৈলাসে বা রসাতলে কোথাও নেই। কোন স্থানেই বিশ্বেশ্বর সমান লিঙ্গ, মণিকর্ণিকার সমান তীর্থ আর আমার আনন্দ-কাননের তুল্য তপোবন নেই।

"উৎক্ষিপ্য বাহুং ত্বসকৃদ্ ব্রবীমি ত্রয়ীময়েঽস্মিংস্ত্রয়মেব সারম্।

বিশ্বেশলিঙ্গং মণিকর্ণিকাম্বু কাশীপুরী সত্যমিদং ত্রিসত্যম্॥" (৯৯/৬১)

—আমি হাত তুলে বারবার বলছি, এই স্থানে তিনটি প্রধান—বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ, মণিকর্ণিকার জল আর কাশীপুরী; এই তিনটিই সত্য, ত্রিসত্য।

এই বলে মহেশ্বর শৃঙ্গারমণ্ডপ থেকে উঠে শক্তির সঙ্গে সেই লিঙ্গমধ্যে লীন হলেন এবং দেবগণও জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁর স্তব করলেন।

কাশী-বিয়োগ সন্তপ্ত মিত্রাবরুণ-নন্দন কুম্ভজ অগস্ত্যকে স্কন্দদেব মহাদেব-মুখ-নিঃসৃত কাশী-মাহাত্ম্যের অংশমাত্র শুনিয়ে বললেন—

"অচিরেণৈব কালেন কাশীং প্রাপ্স্যস্যনুত্তমাম্॥

অস্তাচলস্য শিখরং প্রাপ্তবানেষ ভানুমান্।"

তবাপি হি মমাপ্যেষ মৌনস্যঃ সময়োঽভবৎ॥" (৯৯/৬৪-৬৫)

—তুমি অচিরেই অনুত্তম কাশীধাম প্রাপ্ত হবে। এখন সূর্য অস্তাচল শিখরে গমন করেছেন। তোমার এবং আমার উভয়েরই মৌনাবলম্বনের সময় উপস্থিত।

মহামুনি অগস্ত্য অতঃপর স্কন্দদেবকে বারবার প্রণাম করে লোপামুদ্রার সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন সান্ধ্য-উপাসনার জন্য।

ব্যাসদেব বললেন :

"যথা দেব্যৈ সমাখ্যায়ি শিবেন পরমাত্মনা।

তথা স্কন্দেন কথিতং মাহাত্ম্যং কুম্ভসম্ভবে॥

তবাগ্রে চ সমাখ্যাতং শুকাদীনাং চ সত্তম।" (৯৯/৬৯—৭০)

—দেবীকে পরমাত্মা শিব (কাশী মাহাত্ম্য সম্বন্ধে) যেমনটি বলেছিলেন, স্কন্দদেবও কুম্ভসম্ভব অগস্ত্যের সামনে সেইরকম বর্ণনাই করেছিলেন। আর—হে সত্তম আমিও তোমার (সূতের) আর শুকের কাছে তা-ই বললাম।

কাশীখণ্ড শোনার পর মহাপ্রাজ্ঞ সূত লোমহর্ষণ যাত্রা-পরিক্রম* সম্বন্ধে ব্যাসদেবের কাছে জানতে সমুৎসুক হলেন।

সত্যবতী-নন্দন ব্যাসদেব তাঁকে প্রথমেই বললেন পঞ্চতীর্থ যাত্রার কথা। এতে যাত্রিরা প্রথমে সবস্ত্রে চক্র-পুষ্করিণীর জলে স্নান করে দেব ও পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ ও অর্থিগণকে যথাসম্ভব পরিতুষ্ট করে আদিত্য দ্রৌপদী, বিষ্ণু, দণ্ডপাণি, মহেশ্বরকে প্রণাম করে ঢুণ্ঢিবিনায়ককে দর্শন করবে। তারপর জ্ঞানবাপীর জলে স্নান করে নন্দিকেশ্বরের পূজা সেরে যথাক্রমে তারকেশ্বর ও মহাকালেশ্বরের পূজা করে পুনরায় দণ্ডপাণির পূজা করবে।

এরপর সর্বার্থসিদ্ধিদা বৈশ্বেশ্বরী যাত্রা। মৎস্যোদরীতে স্নানাদি করে প্রথমে প্রণবেশ্বর দর্শন। তারপর ত্রিবিষ্ঠপ, মহাদেব, কৃত্তিবাস, রত্নেশ্বর, চণ্ডেশ্বর, কেদারেশ্বর দর্শন করে যথাক্রমে ধর্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্মেশ্বর এবং মণিকর্ণিকেশ্বর গমন করে অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করে বিশ্বেশ্বরের পূজা করবে।

যারা কাশীক্ষেত্রে বাস করে এইভাবে যাত্রা না করে তারা নানারকম বিঘ্নের সম্মুখীন হয়। বিঘ্নশান্তির জন্যে আছে অষ্টায়তনী যাত্রা। বিশেষ করে অষ্টমী তিথিতে দক্ষেশ্বর, পার্বতীশ্বর, পশুপতীশ্বর,

* যাত্রিরা কিভাবে কাশী পরিক্রমা করবে।

গঙ্গেশ্বর, নর্মদেশ্বর, গভস্তীশ্বর, সতীশ্বর এবং তারকেশ্বর দর্শন। এছাড়াও উপশান্তির জন্যে তীর্থযাত্রিরা যথাক্রমে বরণায় স্নান করে সঙ্গমেশ্বর, স্বর্লীনতীর্থে স্নান করে স্বর্লীনেশ্বর, মন্দাকিনী তীর্থে স্নান করে মধ্যমেশ্বর, হিরণ্যগর্ভ তীর্থে স্নান করে হিরণ্যগর্ভেশ্বর দর্শন করবে। এরপর মণিকর্ণিকায় স্নান করে ঈশানেশ্বর দর্শন এবং তার কূপে স্নান করে গোপ্রেক্ষেশ্বর দর্শন। কাপিল হ্রদে স্নান করে বৃষভধ্বজ, উপশান্ত কূপে স্নান করে উপশান্ত শিব দর্শন করবে। তারপর পঞ্চচূড়া হ্রদে স্নান করে জ্যেষ্ঠস্থানের পূজা এবং চতুঃসমুদ্র-কূপে স্নান করে মহাদেবের পূজা করবে। মহাদেবের সামনে বাপীর জল স্পর্শ করে শুক্রকূপে স্নান করে শুক্রেশ্বর দর্শন, দণ্ডখাত-তীর্থে স্নান করে ব্যাঘ্রেশ্বরের পূজা, শৌনকেশ্বর-কুণ্ডে স্নান করে জম্বুকেশ্বর-মহালিঙ্গের পূজা করবে।

এছাড়া রুদ্রত্ব-লাভকারী আছে একাদশ-আয়তনী যাত্রা। এতে প্রথমে অগ্নীধ্র-কুণ্ডে স্নান সেরে অগ্নিধ্রেশ্বর দর্শন, তারপর যথাক্রমে উর্বশীশ্বর, নকুলীশ্বর আষাঢ়ীশ্বর, ভারভূতেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর, ত্রিপুরান্তক, মনঃপ্রকামেশ্বর, প্রীতিকেশ্বর, মদালসেশ্বর এবং তিলপর্ণেশ্বর গমন করতে হয়।

ব্যাসদেব বললেন ঃ

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি গৌরীযাত্রামনুত্তমাম্।
শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়াং যা যাত্রা বিশ্বগৃদ্ধিদা ॥" (১০০/৬৭)

—অতঃপর উৎকৃষ্ট গৌরী-যাত্রা বলছি। শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে যে যাত্রা সমৃদ্ধিপ্রদা।

জ্যেষ্ঠাবাপীতে স্নান করে জ্যেষ্ঠাগৌরী এবং শৃঙ্গারতীর্থে স্নান করে শৃঙ্গার-গৌরীর পূজা। তারপর বিশালগঙ্গায় স্নান করে বিশালাক্ষী গমন, ললিতা-তীর্থে স্নান করে ললিতাদেবীর পূজা, ভবানী তীর্থে স্নান করে ভবানীর পূজা, বিন্দুতীর্থে স্নান করে মঙ্গলার পূজা সমাপন করে গমন করতে হবে স্থিরলক্ষ্মী-সমৃদ্ধির জন্যে মহালক্ষ্মীতে।

প্রতিদিন অন্তর্গৃহে যাত্রা অবশ্য কর্তব্য।

"প্রাতঃস্নানং বিধায়াদৌনত্বা পঞ্চবিনায়কান্।
নমস্কৃত্বাথ বিশ্বেশং স্থিত্বা নির্ব্বাণমণ্ডপে॥
অন্তর্গৃহস্য যাত্রাং বৈ করিষ্যেঘোঘশান্তয়ে।
গৃহীত্বা নিয়মঞ্চেতি গত্বাথ মণিকর্ণিকাম্॥
স্নাত্বা মৌনেন চাগত্যা মণিকর্ণিশমর্চ্চয়েৎ।" (১০০/৭৭-৭৯)

—প্রাতঃস্নান শেষে পঞ্চবিনায়ককে প্রণতি জানিয়ে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করে নির্বাণমণ্ডপে বসে 'আমি পাপশান্তির জন্য অন্তর্গৃহে যাচ্ছি' একথা ঘোষণা করে মণিকর্ণিকায় স্নান করে সেখান থেকে মৌন-অবলম্বন করে এসে মণিকর্ণিকেশ্বরের পূজা করবে।

তারপর কম্বলেশ্বর, অশ্বতরেশ্বর, বাসুকীশ্বরকে প্রণাম করে পর্বতেশ্বর দর্শন করে যথাক্রমে গঙ্গাকেশব, ললিতাদেবী, জরাসন্ধেশ্বর, সোমনাথকে দর্শন করে যাবে বরাহেশ্বরের কাছে। তারপর ব্রহ্মেশ্বর এবং অগস্তীশ্বরকে নমস্কার জানিয়ে প্রণাম করবে কাশ্যপেশ্বর এবং হরিকেশবনকে। তারপর বৈদ্যনাথ এবং ধ্রুবেশ্বরকে দর্শন করে গোকর্ণেশ্বরের পূজা করে যাবে হাটকেশ্বরের কাছে। এরপর অস্থিক্ষেপ তড়াগে কীকসেশ্বরকে দর্শন করে ভারভূতেশ্বর ও চিত্রগুপ্তেশ্বরকে প্রণাম করে চিত্রঘণ্টা এবং পশুপতিশ্বরকে প্রণাম সেরে, প্রথমে পিতামহেশ্বরে গমন করে যথাক্রমে কলসেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর বীরেশ্বর, বিদ্যেশ্বর, অগ্নীশ্বর, নাগেশ্বর, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, চিন্তামণি বিনায়ক এবং সেনাবিনায়ককে দর্শন করবে। তারপর সশ্রদ্ধচিত্তে বিগ্রহধারী বশিষ্ঠ ও বামদেবকে দর্শন করে সীমাবিনায়ক এবং করুণেশ্বর গমন করবে। অতঃপর ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, বিশালাক্ষী, ধর্মেশ্বর, বিশ্ববাহুকা, আশাবিনায়ক, বৃদ্ধাদিত্য, চতুর্বক্ত্রেশ্বর, ব্রাহ্মীশ্বর, মনঃপ্রকামেশ্বর, ঈশানেশ্বর, চণ্ডী, চণ্ডীশ্বর, ভবানী-শঙ্কর, ঢুণ্ঢি, লাঙ্গুলীশ্বর, নকুলীশ্বর, পরান্নেশ্বর, পরদ্রব্যেশ্বর, প্রতিগ্রহেশ্বর, নিষ্কলঙ্কেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, অপ্সরেশ্বর, গঙ্গেশ্বর-এর পূজা করে জ্ঞানবাপীতে স্নান করবে, তারপর নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর, মোক্ষেশ্বর, বীরভদ্রেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর, এবং পঞ্চবিনায়ককে প্রণাম করে বিশ্বনাথে গমন করবে। এতক্ষণ

মৌনাবলম্বনের পর এইবার মৌনভঙ্গ করে বলবে ঃ

"অন্তর্গৃহস্য যাত্রেয়ং যথাবদ্ যা ময়া কৃতা।
ন্যূনাতিরিক্তয়া শম্ভুঃ প্রীয়তামনয়া বিভুঃ॥" (১০০/৯৬)

—কমবেশী আমি এই যে অন্তর্গৃহ-যাত্রা করলাম, হে বিভু মহেশ্বর এতে আপনি প্রীত হন।

ব্যাসদেব বললেন, দুটি যাত্রা অবশ্যই যত্নপূর্বক করা উচিত—প্রথমে গঙ্গা, তারপর বিশ্বেশ্বর। যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় স্নান এবং বিশ্বেশ্বর দর্শন করে, সমস্ত তীর্থ-স্নান এবং সমস্ত যাত্রার সুফল সে অবশ্যই পাবে।

"সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং পুনঃপুনঃ।
দৃশ্যো বিশ্বেশ্বরো নিত্যং স্নাতব্যা মণিকর্ণিকা॥" (১০০/১০৫)

—আমি সত্য, সত্য এবং বারংবার এই সত্য বলছি, প্রত্যহ বিশ্বেশ্বরের দর্শন এবং মণিকর্ণিকায় স্নান করা কর্তব্য।

ব্যাসদেব সূতের কাছে যাত্রা-প্রকরণ-সহ কাশীখণ্ড সমাপ্ত করে বললেন ঃ

"মহাধর্ম্মৈকজননং মহার্থপ্রতিপাদকম্।
কারণং সর্ব্বকামাপ্তেঃ কাশীখণ্ডমিদং স্মৃতম্॥" (১০০/১১৬)

"হৃষ্টঃ সর্ব্বো ভবেদেব ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ।
মহিমশ্রবণাদস্মাদ্ বারাণস্যা ন সংশয়ঃ॥" (১০০/১১৯)

—এই কাশীখণ্ড মহাধর্মের একমাত্র জনক, মহান অর্থের প্রতিপাদক এবং সর্বকামপ্রাপ্তির কারণ বলে খ্যাত। বারাণসীর এই মহিমা শুনে চতুর্বিধ ভূতসমূহ পুলকিত হয়ে থাকে, এতে কোন সংশয় নেই।

সমাপ্ত

পরং গুহ্যতমং ক্ষেত্রং মম বারাণসী পুরী।
সর্বেষামেব ভূতানাং সংসারার্ণবতারিণী ॥ (৩০/২২)

[কূর্মপুরাণম্ ॥ পূর্বভাগঃ]

—আমার বারাণসী পুরী অতীব গুহ্যক্ষেত্র। (এই ক্ষেত্র) প্রাণীবর্গের সংসার-সাগরতারিণী।

*   *   *

অবিমুক্তং পরং জ্ঞানমবিমুক্তং পরং পদম্।
অবিমুক্তং পরং তত্ত্বমবিমুক্তং পরং শিবম্ ॥ (৩০/৫৪)

[কূর্মপুরাণম্ ॥ পূর্বভাগঃ]

—অবিমুক্তক্ষেত্রই (কাশী) পরম জ্ঞান, অবিমুক্তক্ষেত্রই পরম পদ। অবিমুক্তক্ষেত্রই পরম তত্ত্ব এবং পরম শিব (শিবস্বরূপ)।

*   *   *

যথা নারায়ণঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং পুরুষোত্তমঃ।
যথেশ্বরাণাং গিরিশঃ স্থানানামেতদুত্তমম্ ॥ (৩০/৭১)

[কূর্মপুরাণম্ ॥ পূর্বভাগঃ]

—পুরুষোত্তম নারায়ণ যেমন দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রুদ্রগণের মধ্যে যেমন মহেশ্বর, বারাণসী তেমনি সমুদায় স্থানমধ্যে শ্রেষ্ঠ।

*   *   *

সাংপ্রতম্বাসুদেবস্য ভাবিতং শঙ্করস্য চ।
যোগশায়িনমারভ্য যাবৎ কেশবদর্শনং।
এতৎ ক্ষেত্রং হরেঃ পুণ্যং নাম্না বারাণসী পুরী ॥

(বামনপুরাণম্ ১৫/৫০)

—শঙ্করের পরম পূজিত এই ক্ষেত্র (হরিক্ষেত্র)। যোগশায়ী হ'তে শুরু করে কেশবের পর্যন্ত দর্শন লাভ ঘটে এই ক্ষেত্রে। হরের এই পুণ্যক্ষেত্রের নাম বারাণসী পুরী।

*   *   *